দেবারতি মুখোপাধ্যায়
দিওতিমা

দি ও তি মা

প্রকাশের মাত্র দশ
দিনের মাথায়
প্রথম সংস্করণ
নিঃশেষিত

দিওতিমা

দেবারতি মুখোপাধ্যায়

দীপ প্রকাশন

২০৯এ, বিধান সরণি, কলকাতা—৭০০০০৬

তাকে,

যার সঙ্গে আমি সারাজীবন গৃহযুদ্ধে

ব্যাপৃত থাকার পরিকল্পনা নিয়েছি...

সূচিপত্র

ছাব্বিশ

সাতাশ

আঠাশ

উনত্রিশ

এক

"আমাদের এই দুর্গাপুজো প্রতিটা বাঙালি, না শুধু বাঙালি নয়, বাংলাভাষা, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত প্রতিটা মানুষের আত্মার সঙ্গে জড়িত। মা দুর্গা যেমন আমাদের প্রত্যেকের আত্মার আত্মীয়, তেমনই দুর্গাপুজো বাংলার সবচেয়ে বড়ো উৎসব, হাজার হাজার মানুষের রুটিরুজির প্রধান মরশুম, তাদের জীবিকাও বটে।" ছেলেটা দম নিতে একমুহূর্ত থামল।

ছেলেটার পরনে চকরাবকরা শার্ট আর ফুটিফাটা জিন্স, হাতে একটা বেশ বড়মাপের উল্কি দৃশ্যমান।

মাথার চুলগুলো হলদেটে রং করা, হাওয়ায় উড়ছে ফুরফুর করে।

বক্তৃতা থামিয়ে ছেলেটা সম্ভবত পরখ করতে চাইল, সামনে বসে থাকা মানুষগুলো তার এই ভারী ভারী কথাগুলো বুঝছে কিনা। না বুঝলে অবশ্য কোনো চাপ নেই, তার কাছে সবরকম বক্তৃতার স্টক থাকে। গুরুগম্ভীর, মাঝারি, হালকা, ছ্যাবলা। শুধু বিষয় আর অডিয়েন্স বুঝে একটু নেড়েচেড়ে এক চামচ আবেগ মিশিয়ে পরিবেশন করলেই হল।

"মাটির তাল দিয়ে যারা প্রবল নিষ্ঠায়, মমতায় নিখুঁত প্রতিমার আকার দেন, অক্লান্ত পরিশ্রমে যারা ডাকের সাজে বা বিভিন্ন গ্রাম বাংলার শিল্পে অপরূপা করে তোলেন মা-কে, তাদের এবং তাদের পরিবারের আশা নিরাশার অনেকটা জুড়ে থাকেন মা দুর্গা। কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বা রাজ্যের অধিকার নেই সেই মৌলিক অধিকারকে খর্ব করার, আমাদের জীবিকানির্বাহে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর।" মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে ইকো হওয়া মাইক শক্ত করে ধরে গলার শির ফুলিয়ে ছেলেটা এবার বলল।

তারপর সামান্য দম নিয়ে চেঁচাল, "কি ভাইসব, আমি ঠিক বলছি তো?"

"ঠিক বলছে মানে! বেড়ে বলছে! গলাটা কী সুন্দর কাঁপাচ্ছে দেখেছিস? মা দুগগা যে আমার আত্মীয়, আমি জানতামই না মাইরি! নাহ, এবার থেকে আমি পাঁচশো টাকা বেশি নেব।" বেশ তৃপ্ত চোখে আমার দিকে তাকালো আত্মারামদা, রঘুবীর জ্যাঠার ছেলে।

আমি বিরক্ত মুখে মাঠের ওপর বসে ঘাস ছিঁড়ছিলাম, "তোর আত্মীয় কেন হতে যাবে মা দুর্গা? বলল আত্মার আত্মীয়, আর তুই শুনছিস আত্মারামের আত্মীয়? আজব বুদ্ধু দেখছি!"

"অ! আত্মার আত্মীয় মানে কী রে গোবর? এই আত্মাটা কে?" আত্মারামদা ফ্যালফ্যাল চোখে তাকায়।

আমার মাথাটা গরম হয়ে গেল, "দ্যাখ আত্মারামদা, তোকে কিন্তু এই শেষবারের মতো বলছি, আমায় গোবর বলে ডাকবি না। আমার একটা প্রেস্টিজ আছে। অফিসের অনেকেই এদিকটায় থাকে, কারুর কানে কথাটা একবার উঠলে আমি কি লেভেলের প্যাঁক খাব বলতো?"

আত্মারামদা অমনি ঠান্ডা আইসক্রিম হয়ে গেল, "আচ্ছা আচ্ছা, আমি মুখ ফসকে বলে ফেলেছি, চটছিস কেন ভাই? তুই হলি গিয়ে আমাদের গর্ব। আমি সব জায়গায় তোর কত গুণগান করি জানিস?" আত্মারামদা আমায় গলাতে চেষ্টা করল।

আমি কিছু বললাম না, তোম্বা মুখে স্টেজের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একবছরও হয়নি এখনো নতুন চাকরির, একদিকে কাজকর্ম শিখতে হচ্ছে, অন্যদিকে অফিসের নানারকম হালহকিকত, পলিটিক্স। আর্ট কলেজে ক্লাসে বসে বা স্টেশন চত্বরে বসে খেয়ালখুশি মতো বন্ধুরা মিলে আঁকা একরকম, আর অফিসে ডেডলাইনের খাঁড়া সামনে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে দেখতে আঁকা আরেকরকম।

তার ওপর এখন সব অফিসেই কর্পোরেট স্টাইলে হাতে আঁকার চেয়ে গ্রাফিক্সের কারিকুরির ওপর বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, এটা আবার আমাদের সাবেকি কোর্সে আমরা তেমনভাবে করায়ত্ত করিনি। ফলে নতুনভাবে জানতে হচ্ছে অনেক কিছু। ফিরতে ফিরতে রোজ প্রায় সাড়ে ন-টা দশটা হয়ে যায় রাতে।

ভাবলাম রবিবার, এই একটা ছুটির দিন, বাড়িতে একটু ল্যাদ খাব, কোথায় কী, বাবা হিড়হিড় করে টানতে টানতে আত্মারামদার সঙ্গে পাঠালেন এখানে। কি, না, সারা রাজ্যের পুরোহিত ব্রাহ্মণরা আজ বিপন্ন, সবাই এককাট্টা না হলে অনর্থ নেমে আসবে।

ছুটির দিন, নিদেনপক্ষে একটা ভালো সিনেমাও তো দেখতে পারতাম ঘরে বসে!

আসার আগে আজ সকালে মিনমিন করে বলার চেষ্টাও করেছিলাম একবার, "আমি গিয়ে কী করব বাবা ? আমি কি পুজো-টুজো করি? করবও না কোনোদিন।"

বাবা তখন ঠাকুরবাড়িতে বসে মা মঙ্গলচণ্ডীর আরাধনায় মগ্ন।

আমাদের এই ঠাকুরবাড়ি আসলে হাওড়ার নটবর ভট্টাচার্য রোডের ওপরে প্রায় দুশো বছরের পুরোনো পারিবারিক মন্দির। আমাদের বসতবাড়িও এই মন্দিরের সঙ্গে লাগোয়া। আসলে মন্দিরটা এমনভাবে বানানো হয়েছিল যাতে গোটা অঞ্চলের সবাই বাইরে থেকেই ঢুকতে পারে। ঠাকুরবাড়ির পাশের ছোট গলি দিয়ে ভেতর দিকে গিয়ে বাড়িতে ঢোকার দরজা। আমাদের বাড়ি এ চত্বরে চণ্ডীবাড়ি নামেই পরিচিত বেশি।

আমার বক্তব্য শুনে বাবা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছিলেন। কপালে জ্বলজ্বল করছে লাল রঙের লম্বাটে তিলক, চোখ রক্তবর্ণ। অনিদ্রা বা অন্য কোনো কারণে নয়, মা চণ্ডীর আরাধনায় বসে মা-কে ডাকতে ডাকতেই নাকি আবেগে বাবার চোখে জল চলে আসে।

বাবার বর্ণনায় আমি বিশদে যাচ্ছি না, ছবি বিশ্বাসের জমিদারের ভূমিকায় বা জাঁদরেল রক্ষণশীল গৃহকর্তার ভূমিকায় অভিনয় করা এমন প্রচুর বাংলা সিনেমা আছে, সেগুলোর যে-কোনো একটা দেখে নিলেই আমার বাবার ধরন- ধারণ, কথা বলার ভঙ্গি, তাকানো, সবকিছুর একটা ওপর ওপর ধারণা হয়ে যাবে। সিনেমার ছবি বিশ্বাসের মতো আমার বাবাও সবসময় গরদের ধুতি পাঞ্জাবি ছাড়া আর কিছু পরেন না, পরিষ্কার উপবীত সবসময় দৃশ্যমান থাকে তাঁর পাঞ্জাবির ফাঁক দিয়ে। চুল সবসময় ব্যাকব্রাশ করা থাকে, মুখে আত্মাভিমানের ছাপ স্পষ্ট।

বাবার নীরব দৃষ্টির সামনে আমি আরও একবার কাঁচুমাচু হয়ে বলেছিলাম, ”না মানে আমি তো পুজো করি না।”

ক্লাসিক সিনেমা ‘সপ্তপদী’ তে একটা বিখ্যাত দৃশ্য ছিল। ছেলে উত্তমকুমার চিঠি লিখে পরম ধার্মিক বাবা ছবি বিশ্বাসকে জানাচ্ছেন,

''বাবা আমি রীনা ব্রাউনকে ভালোবাসি। ওর জন্য খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করছি, আমি ওকে বিয়ে করব।'

চিঠিটা পড়তে পড়তে সিনেমাতে ছবি বিশ্বাসের মুখটা যেমন মধ্যযুগীয় কাপালিকের মতো হয়ে গিয়েছিল, ভ্রূদুটো সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মতো হয়ে গিয়ে কপালের ভাঁজের মধ্যে প্রায় মিশে গিয়েছিল, চোখের মণিদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল বাইরে, আমার কথা শুনে বাবারও ঠিক তেমনটাই হল।

ঠান্ডা গলায় বাবা বললেন, ”পুজো করো না মানে?”

আমি বিশেষ বিচলিত হলাম না। বাবার এই অভিব্যক্তি অতিনাটকীয় অভিব্যক্তি আমাকে প্রায়ই ছোটবড় কারণে প্রত্যক্ষ করতে হয়। আমি একইভাবে অধোবদন হয়ে তাকিয়ে রইলাম মাটির দিকে।

বাবা কিছুক্ষণ সেইভাবে আমার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, ”পুজো করো না, করবেও না কোনোদিন? কেন সন্ধ্যাহ্নিক, গায়ত্রী মন্ত্র জপ করো না?” বলেই ধমকে উঠলেন, ”তবে শো পিসের মতো গায়ে পৈতেটা রেখেছ কেন, সেটাকেও নর্দমায় ফেলে দাও!”

”না ওই পুজো বলছি না, মানে পুরোহিত হয়ে তো কোনো পুজোয় পুরুতগিরি আর …!” আমি বোঝাতে চেষ্টা করলাম।

বাবা আমায় কথা শেষ করতে দিলেন না, সিরোস্ট্র্যাটাস মেঘের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বজ্রের মতো গর্জে উঠলেন, ”পুরুতগিরি! এ আবার কী ভাষা শিখছ তুমি রূপ! ভুলে যেও না, আমরা আন্দুলের বিখ্যাত ভটচাজ পরিবার। আমাদের পূর্বপুরুষেরা সকলেই এই পেশায় যুক্ত ছিলেন। আর কুলীন ব্রাহ্মণদের পৌরোহিত্য এক ঐতিহ্যবাহী পেশা। বংশমর্যাদা কি ভুলে গেলে নাকি একেবারে? ছি ছি! তোমার কাছ থেকে এমন ভাষা আমি আশা করিনি।”

এখন আত্মারামদা-র পাশে খোলা মাঠে বসে বিন্দাস বাদাম চিবোচ্ছিলাম কিন্তু সকালের ওই চিত্রনাট্যের কথা মনে পড়তেই চোখের পলকে মনে হল আমি যেন একশো বছর পিছিয়ে গেলাম।

সেটা অবশ্য নতুন কিছু নয়, আমাদের বাড়িতে ঢুকলে যে কেউই একশো বছর বা তারও পেছনে হঠাৎ করে চলে গেছে বলে ভুল করে।

এমনিতে আমাদের ভট্টাচার্য পরিবার অনেক প্রাচীন বংশ, প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাস। আমাদের আসল বাড়ি হাওড়ার আন্দুলে, তাই সবাই আমাদের আন্দুলের ভট্টাচার্য নামেই চেনে।

কয়েক প্রজন্ম আগের এক পূর্বপুরুষ আন্দুলের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বাড়ি করেছিলেন এই নটবর ভট্টাচার্য রোডে, তার নামেই রাস্তার নাম হয়েছে পরবর্তীকালে।

এই ব্যাপারে ছোটকাকা আমাকে একদিন একটা গল্প শুনিয়েছিল। জানিনা সেটা কতটা সত্যি আর কতটা অতিরঞ্জিত।

প্রায় হাজার বছর আগে বাংলার এক রাজা আদিশূর কনৌজের কোলঞ্চ নামে এক রাজার কাছে কোনো এক যজ্ঞের জন্য সর্বজ্ঞানী পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাংলায় পাঠাবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তখন যে বাংলায় ব্রাহ্মণ ছিল না তা নয়, তবে তাঁরা সম্ভবত কনৌজের ব্রাহ্মণদের মতো অতটা ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন না। কিন্তু কনৌজের কোলঞ্চ রাজা সেই অনুরোধ রাখেননি, গুরুত্বই দেননি আদিশূরের দূতকে। তাতে আদিশূর ক্ষিপ্ত হয়ে বাংলা থেকে প্রায় সাতশো ব্রাহ্মণকে গোরুর গাড়ির পিঠে চড়িয়ে উত্তরপ্রদেশ পাঠিয়ে দেন। ব্যাপারটা অনেকটা, আপনি কি মনে করেন, আমার রাজ্যে বামুনের অভাব? দেখুন, আমার কত বামুন! নিন, ঠ্যালা সামলান!

এই কাহিনি মনে পড়লেই আমার ছোটকাকার কৌতুকভরা মুখটা মনে পড়ে যায়।

তখন আমি কত ছোট, তবু স্পষ্ট মনে আছে পুরোটা। ছোটকাকা আমাদের দোতলার ঝুলবারান্দায় একটা আরামকেদারায় বসে হেসে হেসে বলছে, "তখন তো কোলঞ্চ রাজা পড়লেন মহা ফ্যাসাদে। তখনকার নিয়ম অনুযায়ী আর যাই হোক, ব্রাহ্মণদের কোনোভাবেই আক্রমণ বা লাঞ্ছনা করা যেত না। তখন কোলঞ্চ রাজা কী আর করেন, নিজের রাজ্য থেকে পাঁচজন কৃতি ব্রাহ্মণকে পাঠালেন বাংলাদেশে। সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণ বাংলায় এসে বসতি স্থাপন করলেন, তাঁরা এবং তাঁদের বংশই পরিচিত হলেন কুলীন ব্রাহ্মণ নামে। আমরা সেই পাঁচজন ব্রাহ্মণের একজনের বংশধর। বুঝলি?"

আমি তখন ক্লাস সিক্স কী সেভেন।

প্রশ্ন করেছিলাম, "তার মানে আমরা কুলীন? আমাদের ইতিহাস বইতে লেখা আছে, রাজা বল্লাল সেন কুলীন প্রথা চালু করেছিলেন। কুলীন প্রথা কী ছোটকাকা?"

"সেটা তো অন্য প্রসঙ্গ হয়ে গেল। যাই হোক, জিজ্ঞেস করলি যখন সংক্ষেপে বলে দিই। কুলীন একটা জঘন্য প্রথা ছিল। বাংলায় একটা সময় পাল বংশ শাসন করত জানিস তো? পালেরা ছিল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। পাল বংশের পর সেন বংশের রাজারা এসে হিন্দু ধর্মকে আবার প্রোমোট করতে থাকেন। তখনই নিয়ম হয়, ব্রাহ্মণকন্যাদের শুধুমাত্র কুলীন পাত্রর সঙ্গেই বিয়ে দিতে হবে। মানেটা বুঝতে পারলি? বাংলাদেশে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ, কিন্তু কুল রাখতে গেলে তাদের বংশের মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে। এদিকে কুলীন ব্রাহ্মণ তো সংখ্যায় অনেক কম, সেই কনৌজ থেকে আসা পাঁচ ব্রাহ্মণের শাখাপ্রশাখা। এত কুলীন ছেলে কোথায় পাওয়া যাবে?" ছোটকাকা যেন আমাকেই প্রশ্ন করার ভঙ্গিতে তাকিয়েছিল।

"তাহলে?"

"তাহলে আবার কী। পাত্রী প্রচুর, পাত্র কম। অতএব কুল রাখতে বাচ্চা বাচ্চা মেয়েগুলোকে সত্তর, আশি বছরের বুড়ো হয়ে মরতে যাওয়া কুলীন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া শুরু হল। একে তখন নয়-দশ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে দিতে হত, নাহলেই সমাজ একঘরে করে দেওয়ার ভয় দেখাত, অন্যদিকে কুলীন প্রথা। একেকটা কুলীন ব্রাহ্মণের হু হু করে বউয়ের সংখ্যা বাড়তে থাকল। একটা আশি বছরের বুড়ো, তার পঞ্চাশটা বউ। বুড়ো কিছুই করে না, সারাবছর শুধু শ্বশুরবাড়িগুলোতে খেয়েদেয়ে সেবাযত্ন নিয়ে বেড়ায়, বিয়ের সময় যৌতুক নেয়, আবার বিয়ে করে। তারপর বুড়ো মরলে আবার তার সঙ্গে জ্যান্ত সহমরণে যেতে হয়।" ছোটকাকা আমার দিকে তাকিয়ে ছিল, "শোন, বড়দা যতই আমাদের কৌলীন্য নিয়ে গর্ব করুক, সবসময় মনে রাখবি, আমাদের পূর্বপুরুষরাই এইসব করেছে, হাজার হাজার মেয়েকে এইভাবে কষ্ট দিয়েছে,

চিতায় জ্যান্ত পুড়িয়ে সতী করেছে। তাই কোনোদিনও ব্রাহ্মণ বলে গর্ব করবি না, বুঝলি? জাত টাত কিস্যু নয়। মানুষ নিজের কাজের ভিত্তিতে শ্রদ্ধা অর্জন করে।"

আমি ঘাড় নেড়েছিলাম। তখন আমি কিশোর, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা শুনে ভয়ে মনের ভেতরটা কেমন যেন হচ্ছিলো।

"যাই হোক, যেটা বলছিলাম। তুই তো জানিসই, আমাদের আসল দেশ ছিল আন্দুলে। সেখানে ১৬৫৭ সাল থেকে আমাদের বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। সে সাবেক আটচালা মন্দির, বিশাল ঠাকুরদালান, একেবারে হইহই রইরই কাণ্ড। সেভাবেই চলে আসছিল। হঠাৎ গোল বাধল প্রায় দুশো বছর আগে। আমাদের বংশের এক ছেলে বিয়ে করে বসলেন কায়স্থ এক মেয়েকে। ব্যাস, তাই নিয়ে ভাইদের মধ্যে চরম বিবাদ সৃষ্টি হল। তখন আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা, মানে তোর বাবারও আর কি, তিনি আন্দুলের বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে এসে সংসার পাতলেন এখানে। যে বংশে অব্রাহ্মণ গৃহবধূ থাকবে, সেখানে আবার পুজো কি? তিনি এখানে এসে নতুন করে ভট্টাচার্য বাড়ির পুজো শুরু করলেন।" ছোটকাকা চোখ বন্ধ করে বলেছিল, "তার মানে, আমাদের এই বাড়ির পুজো তো দুশো বছরের, কিন্তু আমাদের আদি বাড়ি, ওই আন্দুলের পুজো প্রায় চারশো বছরের পুরোনো। ঘটে ঢুকল কিছু?"

আমি মাথা নেড়েছিলাম, "বাব্বা! একটা বিয়ের জন্য পুরো বাড়ি থেকেই আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন উনি?"

ছোটকাকা তখন মিটিমিটি হেসেছিল, "তোমার পিতৃদেব, মানে আমার শ্রদ্ধেয় দাদাটিও কিন্তু ওইরকম। দেখিস বাবা, দুম করে কোনো বিয়ে টিয়ে করে বসিস না যেন! আমি তখন বাঁচাতে পারব কিনা জানিনা, দাদা কিন্তু কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।"

অজান্তেই আমার মুখ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

ভাগ্যের পরিহাস এমনই, সত্যিই ছোটকাকা এমন পরিস্থিতি এলেও বাঁচাতে পারবে না। যে মানুষটা আমাদের বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে আধুনিক ছিল, এই সব জাতপাতে পাত্তাই দিত না, সে-ই আজ আর নেই।

ফলে দিন দিন সময় এগোচ্ছে, কিন্তু আমাদের বাড়িটা প্রাগৈতিহাসিক যুগেই পড়ে রয়েছে।

আর এখন তো বাবা ঠাকুরদার প্রতিষ্ঠা করা এই অল বেঙ্গল পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশনের দণ্ডমুণ্ড প্রেসিডেন্ট, ছোটোকাকার অবর্তমানে বাবার ওপরে কথা বলার কারুর সাধ্যও নেই, কাজেই ক্রমশ এইসব বেড়েই চলেছে।

ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে পৈতেয় গিঁট পাকাচ্ছিলাম, তারপরই চমকে উঠে ছেড়ে দিলাম।

আমার খুড়তুতো বোন টিকলি আমাকে একটা সহজ উপায় বাতলে দিয়েছে, "দাদাভাই, তুই মাঝেমাঝেই মনে করবি জেঠুমণি তোর পাশে অদৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাহলেই দেখবি ভটচাজ বাড়ির আদর্শে ঘা লাগানো কোনো কাজ তুই আর কখনো করতে পারবি না।"

টিকলির কথাটা মনে হওয়া মাত্রই আমার যেন মনে হল, একটু দূরে বাঁ হাতে যে তেঁতুল গাছটা দাঁড়িয়ে আছে, সেটা যেন বাবার মতোই কড়া চোখে তাকিয়ে আমার পৈতেয় গিঁট পাকানো দেখছে আর তিরতির করে কাঁপছে।

আমি পলকে চোখ নামিয়ে নিলাম। পৈতের কোনো অযত্ন বাবা দেখতে পারেন না।

হঠাৎ আত্মারামদার ডাকে আমি আবার মাঠে ফিরে এলাম, আত্মারামদা বলল, ”না! ঝন্টুর গলায় কিন্তু জোশ আছে যাই বল গোব ... ইয়ে রূপ, পার্টিপলিটিক্স করে করে গা গরম করা লেকচার দিতে শিখে গেছে বেশ!”

আমি একঝলক মঞ্চের দিকে তাকালাম। ঝন্টু বলে ছেলেটা তখনও চেঁচিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম ”কে বলতো ছেলেটা? কোনোদিনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।”

”তুই হলি গিয়ে ভালো ছেলে, তুই দেখবি কী করে? ও তো বালিটিকুরির নেতা, বেশ নাম করেছে। সঙ্গে আবার প্রোমোটারিতেও হাত পাকাচ্ছে। তোদের দোকানের জগদীশকাকা, ওর ভাইপো হয় তো।” আত্মারামদা নাক খুঁটতে খুঁটতে বলল।

”জগদীশকাকার ভাইপো পার্টি করে?” আমি এবার অবাক হলাম, ”পার্টির লোক আমাদের এই সভায় কী করছে? ও-ও কি পুজো করে নাকি?”

”ধুস!” আত্মারামদা আমার বোকা বোকা প্রশ্নে তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, ”কী যে বলিস তুই! পুজো করতে যাবে কেন! এখন কোনো পোতিবাদই পার্টি না ধরে হয় না, পার্টি ছাড়া পোতিবাদ করলে তাতে কেউ পাত্তাও দেয়না। সেইজন্যই তো জগদীশকাকা ওকে নিয়ে এসেছে। ঝন্টুর কড়ক কড়ক লেকচারে সব একেবারে শুয়ে পড়বে দ্যাখ না!”

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। যে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট আমার বাবা, সেই সংগঠনের সভায় কাউকে বক্তৃতা দিতে বাইরে থেকে আনা হয়েছে নিশ্চয়ই বাবার অগোচরে নয়।

বাবা এইরকম সস্তা ছেলে দিয়ে বক্তৃতা দেওয়াচ্ছেন?

হাওড়া জেলার শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মশাই ওরফে বসন্ত ভট্টাচার্যর শেষে এই হাল?

কী যেন নাম মেয়েটার? ডিওডোরেন্ট না কি যেন!

আমি বললাম, ”ওই ডিওডোরেন্ট বলে মেয়েটা কোথায় থাকে রে আত্মারামদা?”

”ডিওডোরেন্ট? সেটা আবার কে?” আত্মারামদা হাঁ।

”আরে, যার জন্য এত কিছু। যে পুজো করবে বলে পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন ফাইল করেছে, কী যেন নাম?”

”অ ! ওই ফুলনদেবীর কথা বলছিস? এক মিনিট।” আত্মারামদা টুক করে ওর ঝোলা থেকে আজকের খবরের কাগজ বের করল, তারপর প্রথম পৃষ্ঠায় বড় করে ছবি দেওয়া মেয়েটার নামটা বানান করে পড়ল, ”দিওতিমা। দিওতিমা বিশ্বাস।”

হ্যাঁ হ্যাঁ। দিওতিমা। এরকম অদ্ভুত কারুর নাম হয় বলে শুনিনি কখনো। অবশ্য অব্রাহ্মণ এবং মেয়ে হয়ে দুর্গাপুজোয় পৌরোহিত্য করবে, এবং সেটায় বাগড়া দেওয়াতে কোর্টে গিয়ে সমস্ত পুরোহিতদের জন্য লাইসেন্স আনার দাবিই বা কে কবে শুনেছে!

আমার কাল সন্ধেতে বাড়িতে সংগঠনের আলোচনায় বাবার গর্জন মনে পড়ল, ”এত বড় স্পর্ধা! আমাদের মতো পোড় খাওয়া ব্রাহ্মণদের শেষে পুজো করার পরীক্ষায় পাশ করে লাইসেন্স পেলে তবে পুজো করার অনুমতি দেওয়া হবে? কোথাকার কে একটা বাচ্চা মেয়ে এইসব বলে লোকজনকে উসকোচ্ছে, আর মিডিয়াও মজা দেখছে! না না রঘুবীর, সরকার কোনো স্টেপ নেওয়ার আগেই কোমর বেঁধে নামো। এ চলতে পারেনা।”

আমি একবার খবরের কাগজের ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখলাম মেয়েটাকে। বয়স আমারই মতো হবে, চাপা গায়ের রং, ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল, শান্ত অথচ স্পষ্ট দৃপ্ত চোখের চাউনি।

ইতিমধ্যে সভা ভেঙে গেছে। আত্মারামদা একটা বিশাল হাই তুলে উঠে দাঁড়াল, "নাহ! যাই। নামাবলিটা গিয়ে কাচতে হবে। কাল আবার ঘোষপাড়ায় সত্যি নারাণের পুজো আছে। ভালো বাড়ি, মালকড়ি বেশ দেয়। গেলবার তো টাকার সঙ্গে কি ভালো একটা রুপোর থালা গেলাস দিয়েছিল, বাজারের বসাকের দোকানে বেচে সাড়ে তিন হাজার টাকা পেয়েছিলাম।"

আমি আত্মারামদার দিকে তাকালাম, "সত্যি নারাণ নয়, ওটা সত্যনারায়ণ আত্মারামদা! পুজো করে খাচ্ছিস, উচ্চারণগুলো অন্তত ঠিকঠাক কর। আর পুজোর জিনিস বেচে দেওয়া, ছি ছি, লোকে শুনলেই বা কী ভাববে। তোর মতো ভুলভাল পাবলিকদের জন্যই ওই দিওতিমা কেস করেছে, যে যা খুশি ভুলভাল মন্ত্র পড়বে, দেশে কোনো আইনকানুন নেই নাকি। এরকম করলে পুরুতদের উপর মানুষের আস্থা থাকবে কী করে, সত্যিই তো!"

"আইনকানুন আবার কিসের ভাই? তোরও কি ওই হাওয়া লাগল নাকি? ওরে ধর্মবীর চক্কোত্তির নাতি আমি, রঘুবীর চক্কোত্তির ছেলে, ওইটেই আমার সার্টিফিকেট, ওইটেই আমার লাইসেন্স, বুঝলি গোবর?" কথাটা বলেই আত্মারামদা হাওয়া হয়ে গেল।

সেদিন আর বেশিদিন চলবে না অশিক্ষিত আত্মারাম, আমি ওর চলে যাওয়া দেখতে দেখতে হাঁটা লাগালাম, তামাম ব্রাহ্মণ চূড়ামণি বসন্ত ভট্টাচার্য যখন এতটা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তোমাদের হাল তো ছেড়েই দিলাম!
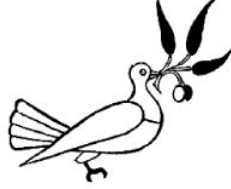
দুই

ক্যালেন্ডার যতই বলুক এটা সেপ্টেম্বরের প্রথম, ট্রেনে করে যাওয়ার সময় রেল লাইনের দু-ধারে যতই স্নিগ্ধ কাশফুল চোখে পড়ুক, গরমে টেকা যেন দায় হয়ে উঠছে এই পচা ভ্যাপসা গরমে!

আমার আবার চিরকালই ঘাম হয় বেশি, আর ভিড় বাসের মধ্যে এই ঘটাং ঘটাং করে যেতে যেতে পিঠের কাছটা কুর্তিটা যেন ভিজে সপসপ করছে।

চুলের পনিটেলটা আলগা হয়ে এসেছিল, আমি কোনোমতে বাসের হ্যান্ডেলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক অবিন্যস্ত হয়ে পড়া চুলগুলোকে চুড়ো করে মাথার ওপরে নিয়ে এসে বাঁধলাম।

রাস্তাঘাটে কিছু ছেলে আছে দেখেছি, মেয়েরা চলাফেরা বা বসার মাঝে একটু অসাবধান হলেই নির্লজ্জভাবে তাকিয়ে থাকে।

এখনো সেটাই হল।

সামনে বসে থাকা ছেলেটা হেডফোনে দিব্যি গান শুনছিল, যেই আমি হাতদুটো তুলে চুলটা বাঁধতে গেছি, অমনি চোখ তুলে ড্যাবড্যাব করে আমার ঘামে ভিজে ওঠা বগলের আশপাশ দেখতে লাগল। এক ঝলকের জন্য নয়, তাকিয়ে আছে তো তাকিয়েই আছে।

আমার মাথাটা গেল ধাঁ করে গরম হয়ে। একে তো মিনিবাস, সামনের প্রতিবন্ধী সিটে বেহায়ার মতো বসে আছে, সামনে আমার পাশেই একজন বৃদ্ধা কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে বসতে দেওয়ার সহবৎ তো দূরে থাক, কানের দুদিকে দুটো হেডফোন গুঁজে যেন সংগীতের উচ্চমার্গে বিচরণ করছে। এদিকে ঝাড়ি মারতে আর চোখ দিয়ে নোংরামো করতে কোনো আলস্য নেই।

আমি চোখটা সরু করে বাইরের দিকে তাকিয়ে মুখটাকে যতটা সম্ভব হিংস্র করলাম, তারপর মুখ ঘুরিয়ে সোজা ছেলেটার চোখের দিকে তাকিয়ে গলার স্বরটাকে ধারালো ছুরির মতো মিহি করলাম, "কী দেখছ ভাই?"

ছেলেটা মুহূর্তে ঠান্ডা বেগুনভাজার মতো মিইয়ে গিয়ে চোখটা ঘুরিয়ে নিল, "কী-কিছু না তো! কী বলছেন আপনি?"

আমি ওর আপনি আজ্ঞেটাকে কিক দিয়ে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে বললাম, "কোনোদিনও মেয়ে দেখো নি, না কোনোদিনও বগল দেখোনি, কোনটা?"

ছেলেটা আমার তেরিয়া মার্কা কথায় আরও ভেবলে গেল, "আমি কিছু করিনি দিদি।"

এবার আমি আমার গলাটাকে দুম করে সি শার্পে নিয়ে গেলাম, "কিছু করোনি তো, তখন থেকে বিশ্রীভাবে তাকিয়ে রয়েছ কেন? আচ্ছা করে ধোলাই দেব নাকি?"

আজকাল বাসে ট্রেনে লোকজন কেউ ঝাঁপিয়ে পড়ে না সাহায্য করতে, তবু আমার এই রণরঙ্গিণী মূর্তির মাহাত্ম্যেই হয়তো বেশ কিছু লোক গুনগুন করতে শুরু করল, "কি হে ভাই, এই বয়সেই এইসব অসভ্যতামি শিখে ফেলেছ?"

"কানটা ধরে দু-ঘা দিননা দিদি, কেওড়ামি বেরিয়ে যাবে।"

"সত্যি আজকালকার ছেলেগুলো যে কি …!"

অন্য সময় হলে হয়তো আরও কিছুক্ষণ চালিয়ে যেতাম, কিন্তু এখন আমি আর কথা বাড়ালাম না। ছেলেটার দিকে একটা রঘু ডাকাত মার্কা দৃষ্টি দিয়ে নেমে পড়লাম। হাতে অনেক কাজ। এখানে ঝুলে গেলে চাপ আছে। আজ অফিসটা কামাই যখন করেছি, সবগুলো মিটিয়ে ফেলতে হবে।

কিন্তু যখন বেশি তাড়া থাকে, তখনই বেশি দেরি হয়, বরাবর দেখেছি। এখনো তাই হল।

গলির মুখে ঢুকতে যাচ্ছি, রাস্তার পাশে নিবারণকাকার চায়ের দোকানে বসে থাকা তিনটে ছেলে আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। আলগোছে বিশ্রী হলদেটে রং করা চুলগুলো ঠিক করে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে।

তিনটে ছেলেরই বয়স কুড়ি থেকে পঁচিশের ভেতর।

মাঝখানে যে রয়েছে, তার হাবভাব দেখেই বোঝা যায় সে-ই দলের পান্ডা। মুখে কিছু একটা চ্যুইং গাম চিবোচ্ছে, পরনের গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকা ছেঁড়াখোঁড়া প্যান্টটা একবার টেনে তুলে ঠিকঠাক করে একদম আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল, "নমস্কার ম্যাডাম, আপনিই দিওতিমা বিশ্বাস তো? আমি ইয়ে … বেঙ্গল পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশন থেকে আসছি, আমার নাম ঝন্টু মল্লিক।"

আমার ধারণা ছিল, পশ্চিমবঙ্গের এই পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হতে গেলে পুরোহিত হতে হয়, মানে একমাত্র পুরোহিতরাই এই সংগঠনের সদস্য হতে পারেন।

এই লোফারমার্কা ছেলেটা পুরোহিত?

আমি আপাদমস্তক ছেলেটার দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বললাম, "হ্যাঁ আমিই দিওতিমা। বলুন কী ব্যাপার?"

"হে হে, বলার তো অনেক কিছুই আছে ম্যাডাম!" কুতকুতে চোখে ঝন্টু মল্লিক কান এঁটো করে হাসল, "এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি আর সব কিছু বলা যায়? একটু যদি আমাদের সঙ্গে কোথাও বসেন, বড্ড ভালো হয়।"

"আমি আপনাদের চিনি না জানিনা, হঠাৎ করে কোথাও বসতে যাব কেন!" আমি ভ্রূ কুঁচকোলাম, "যা বলার এখানেই বলুন।"

ঝন্টু পেছন ফিরে একটা স্যাঙাতের দিকে তাকাল, তারপর একটু সরে গিয়ে নিবারণকাকার উদ্দেশ্যে গলা চড়াল, "ও কাকা, চারটে চা দাও, দুধ চিনি এলাচ, একদম কড়া করে!"

এই গলিটা বেশ সরু, গলির মুখেই একটা বাচ্চাদের স্কুল। এই দুপুর পেরিয়ে বিকেল হওয়ার সময়টা স্কুল ছুটি হওয়ার সময়। স্কুলের ছোটো ছোটো বাচ্চা, তাদের মায়েরা, সঙ্গে রিকশা, স্কুল ভ্যানের প্যাঁ-পোঁ আওয়াজ, সব মিলিয়ে ভীষণ সরগরম এখন গলিটা।

আমি প্রায় রাস্তার মাঝেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, একটা স্কুটি হড়বড়িয়ে সামনে এসে পড়ায় বাধ্য হয়েই আমাকে নিবারণকাকার দোকানের দিকে সরে আসতে হল।

নিবারণকাকা আমার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে দুধ ফোটাতে লাগল। ছোট থেকেই নিবারণকাকা আমাকে দেখছে। সেই কোন ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে যখন বাজারে যেতাম, ফেরার পথে নিবারণকাকার দোকানে এক কাপ চা খাওয়া আর

মিনিটদশেক গল্পগুজব করা ছিল বাবার অভ্যেস। আমার জন্য ওইসময়টা বরাদ্দ হত শক্ত টোস্ট বিস্কুট। তখন টোস্ট বিস্কুট বাড়িতে আসত না, তাই মুখে দিলেই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে যাওয়া বিস্কুটটার জন্য আমার নিবারণকাকার দোকানে আসতে আমি মুখিয়ে থাকতাম।

তখন এইসব রেস্টুরেন্ট, কফি শপ কোথায়! ওইটুকু ছোট ছোট পথচলার মধ্যেই যেন লুকিয়ে থাকত অপার আনন্দ।

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে অতীতের স্মৃতিচারণ বন্ধ করে নিবারণকাকার দিকে তাকালাম, "ভালো আছ নিবারণকাকা?"

নিবারণকাকা সামান্য হাসল। তারপর ছেলেগুলোর চোখ বাঁচিয়ে আমাকে ইশারা করে বোধহয় বলতে চাইল, "মাথা গরম করিস না। ছেলেগুলো সুবিধের নয়।"

আমার কর্মকাণ্ডের জের তার মানে বাজার পেরিয়ে এই নিবারণকাকার দোকানেও এসে পৌঁছেছে, আমি ভাবলাম।

ঝন্টু মল্লিকের দিকে তাকিয়ে বললাম, "বলুন?"

"আজ কি আপনার ডিউটি ছিল না?" ঝন্টু মাখন স্বরে জিজ্ঞেস করল।

"না। আজ ছুটি নিয়েছিলাম। একটা কাজ ছিল।" আমি বিরস কণ্ঠে বললাম।

ঝন্টু মুখ দিয়ে একটা চুকচুক করে শব্দ করল, "এহ, নতুন চাকরি, এর মধ্যেই এত ছুটি নিচ্ছেন ম্যাডাম?"

আমি এবার কড়া গলায় বললাম, "দেখুন আমার না তাড়া আছে। একটু তাড়াতাড়ি বলুন কী বলবেন।"

ঝন্টু আমার দিকে চায়ের কাপটা বাড়িয়ে দিল, "আহা, এত তাড়া কিসের! এখন তো সবে বিকেলবেলা। মাসিমা এর মধ্যেই চিন্তা করা শুরু করবেন বুঝি? অবশ্য একটামাত্র মেয়েই তো ওঁর সম্বল, চিন্তা তো করবেনই!"

আমি এবার ঝাঁঝিয়ে উঠলাম, "কিছু কাজের কথা আছে কি আপনার? নাহলে আমি এবার উঠব।"

মুহূর্তে ঝন্টুর মুখ থেকে ভালোমানুষির মুখোশটা খসে পড়ল, "কাজের কথাই তো বলছি ম্যাডাম। কত কী মাল্লু লাগবে বলুন, তারপর আপনার কেসটা উইথড্র করে নিন। অনেক বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন এরই মধ্যে, এখন ক্লোজ করে দিলেও আমরা ঠিক সালটে নেব। নাহলে ..." ঝন্টু বিশ্রী হাসল, "মাসিমা আপনার জন্য চিন্তা করতে করতে হয়তো কেওড়াতলায় চলে যাবেন তবু আপনি ফিরবেন না, হে হে!"

রাগে আমার ব্রহ্মতালু জ্বলে উঠল, আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, এই ঝন্টু মল্লিক পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশন থেকে এসেছে। কী ভাষা মুখের! অন্য কেউ হলে আমি সপাটে একটা চড় লাগাতাম। কিন্তু নেহাত বিষয়টা এখন কোর্টের বিচারাধীন, তাই অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে ঝট করে উঠে দাঁড়ালাম, ব্যাগটা গুছিয়ে নিয়ে হাঁটতে উদ্যত হলাম।

ঝন্টু বলল, "আরে চা-টা না খেয়েই চলে যাচ্ছেন কেন! বসুন বসুন, অত রাগলে চলে! এখনো তো কিছুই দেখেননি!"

আমি পেছনে না ফিরে হনহন করে হাঁটছিলাম। স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিলাম এইটা ভেবে যে কোথায় বাস করছি আমরা! দিনে দুপুরে পাড়ার মোড়ে মস্তান এসে থ্রেট করছে, তাও আবার আমার নিজের পাড়ায়।

নিবারণকাকা পর্যন্ত কোনো প্রতিবাদ করল না! আসলে সবাই নিজেরটা আগে বোঝে। রাগে আমার মাথা কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছিল।

সূর্য ধীরে ধীরে ঢলছে পশ্চিমদিকে। দূরের পাখিগুলো উড়ে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে, খুঁজে নিচ্ছে নিজেদের বাসা। তাদের কিচিরমিচির শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে ইলেকট্রিকের তারগুলো, থিরথির করে নড়ে উঠছে গাছের পাতা।

সেদিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ে গেল মাসকয়েক আগের সেই দিনটার কথা।

সেই প্রচণ্ড অপমানিত হওয়ার দিনটা।

গলাটা কেমন শুকিয়ে উঠল, কিন্তু কোনোকালেই বাইরে বেরনোর সময় আমার সঙ্গে জল থাকে না। রাস্তার একপাশের টিউব ওয়েলে গিয়ে আঁজলা ভরে জল নিয়ে ঘাড়ে, মাথায়, মুখে ঝাপটা দিতে লাগলাম।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, পুরোহিতদের লাইসেন্স আমি চালু করবই! এইসব অযোগ্য লোকেদের হাতে সাধারণ মানুষ বেশিদিন আর প্রতারিত হতে পারে না। এই ঝন্টু, মন্টু, রন্টু এরা আমার কিচ্ছু করতে পারবে না।

তিন

অন্যবার পুজো এগিয়ে আসতে থাকলে মনটাও কেমন অজানা আনন্দে ভরে উঠতে থাকে। দৈনন্দিন কাজের মধ্যে একটা খুশির আমেজ দুধের ওপরের সরের মতো আলতোভাবে ভেসে থাকে, ব্যস্ততার মাঝেও সেই ঘন সরের স্বাদ একটা আনন্দের রেশ রেখে যায়।

কিন্তু এইবার এতসব ডামাডোলে মনটা যেন খিঁচিয়ে আছে। পুজো আসছে জেনেও যেন সেই উচ্ছ্বাসটা মনের মধ্যে টের পাচ্ছি না।

অনেকদিন পর ক্যানভাসে একটা ছবি আঁকছিলাম। রবিবার, ছুটির দিন। আগে শনিবার রবিবার আলাদা করে কিছু মনে হত না, কিন্তু অফিস শুরু হওয়ায় ছুটির দিনগুলোর একেকটা মুহূর্ত খুব দামি মনে হয়। ইচ্ছে করে গরমকালের দুপুরের ঠাকুমার বানানো চালতার আচারের মতো তাড়িয়ে তাড়িয়ে খাই, দুম করে শেষ না হয়ে যায়!

একটা সাদা রঙের ঘোড়া আঁকছিলাম। পক্ষীরাজ নয়, এমনিই সাধারণ ঘোড়া। তার দুধসাদা চামড়ার ওপর রোদ-কাদার প্রলেপে কেমন একটা ধূসর আস্তরণ পড়েছে, পায়ের খুরে ক্লান্তির ছাপ।

তবু সে অনমনীয়। দূরে সূর্য অস্তগামী, কমলা রং ঈষৎ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা আকাশে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ঘোড়াটা ছুটে চলেছে দূরের দিগন্তে, আলো নেভার আগে তাকে গন্তব্যে পৌঁছতেই হবে।

আঁকতে আঁকতে ভাবছিলাম, ঘোড়াটা কি জানে ওর গন্তব্য কোথায়? ঠিক কোনখানে পৌঁছলে শেষ হবে ওর পথচলা? জানেনা। তবু সে ছুটে চলেছে। মানুষও তাই। কী তার লক্ষ্য, কী তার গন্তব্য, ঠিকমতো না জেনেই শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ছুটে চলে অনির্দিষ্ট অভিমুখে। এরই নাম জীবন। এরই নাম সংগ্রাম। যারা রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে নাকে মুখে গুঁজে ছোটে অফিসে, তারাও এই সংগ্রামে শামিল, যারা বাড়িতে থেকে সংসারের মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটানোর জন্য প্রাণপাত করে, তারাও।

তবে সংখ্যায় নগণ্য হলেও কিছু মানুষ আছে, যারা এই ইঁদুরদৌড়ে নাম লেখাতে চায় না, প্রথা ভেঙে বাঁচতে চায় নিজের ফর্মুলায়। আর সমাজ তখন উঠে পড়ে লাগে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করতে। দাগিয়ে দেয়, "ও ওরকম কেন? ছি ছি, পরিবারের মান সম্মান সব ডোবাল!" এই সব বলে। সেই ভীষণ চাপ কেউ সহ্য করতে পারে, কেউ পারে না।

এই যে দিওতিমা বলে মেয়েটা, সমাজের এতবড় ট্যাবুর বিরুদ্ধে একা লড়াই করে যাচ্ছে, কতরকম টিপ্পনী, বাধার সম্মুখীন হয়তো হতে হচ্ছে ওকে। আমার হঠাৎ করেই মেয়েটার কথা মনে পড়ল। যতদূর বুঝছি, মেয়েটা কারুর কথায় দমে যাওয়ার পাত্রী নয়, তবু এত মানসিক চাপ সহ্য করার ক্ষমতা তো সকলের থাকেনা।

যেমন ছিল না ছোটকাকার।

ছোটকাকার কথা মনে পড়তেই আমার হাতের তুলি যেন শ্লথ হয়ে এল, হাত ক্রমশ জোর হারিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে লাগল। আমি তুলিটাকে সাবধানে প্যালেটের ওপর নামিয়ে রেখে এগিয়ে গেলাম উত্তরের জানলার দিকে।

আমার এই দোতলার ঘরের জানলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা যায় আমাদের ঠাকুরবাড়ি ঢোকার দরজাটা। প্রতিবার পুজোর আগে বাবা দরজাটা রং করান, এবারেও আজ সকাল থেকে সেই পর্ব চলছে। তবে এবার ইচ্ছা করেই বাবা রংটা পালটে দিচ্ছেন। ঠাকুরবাড়ির দরজাটা ছিল লাল রঙের, এবার তাতে সবুজ প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে।

আমার দেখতে দেখতে মনে পড়ল, আগে সবুজ রঙেরই ছিল দরজাটা। এই লাল রংটা আমার ইচ্ছেতে করিয়েছিলেন বাবা, পৈতের ঠিক আগে। আমার পৈতে হয়েছিল ক্লাস সিক্সে পড়তে, এগারো বছর বয়সে। তখন গোটা বাড়িতেই অনেক রদবদল আনা হয়েছিল।

আমি তখন সুবোধ বালক। বাবা যা করতে বলেন তাই করি। মনে বিরক্তি এলেও চটজলদি গিলে ফেলি। উপনয়ন অনুষ্ঠান মেটার পরে পরেই বাবা আমাদের বাড়ির পেছন দিকের পুকুরে ভোরবেলা নিয়ে গিয়ে আমাকে শিখিয়েছিলেন, "একবার ডুব দিয়ে নাভি পর্যন্ত জলে দাঁড়িয়ে প্রথমে আচমন করবে। তারপর 'ওঁ নমো নারায়ণায়' বলে চারদিকে জল দিয়ে মোটামুটি এক হাত মাপের বৃত্ত এঁকে জল শুদ্ধ করে নেবে।" বলার সঙ্গে বাবা নিজেও জলে নেমে সেটা করে দেখাচ্ছিলেন, "তারপর বলবে,

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী

নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন সন্নিধিং কুরু!"

নাকঝাড়ার শেষ ধাপে মানুষ যেমন জোরে চাপ দেয়, তেমনি 'কুরু' কথাটার উপর জোর দিয়ে বাবা পরম ভক্তিভরে স্নান মন্ত্র শেষ করলে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আচমন করে মন্ত্র শুরু করতে বললে, আচমন কি বাবা?"

বাবা আমার মাথায় হাত রেখেছিলেন, "যেকোনো শুভকাজ করার আগে দেহ মন শুদ্ধ করাই হল আচমন রূপ। তোমাকে যে বিষ্ণুমন্ত্র শিখিয়েছি মনে আছে?"

আমাকে তার গত কয়েক দিন আগে থেকে প্রচুর মন্ত্র শেখানো হয়েছিল, আমি সেগুলোর মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে বলেছিলাম,

"ওঁ অপবিত্র পবিত্রোবা সর্বাবস্থা গতোঽপি বা

য সরেত পুন্ডরিকাক্ষং স বাহ্যঅভ্যন্তরে শুচি।।

এইটা বাবা?"

বাবার মুখ ভোরের সূর্যের আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠেছিল, "বাহ, এই না হলে আমার ছেলে মঙ্গলরূপ!" তারপর আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে নিয়েছিলেন বুকে, "সংস্কৃত উচ্চারণ এমনভাবে করবে, যেন মানুষের মনে তা দৃঢ়ভাবে গিয়ে গেঁথে যায়। এই যে মন্ত্রটা তুমি উচ্চারণ করলে, এর অর্থ হল, শরীর কিংবা শরীরের মধ্যে অবস্থিত মন, এই দুটির কোনোটিও যদি অপবিত্র হয়, তবে শ্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করলেই বাহ্য ও অন্তরে শুদ্ধ হওয়া যায় বুঝেছ রূপ?"

এগারো বছরের আমি তখন লম্বা ঘাড় দুলিয়েছিলাম। তারপর বাবা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ডানহাতটাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে এসেছিলেন, "ডান হাতের তালুকে এইরকমভাবে গোরুর কানের মতো করবে, একটা মাষকলাই ডুবতে পারে ততটা জল নিয়ে ওঁ বিষ্ণু মন্ত্রটা বলতে বলতে জলটা খাবে। তারপর," বাবা বুড়ো আঙুলটার পেছন দিকটা ঠোঁটের দুপাশে ঠেকিয়ে বলছিলেন, "এইরকম করে স্পর্শ করে তারপর হাত ধুয়ে নেবে।

পুরোটাই করবে পবিত্র মনে। শুধু মন্ত্র উচ্চারণ করলেই হয়না, মনটাকে শুদ্ধ রাখতে হয়।"

আচ্ছা, বাবা যে সংগঠনের বক্তা হিসেবে ওই ঝন্টুকে এগিয়ে দিচ্ছেন, ওর কি মনটা শুদ্ধ?

আমি দেখতে পেলাম পবন মিস্ত্রী রঙের ব্রাশ দিয়ে ওপর থেকে নীচ অবধি বুলিয়ে দিচ্ছে কাঁচা রঙের প্রলেপ।

আমি ঘরের মধ্যে তুলি দিয়ে আঁকছি, পবন মিস্ত্রী বাইরে। আসলে আমরা দুজনেই শিল্পী, দুজনের মধ্যেই রয়েছে সৃজনশীল সত্তা, একেকজনের প্রকাশ একেকরকমভাবে।

ছোটকাকাও শিল্পী ছিল। টুং টাং সুরগুলো একত্র করে কেমন ফুটিয়ে তুলত একটা মায়াভরা গান।

ছোটকাকা আসলে একদম অন্যরকম ছিল। একসময়ে প্রেসিডেন্সির চোখধাঁধানো ছাত্র, সোনার মেডেলও পেয়েছিল। মা-র মুখে শুনেছিলাম, ছোট থেকেই নাকি ছোটকাকা ছিল তুখোড় স্মৃতিশক্তির অধিকারী। আমাদের এই ভট্টাচার্য বাড়ি বনেদিয়ানার গুরুভারে খ্যাত হলেও বাবা বা মেজোকাকা পড়াশুনোয় তেমন নজরকাড়া ছিলেন না।

বাবাকে তো ছোটবেলাতেই পরিস্থিতির চাপে সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল, ঠাকুরদা হঠাৎ মারা যাওয়াতে ব্যবসায় যে অপার শূন্যস্থানের সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাতে বাবা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বাবা কর্মোদ্যমী পুরুষ, বছরদশেকের মধ্যে একইসঙ্গে ব্যবসা এবং পুরোহিত সংগঠন, দুটোকেই কয়েক গুণ বাড়িয়ে ফেলেন।

ওদিকে মেজোকাকা, মানে টিকলির বাবা, বরাবরই নির্বিরোধী, লেখাপড়া থেকে শুরু করে উদ্যম, সবেতেই সাধারণ। তাঁকে নিয়ে কারুর আশা-নিরাশা কিছুই ছিল না, পড়াশুনোর পাট চুকলে দাদার হাত ধরে ব্যবসায় বসে পড়বেন, তা একরকম নির্ধারিতই ছিল।

মেজোভাইকে ব্যবসায় সহকারী হিসেবে নিলেও ছোটভাই তাড়াতাড়ি ব্যবসায় আসুক, তা বাবা চাননি। ততদিনে বাবা এই ভট্টাচার্য বাড়ির অভিভাবক হয়ে উঠেছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল না যে ছোটকাকা পড়া শেষ করেই ব্যবসায় ঢুকুক। বরং বাবা চেয়েছিলেন ছোটকাকা আরও পড়ুক।

কিন্তু বাবা চাইলেই তো আর সবকিছু হয় না! ছোটকাকার ঈশ্বরপ্রদত্ত মেধা থাকলেও তাঁর ধ্যান জ্ঞান ছিল বেহালা। আমাদের তিনতলার চিলেকোঠার ঘরে বসে যখন বেহালায় তিনি করুণ সুরের মূর্ছনা তুলতেন, সারা বাড়ি যেন স্তব্ধ হয়ে যেত, মনে হত তানসেনের মতো ছোটকাকার সুরলহরীতে এখুনি বুঝি আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামবে।

তখন আমি ছোট হলেও সেই অনবদ্য ঝঙ্কার বেশ মনে আছে।

পেছনে চুড়ির রিনরিনে শব্দতে আমার চিন্তার তাল কেটে গেল। পেছন ফিরে দেখি, মা। আমার কিছু শার্ট গুছিয়ে রাখছেন হ্যাঙ্গারে, হালকা গলায় বললেন, "রূপ, বুধোর মা-কে এবার পুজোয় কিন্তু একটা আলাদা করে কাপড় দিবি, বুঝলি?"

আমি মোটা ব্রাশটাকে জলে ধুতে ধুতে বললাম, "কেন? তুমি তো দেবেই মাসিকে। তা ছাড়া পুজোয় মন্দিরে যে শাড়িগুলো প্রণামীতে আসবে, সেখান থেকেও তো তুমি প্রতিবছর ...!"

"সে তো আমি দেব। তোকে বুধোর মা ছোট থেকে যে গড়েপিটে মানুষ করল, তুই প্রথমবার চাকরি পেয়ে ওকে কিছু দিবি না?" মা বললেন, "গরিব মানুষ, তোর কাছ থেকে একটা কাপড় পেলে কত খুশি হবে বল তো?"

আমি হাসলাম। উঠে গিয়ে পেছন থেকে মা-কে জড়িয়ে ধরলাম, "তা মাদার টেরিজা, আপনি কী নেবেন পুজোতে?"

"আমি আবার কী নেব!" মা হেসে ফেললেন, "এক গাদা শাড়ি আছে আমার, তাছাড়া পুজোয় তো আর আমাদের ঠাকুর দেখার ব্যাপার নেই যে নতুন শাড়ি ভাঙব। সেই তো ঠাকুরদালানেই দিনরাত ভোগ, জোগাড়! শুধুশুধু পয়সা নষ্ট করিস না তো! বরং টিকলি আর মেজোকাকিমাকে …।"

আমি এবার চটে গেলাম, "তোমাকে যখনই কিছু বলি, তুমি কখনো হ্যাঁ বলতে পারো না বলো? এইজন্য তোমাকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না। পুজোর জোগাড় করবে তো কী আছে, রাতে আমি তোমাকে নিয়ে ঠাকুর দেখতে যাব। তুমি কি শাড়ি নেবে বলো।"

মা মুখ টিপে হাসলেন, "কী শাড়ি তুই দিবি বল, তাই নেব।"

"কী শাড়ি!" আমি এবার একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম, শাড়ির সম্পর্কে আমার ধারণা খুবই সামান্য। ভেবেটেবে বললাম, "সিল্কের শাড়ি?"

"সিল্ক আবার কোনো কথা হল! কত রকমের সিল্ক আছে জানিস? পিওর সিল্ক, তসর সিল্ক, গিচা সিল্ক !" মা গড়গড় করে নামতা শুরু করতেই আমি থামিয়ে দিলাম, "বুঝেছি বুঝেছি। আমি ওই … ইয়ে … পিওর সিল্কই দেব। তুমি কবে আমার সঙ্গে দোকানে যাবে বলো। তখনই টিকলি আর কাকিমারটাও তুমি পছন্দ করে দেবে।"

মা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর বাবা? বাবাকে নিয়ে যাবিনা?"

আমি ভ্রূ কুঁচকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। বাবাকে নিয়ে মার্কেটিং এ যাব? মা-র মাথা ঠিক আছে তো?

আমি আবার আঁকায় মন দিতে দিতে বললাম, "খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই, হুহ!"

"অমন বলে না রূপ। উনি তোর বাবা, কত ভালোবাসেন তোকে, ছোট থেকে তোর কিছুর অভাব অপূর্ণ রাখেননি উনি, আর সেখানে প্রথম চাকরি পেয়ে বাবাকে কিছু দিবি না?"

"দেব না কোথায় বললাম!" আমি বিড়বিড় করলাম, "তোমাকে টাকা দিয়ে দেব, তুমি কিনে নিয়ে আসবে। মিটে গেল।"

"আমার কতদিনের ইচ্ছে ছিল আমি তুই আর তোর বাবা একদিন একসঙ্গে সারাদিন কলকাতা ঘুরব, কেনাকাটা করব, খাওয়াদাওয়া করব, তারপর গড়ের মাঠে কিছুক্ষণ হাওয়া খেয়ে বাড়ি ফিরব।" মা এসে আমার কাঁধে আলতো হাত রেখে বাইরের দিকে উদাস চোখে একটা নিশ্বাস ফেললেন, "এজন্মে বোধ হয় আর সেটা হল না!"

"হবেও না।" আমি কেটে কেটে বললাম "তোমার অপদার্থ সন্তানকে নিয়ে বসন্ত ভট্টাচার্য প্রকাশ্যে বেরোবেন? বাবা! পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টবাবুর সম্মান ধুলোয় লুটোপুটি খাবে তো তাহলে!"

"এভাবে বলিস না।" মা ক্ষুণ্ণ হলেন, "তোকে উনি অপদার্থ কবে বললেন রূপ?"

"সবকিছু মুখে বলতে হয় না মা! আচার আচরণেও বোঝা যায়। ওঁর কাছে কেউ টাকা তৈরির মেশিন না হলেই, কেউ সারাদিন পুজোআচ্চা নিয়ে পড়ে না থাকলেই সে অপদার্থ, নিষ্কর্মা। যেমন আমি।"

আজ পর্যন্ত মা আর আমার নিভৃত কথোপকথনে কখনো বাবার বিরুদ্ধে মা-কে আমি কিছু বলতে শুনিনি, অথচ এই মা-ই যে বাবাকে আমার অনুপস্থিতিতে আমার সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলেন, তাও আমি জানি।

মায়েরা বোধ হয় এমনই হয়!

এখনো সেটাই হল। মা বাবার পক্ষ নিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় আমার ফোন বাজল।

আমি ঝুঁকে পড়ে ফোনটা হাতে নিতে মা বললেন, "কে?"

আমি চাপা গলায় "হিটলার" বলে ফোনটা রিসিভ করতেই ওপাশ থেকে বাবার জলদগম্ভীর স্বর ভেসে এল, "মঙ্গলরূপ, আমি আজ একটা টিভি চ্যানেলে যাচ্ছি কথা বলতে। আশা করি এর ফলে জটিলতা অনেকটাই কমে যাবে। কাল তোমাকে একবার ওই দিওতিমা বলে মেয়েটার সঙ্গে দেখা করতে হবে। জগদীশকে ফোনটা দিচ্ছি, ও তোমায় সব বুঝিয়ে বলছে।"

আমি হাঁ হাঁ করে বলতে গেলাম, "ক-কাল কী করে হবে, কাল তো আমার অফিসে একটা জরুরি ...!"

কিন্তু ততক্ষণে রিসিভার চলে গেছে জগদীশকাকার কাছে।

জগদীশকাকা আমাদের পারিবারিক হার্ডওয়্যার ব্যবসার ডানহাত বলা চলে। হাওড়া ময়দানের ওপরে ভট্টাচার্য পরিবারের ক্লাসিক হার্ডওয়্যার এখন আর নেহাত একটা দোকান নেই, রীতিমতো ব্র্যান্ড। খুচরো পেরেক থেকে শুরু করে বিশাল বিশাল রড, সিমেন্ট, সবকিছুর এ-তল্লাটের একচেটিয়ে ডিলার আমরা। আর এই প্রকাণ্ড ব্যবসার কাণ্ডারি যেমন আমার বাবা, সারথি তেমনই এই জগদীশকাকা। আমি জ্ঞান হওয়া ইস্তক কাকাকে দেখছি। অব্রাহ্মণ হলেও পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশনের যাবতীয় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডও কাকা দেখেন।

জগদীশকাকার বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ, গায়ের রং একসময় বেশ পরিষ্কার থাকলেও দিনরাত লোহালক্কড়ের ধান্দায় থেকে থেকে ময়লাটে হয়ে গেছে, চোখদুটো কুতকুতে ধরনের। কথা খুব কম বলেন, শোনেন অনেক বেশি। তুখোড় ব্যবসাবুদ্ধি।

ফোনটা ধরেই জগদীশকাকা মোলায়েম গলায় বললেন, "কে রূপ?"

আমি বেজার গলায় বললাম, "হ্যাঁ বলুন।"

"রূপ, ওই মেয়েটাকে ভালোভাবে বোঝাতেই হবে। ঝন্টু গিয়েছিল, কোনো লাভ হয়নি।" জগদীশকাকা নরম গলায় বলতে লাগলেন, "আসলে তোমরা এখনকার দিনের লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে, ওইসব জোরজার করে কিছু হয় নাকি? তুমি একটু গিয়ে ভালো করে বোঝাও। আজ বসন্তদা টিভি চ্যানেলে গিয়ে যা বলবেন, তাতেই অবশ্য ওর মনোবল অর্ধেক ভেঙে যাবে, সেই অবস্থায় গিয়ে তুমি কেসটা তুলে নেওয়ার জন্য বোঝাবে। বাচ্চা মেয়ে, রাজি হয়ে যাবে।"

রাগে আমি কিছু বলতে পারলাম না। কালই আত্মারামদা বলছিল ওই ঝন্টু নাকি জগদীশকাকারই কীরকম ভাইপো।

তা কাকা হঠাৎ তাঁর নিজের ভাইপো ছেড়ে আমার ওপর নির্ভর করতে শুরু করলেন কেন!

”কাল আমার অফিসে খুব জরুরি একটা কাজ আছে কাকা, আপনি প্লিজ বাবাকে একটু …!” আমি থেমে গেলাম, কারণ ওপাশে ফোন ইতিমধ্যে পিঁ পিঁ শব্দ তুলে কেটে গেছে।

আমার হতাশ মুখ দেখে মা বললেন, ”কী হয়েছে? কী বলছেন তোর বাবা?”

”কী আর বলবে! দেশ স্বাধীন হয়ে গেছে সত্তর বছর হল, কিন্তু এই বসন্ত ভটচাজ কাউকে স্বাধীনভাবে বাঁচতে দেবে না।” চেঁচিয়ে কথাটা বলে বিরক্তিতে রাগে আমি মোটা তুলিটা দিয়ে এতক্ষণ ধরে আঁকা সাধের ঘোড়াটার ওপর আড়াআড়ি কালো দাগ টেনে দিলাম।

চার

আমি ওইপ্রান্তে ‘হ্যালো’ শুনেই বললাম, ”ছবিদাদু, আজ সন্ধেবেলা তোমাকে এক জায়গায় যেতে হবে আমার সঙ্গে। ফ্রি থাকবে কিন্তু।”

ছবি দাদু বললেন, ”সে না হয় যাব। তোর মা ফোন করেছিল একটু আগে। বলল, চায়ের দোকানে তোকে নাকি কারা হুমকি দিয়েছে?”

আমি মুখ দিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের শব্দ করে বললাম, ”ধ্যুত! মা-র সবেতেই বাড়াবাড়ি। হুমকি না ছাই, তিনটে লোফার ছেলে এসে একটু মাস্তানি দেখালেই সেটা হুমকি হয়ে গেল? লোকজন তেমনই। নিবারণকাকা আসল সময়ে কোনো প্রতিবাদ করল না, এখন মা-র কানে কথা তোলার বেলায় ঠিক আছে। ওসব ছাড়ো তো! আমি তোমাকে অন্য একটা কারণে ফোন করেছি।”

দাদু বললেন, ”বল।”

”দুর্গাপুজোর সাবেক নিয়মের যে বইটা আমায় দিয়েছিলে, তাতে দেখলাম, বালিগ্রামের নাম রয়েছে। এই বালি কি আমাদের উত্তরপাড়ার বালি নাকি?”

”তা তুই কী ভাবলি! বালিদ্বীপ না বলিভিয়া, কোনটা?” দাদু মিটিমিটি হাসলেন ও-প্রান্ত থেকে।

”না, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। বালি এত পুরোনো জায়গা নাকি!”

”এত কথা তো ফোনে বলা যাবে না, তুই আয়, পুরোটা বলব’খন। আজই আয় অফিসফেরত।”

”আজ হবেনা, বললাম না?” আমি মনে করিয়ে দিলাম, ”একটা টিভি চ্যানেলে যাব আজ।”

”টিভি চানেল? এই যে বললি তুই ওসব করবি না? তোকে তো বলেছি, মিডিয়ার ওপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়লে ওরা যখন নামিয়ে দেবে তখন তোকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।”

”এটা এমনি কোনো স্কুপ নয় দাদু, এখানে ওই পুরোহিতদের পাণ্ডাও আসছে। আমিও ভেবে দেখলাম। আমার বক্তব্যটাও জনসাধারণের কাছে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা উচিত। তাতে সমর্থনটা তো পাব।” আমি এক মুহূর্ত থামলাম, ”ওরা আমার সমর্থনে বলার জন্য আরও একজনকে চেয়েছে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে।”

”আমি?” দাদু বিড়বিড় করলেন, ”সেরেছে! আমি ভাবলাম সন্ধেবেলা একটু…।”

”সন্ধেবেলা তুমি আমার সঙ্গে যাবে, ব্যস! বালিঘাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি তোমাকে নিয়ে আসব।” উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফোনটা কেটে দিলাম আমি।

সত্যি, যার সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্কটুকুও নেই, তার ওপর কত জোর খাটাই আমি। যে আমার কেউ হয়না, সে কেমনভাবে মনোবল জোগাচ্ছে আমায় প্রতিনিয়ত। এদিকে আমার নিজের মা কিনা ক্রমাগত বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছে।

পরক্ষণেই নিজের মনকে প্রবোধ দিলাম আমি। মা তো আসলে ভালোর জন্যই বারণ করছে আমাকে। সেই ফেব্রুয়ারি মাসে যখন ঠিক করেছিলাম পাড়ার বারোয়ারি ক্লাবের সরস্বতী পুজোটা আমিই করব, কই তখন তো বাধা দেয়নি! বরং উৎসাহই দিয়েছিল। আসলে মা-র কাছে এখন আমার নিরাপত্তা সবচেয়ে বড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সত্যিই! এখনো ভাবলে আশ্চর্য লাগে। এই বছরের সরস্বতী পুজোই যেন আমার মনের মোড় অনেকটা ঘুরিয়ে দিল। পেছন ফিরে তাকালে স্পষ্ট মনে পড়ে সেদিনের কথা। আর মনে পড়লেই নিজের অজান্তে চোয়াল শক্ত হয়ে আসে আমার, মনে হয় লন্ডভন্ড করে দিই চারদিক।

আজ পর্যন্ত সেদিনের মতো অপমানিত আমি কোনোদিন হইনি।

পাড়ার কচিকাঁচাদের নিয়ে ঠিক করেছিলাম সরস্বতী পুজো করব। চাকরি পাওয়ার আগে ক-টা টিউশনি করতাম, সেইসব বাচ্চাদের নিয়েই। আমাদের বাড়ির পাশেই একফালি মাঠ। সেখানেই চাঁদোয়া খাটিয়ে বানানো হয়েছিল ছোট্ট প্যান্ডেল। সাত-আট বছরের ছেলেমেয়েগুলো সারাদিন উৎসাহভরে থার্মোকোল কেটে কেটে বানিয়েছিল শোলার বাড়ি। ছোটো থেকে ছবিদাদুর কাছে শিখে মন্ত্র ছিল আমার কণ্ঠস্থ, ঠিক করেছিলাম আমিই পুজো করব বাগদেবীর।

সকাল থেকে সব আয়োজন যখন শেষ, আমি পুজো করতে বসব, ঠিক সেই মুহূর্তেই রে রে করে এসে চড়াও হয়েছিল ক-টা ছেলে। আমাদের কোনো কথা বলার সুযোগই দেয়নি, বাচ্চাগুলোকে ঠেলে ফেলে ফুল, মালা, কেটে রাখা ফল, সব ছত্রাকার করতে করতে হিসহিসে গলায় বলে চলেছিল ওরা, ”ইশ! খুব শখ না! মেয়েছেলে, পুজো করবে। আহ্লাদ কত!”

আমি চিৎকার করে বলেছিলাম, ”একি, তোমরা ফুলগুলো ছিঁড়ছ কেন? আমরা তো পুজো করছি, কারুর কোনো ক্ষতি তো করিনি।”

সামনের ছেলেটা এসে উদ্ধতভাবে বলেছিল, ”কতবার বারণ করা হয়েছে কাল থেকে তোদের? অরূপদার লোক এসে বলে যায়নি এসব বাঁদরামি বন্ধ করতে? ছ্যাবলামি হচ্ছে, অ্যাঁ? ঠাকুর দেবতা নিয়ে ছ্যাবলামি?”

”আমরা তো পুজো করছি, দিদি তো কিছু করেনি ...।” আমার ক্লাস টু-তে পড়া ছাত্র টুপাই কথাটা শেষ করার আগে ছেলেটা ওর ঘাড় চেপে ধরেছিল, ”এই শালা, চার আনা চার আনার মতো থাক। নইলে পিটিয়ে এক আনা করে দেব।”

কাল থেকে কানাঘুষো শুনছিলাম, স্থানীয় এম এল এ’র নাকি ঘোরতর আপত্তি আছে আমি পুজো করাতে।

কিন্তু, সেই আপত্তির শোধ যে এমনভাবে তুলবে, সেটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

তবু আমি চোখে চোখ রেখেছিলাম, ”আপনাদের অরূপদা তো দারুণ লোক! পাড়ার মোড়ে যখন স্কুলের মুখ না দেখা গুন্ডাগুলো সরস্বতী পুজোর নাম করে বাড়ি বাড়ি চাঁদা লুটে সেই টাকায় নাম কা ওয়াস্তে পুজো করে আর মদ-মাংস সাঁটায়, সেইসময় আপনাদের অরূপদা আপত্তি করেন না কেন? ওঁর নিজের লোক বলে?”

তুই তুই করা ছেলেটার মুখ উত্তেজনায় লাল হয়ে গিয়েছিল, সে বোধ হয় ঠিক করতে পারছিল না ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে গালাগাল শুরু করবে কিনা, তার মধ্যেই পাশ থেকে আরেকটা ছেলে এগিয়ে এসেছিল।

সে ওদেরই দলের, কিন্তু একটু ভদ্রসভ্য। বলেছিল, ”দেখুন দিদি, কাল থেকে তো এম এল এ স্যার বারণ করে পাঠাচ্ছিলেন, তবু আপনি পুজো করতে যাচ্ছিলেন কেন? যা খুশি তাই করলেই হল? একটা কোনো নিয়ম নেই? আপনি কি পুরুত, অ্যাঁ? আপনি ব্রাহ্মণ? এগুলো কি ইয়ার্কি বলুন তো?”

আমি আর একটা কথাও বলিনি সেদিন। দাঁতে দাঁত চিপে সহ্য করেছিলাম ওদের দৌরাত্ম্য।

সেদিন ওই আট-দশটা বাচ্চার মুহূর্তে নিভে যাওয়া মুখ আর আমার ওই অপমানের কথা ভাবলেই আমার শরীরে রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে যায়। বাচ্চাগুলো হয়তো ভুলে গেছে, কিন্তু আমি ভুলিনি।

ভুলিনি এক সেকেন্ডের জন্যেও।

তারপরেই আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম এর শেষ দেখে ছাড়ব। সমাজ যদি আমাকে উঠে দাঁড়াতে না দেয়, আইনের পথে উঠে দাঁড়াব আমি।

যত বাধা আসে আসুক, হাল আমি কিছুতেই ছাড়ব না।
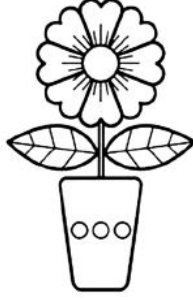
পাঁচ

টিকলি বলল, "দাদাভাই, তুই তো কাল ওই মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে যাবি। সাড়ে ছ-টা থেকে 'এখন বাংলা' চ্যানেলে ও আসবে, একটা আলোচনাসভা হবে। শুনবি?"

আমি আমার ঘরের বিছানায় শুয়েছিলাম। বাবার ফোনটার পর থেকে রবিবারের মুডটাই কেমন নষ্ট হয়ে গেছে। কাল অফিসে দিব্যেন্দুদা আর আমার একটা জরুরি মিটিং ছিল। সব কিছুর দফারফা।

তিরিক্ষি স্বরে আমি বললাম, "ধুর! আমি শুনে কী করব। আমার ওইসব ব্যাপারে কোনো ইন্টারেস্ট নেই। তুই যা তো!"

টিকলি একটু নিভে গেল। তবু বলল, "না জেঠুমণি আর ওই মেয়েটা সামনাসামনি কথা বলবে তো, তাই বলছিলাম। আজ পুরোটা শুনে একটা আইডিয়া হলে তোর সুবিধা হবে।"

আমি এবার মনে মনে অবাক হলাম। বাবা এখন ওই মেয়েটার সঙ্গেই টিভি শো-তে কথা বলতে গিয়েছেন? তবু কাল আমাকে আবার যেতে হবে কেন? বসন্ত ভট্টাচার্যের হালহকিকত কিচ্ছু বোঝা যায় না। সবসময় কেমন একটা কূটনৈতিক চিন্তাভাবনা।

এই ধরনের কৌশলী কর্মকাণ্ডগুলো পুরোপুরি বাবার হতেই পারে না, নির্ঘাত জগদীশকাকা এই চালগুলো চালছেন। সেইজন্যই কাকা বললেন, "আজ মেয়েটার অর্ধেক মনোবল ভেঙে যাবে।"

মানে বাবা আজ মেয়েটাকে প্রকাশ্যে ল্যাজেগোবরে করবেন।

আমি বললাম, "তুই শিওর? বাবা আর ওই মেয়েটা একটাই শো-তে আসছে? না আলাদা আলাদা চ্যানেলে?"

"নারে।" টিকলি বলল, "আমি দেখেছি। দুজনেই যাচ্ছে 'এখন বাংলা' চ্যানেলের 'এই মুহূর্তে' টক শো-তে।" ও ঝুঁকে পড়ে আমার ঘরের দেওয়ালঘড়িটা দেখল, "সাড়ে ছ-টা বাজছে প্রায়। তুই কি যাবি? নাহলে আমি চললাম নীচে।" কথাটা বলে টিকলি আমার উত্তরের অপেক্ষা না করে চলে গেল।

আমি দ্বিধাগ্রস্তভাবে শুয়ে রইলাম।

যতই মুখে রাগ দেখাই, কাল আমাকে কথা বলতে যেতেই হবে। তার চেয়ে এখন টক শো-টা শুনলে হয়তো কাল প্রশ্ন করতে বা বুঝতে সুবিধা হবে। এই ক-দিন খবরের কাগজে বিষয়টা নিয়ে প্রচুর চর্চা হলেও আমি হেডলাইন ছাড়া খুব একটা কিছু পড়িনি।

আগ্রহই হয়নি।

একটু পরে নীচের বৈঠকখানায় যখন গিয়ে ঢুকলাম, তখন অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গেছে।

টিকলি, মা, মেজোকাকিমা, তিনজনেরই উৎসুক চোখ টিভির পর্দায়।

সঞ্চালক হাসি হাসি মুখে বসে আছেন, পাশেই বসে আছেন আমার বাবা, ডানদিকে আরও দুজন ভারিক্কি ব্যক্তি।

সঞ্চালকের অন্যপাশে রয়েছে খবরের কাগজে ছবি দেখা সেই মেয়েটা। আমি দেখেই চিনতে পারলাম।

সাধারণ একটা কুর্তি পরে বসে আছে। চাপা রঙ, চুলটা পেছনে চুড়ো করে বাঁধা। মুখে তিলমাত্র প্রসাধন নেই, শুধু চোখের তলায় সামান্য কাজল।

তবে, চোখদুটোয় জ্বলজ্বল করছে দৃঢ় প্রত্যয়, মুখের পেশিগুলো দেখলেই বোঝা যায় এ'মেয়ে সহজে মাথা নোয়াবার নয়।

সঞ্চালক ততক্ষণে বলতে শুরু করেছেন, "নমস্কার। আপনারা দেখছেন 'এখন বাংলা এই মুহূর্তে'। আজ আপনাদের সামনে আমরা নিয়ে এসেছি এখনকার জ্বলন্ত একটি বিষয়কে। যে খবর আপনারা গত কয়েকদিন ধরে কাগজে, টিভিতে, রেডিওতে, সব জায়গায় পড়ছেন, শুনছেন, দেখছেন। আর যে মানুষটি একা ব্যতিক্রমীভাবে স্রোতের বিপরীতে হেঁটে ঝড় তুলেছেন বাংলা সমাজব্যবস্থায়, প্রত্যেকের মনেই তুলে দিয়েছেন যুক্তিসম্মত প্রশ্ন, আনতে চাইছেন ভীষণরকম একটা বদল, সেই মানুষটি আজ আমাদের সঙ্গে।"

সঞ্চালক হাসিহাসি মুখে মেয়েটার দিকে তাকালেন, "দিওতিমা বিশ্বাস। থাকেন উত্তরপাড়ায়, চাকরি করেন রাজ্য সরকারি দপ্তরে। দিওতিমা, আপনাকে অনেক অভিনন্দন আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য।"

মেয়েটা স্মিত মুখে হাতজোড় করে নমস্কার করল।

টিকলি ফিসফিস করল, "মেয়েটাকে দেখে কেমন যেন খেলোয়াড় খেলোয়াড় মনে হচ্ছে দ্যাখো। কোনো লাবণ্য নেই। এ হঠাৎ পুজো করতে চাইছে কেন?"

মেজোকাকিমা সোয়েটার বুনছিলেন উলকাঁটাতে, বুনতে বুনতেই বললেন, "হ্যাঁ, একটা দাপট আছে মুখের মধ্যে।"

আমি লক্ষ্য করলাম, হাসলেও মেয়েটার মুখভঙ্গি একটুও কোমল হল না।

"এ ছাড়া আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন তিনজন মান্যগণ্য ব্যক্তি।" সঞ্চালক এবার বাবার দিকে ফিরলেন, "আছেন শ্রী বসন্ত ভট্টাচার্য, যাকে আপনারা অনেকেই হাওড়ার শাস্ত্রীমশাই নামে চেনেন। বসন্ত ভট্টাচার্য অল বেঙ্গল পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট।"

আমি আড়চোখে দেখলাম, মা-র মুখটা কেমন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। স্বামীকে পর্দায় দেখার রোমাঞ্চ মা-র অভিব্যক্তিতে ঠিকরে বেরোচ্ছে।

বাবা স্বভাবসুলভ গম্ভীরভাবে মৃদু মাথা দোলালেন।

"রয়েছেন সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশিষ্ট পুরোহিত শ্রী বিরুপাক্ষ কৃত্যতীর্থ মহাশয়।" সঞ্চালক একে একে প্রত্যেকের সঙ্গে পরিচয় করালেন, "আপনাদের সবাইকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

"আহা, ওইটুকু মেয়ে তর্কে পারবে এত বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে?" মা অস্ফুটে বলে উঠলেন, "এ আবার কি অসম আলোচনা রে বাবা!"

"প্রথমেই আমরা চলে যাব দিওতিমা-র কাছে। দিওতিমা সম্প্রতি আপনি কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন এই মর্মে, যে পুরুষদের পাশাপাশি

মহিলাদেরও পুজো, বিয়ে এবং অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে দেওয়া হোক। আপনি এও দাবি করেছেন যে, পৌরোহিত্য করার জন্য চালু করা হোক এক যোগ্যতা-নির্ণায়ক পরীক্ষা, যাতে উত্তীর্ণ হলেই তবেই দেওয়া হোক পৌরোহিত্যের ছাড়পত্র। তাই তো?”

”হ্যাঁ।” দিওতিমা সংক্ষেপে মাথা নাড়ল।

”কিন্তু, আপনার কি মনে হয় না যে হিন্দুধর্মে পুজোর মতো এক স্পর্শকাতর বিষয়ে আমরা বংশকৌলীন্যে সুলক্ষণযুক্ত মানুষদেরই পুরোহিত হিসেবে গ্রহণ করে থাকি? মহিলারা পুরোহিত হলে কি একটু হলেও সেই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসে ঘা লাগবে না?” সঞ্চালক গলাখাঁকারি দিয়ে শুরু করলেন।

”প্রচলিত কথাটাই তো আপেক্ষিক।” শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলতে শুরু করল দিওতিমা, ”মানুষই কোনো অভ্যাসের প্রচলন করে, মানুষই সেটার পরিবর্তন করে। আমাদের সমাজ প্রথম থেকেই ছিল পুরুষতান্ত্রিক। এই যে ধর্ম, শাস্ত্র, সামাজিক প্রোটোকল সবকিছুই তৈরি করেছে কোনো না কোনো পুরুষ। পুরুষই বেঁধে দিয়েছে নারীর কী করা উচিত, কী করা অনুচিত। আগেকার দিনে নারী ঘরের বাইরে বেরোত না, কূপমণ্ডুক জীবনযাপন করত। সেইযুগের পরিপ্রেক্ষিতে নারীকে পুরুষনির্ভর জীবন কাটাতে শেখানো হল। একটা মেয়ে জন্মানোর পরেই তার মজ্জায় মজ্জায় ঢুকিয়ে দেওয়া হত, তুমি মেয়ে, তোমার একমাত্র কাজ হল শ্বশুরবাড়ি গিয়ে স্বামী ও তার পরিবারের সেবা করা, তাঁদের বংশধরকে গর্ভে ধারণ করা। তোমার নিজের কোনো পরিচয় নেই, তোমার নিজের কোনো শক্ত খুঁটি নেই, তুমি আজীবন কখনো পিতা, কখনো স্বামী, কখনো পুত্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। তুমি মেয়ে বলে পড়াশুনো শিখবে না, তুমি মেয়ে বলে যেখানে সেখানে যেতে পারবে না, তুমি মেয়ে বলে তোমাকে ঘোমটা বা পর্দার আড়ালে থাকতে হবে।” দিওতিমা একটানা বলে ঈষৎ থামল, ”এটা হিন্দু, মুসলিম বা খ্রিস্টান বলে নয়। সব ধর্মে, সব দেশেই নারীরাই লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত হয়েছে। যে-কোনো যুদ্ধ, বিদ্রোহ, প্রতিহিংসার বলি তাদেরকেই হতে হয়েছে। যুগ এখন পালটেছে। এখন মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে বাইরের জগতে বেরোচ্ছে, পড়াশুনো শিখছে, চাকরি করছে, সব ক্ষেত্রেই তাঁরা সমান পারদর্শিতা দেখাচ্ছে। তাহলে, পুজোতেই বা তারা অধিকার পাবে না কেন? বেদে যে গৃহ্যসূত্র রয়েছে, তাতে কোথাও বলা নেই যে বিবাহদান বা পৌরোহিত্য একমাত্র পুরুষের অধিকার।”

দিওতিমার পাশে বসে থাকা অধ্যাপক ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় এবার মুখ খুললেন, ”বলার প্রশ্নও নেই। কারণ, বেদে লোপামুদ্রা, অপালা, পৌলমী-র মতো অনেক মহিলা-ঋষি ছিলেন। তাঁরা মন্ত্রদর্শনও করতেন। হাজার বছর আগে যদি তাঁরা মহিলা হয়ে পুজো করতে পারেন, মানুষ তাঁদের মেনে নিতে পারে, এখন পারবে না কেন?”

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় ভদ্রলোক বেশ সৌম্যদর্শন, দেখলেই একটা শ্রদ্ধা জেগে ওঠে।

আমি মায়েদের দিকে সমর্থনের ভঙ্গিতে তাকালাম, ”ঠিকই তো বলছেন ইনি। গার্গী, মৈত্রেয়ী এঁরা সবাই তো বেদের সময় ঋষি ছিলেন!”

টিকলি কোনো কথা না বলে ইশারায় চুপ করে শুনতে বলল।

মেজোকাকিমা মাথা নাড়লেন, ”মেয়েটা ভালো বলে কিন্তু!”

সঞ্চালক এবার বাবার দিকে ফিরলেন, ”মাননীয় শাস্ত্রীমশাই, আমরা সকলেই জানি, অল বেঙ্গল পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আপনি প্রথম থেকে বাধা দিয়ে

আসছেন। এর আগেও আপনি ইন্টারভিউতে জানিয়েছেন, মহিলারা পুরোহিত হলে আপনারা বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে যাবেন। আমি আপনাকে এখন আপনার বক্তব্য জানাতে অনুরোধ করছি।”

বাবা গম্ভীরমুখে বললেন, ”মেয়েরা যে পৌরোহিত্য করতে পারেন, এমন বিধান কোন শাস্ত্রে দেওয়া আছে? উপনয়নের মাধ্যমে হিন্দু বালকদের ব্রাহ্মণ্য সংস্কারে দীক্ষিত করা হয়। তাদের ব্রহ্মোপদেশ শিক্ষা দেওয়া হয়। মনুস্মৃতিতে স্পষ্ট বলা আছে, উপনয়নের পরেই তারা ব্রহ্মচারী হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। মেয়েদের কি উপনয়ন হয়? মেয়েরা কি উপবীত, মানে পৈতে ধারণ করতে পারেন? যাদের উপবীতই নেই, তাঁরা প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করবেন কি করে? বলপূর্বক সবকিছু করলেই তো হল না, সব কিছুর একটা নিয়মরীতি আছে।”

দিওতিমা এবার বলল, ”উপনয়নের সময় শরীরে যজ্ঞোপবীত ধারণ করা হয়। সেটাকেই আমরা পৈতে বলি। এই পৈতে আসলে হল তিনটে পবিত্র সুতো যা দেবী সরস্বতী, গায়ত্রী ও সাবিত্রীর প্রতীক। যেখানে তিনজন দেবীর আরাধনা করা হচ্ছে, সেখানে কি করে কোনো নারী উপনয়ন থেকে বঞ্চিত হতে পারেন?”

”এটা কোনো কথা হল?” বাবা এবার বেশ গর্জে উঠলেন, ”নারীদের কোনো নিজস্ব গোত্র আছে? বিবাহের আগে পরে তাঁদের গোত্র পরিবর্তন হয়। নারীদের আবার পৈতে কি?”

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় এবার কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, দিওতিমা স্মিত হেসে তাঁকে চুপ করিয়ে দিয়ে বলল, ”মাননীয় শাস্ত্রীমশাই, আপনার এই আলোচনায় আসার আগে আরেকটু পড়াশুনো করে আসা উচিত ছিল।”

আকস্মিক এই কথাটা শুনে বাবার মুখটা মুহূর্তে রক্তাভ হয়ে গেল।

টিকলি বলল, ”দেখেছ জেঠিমা, মেয়েটা কীরকম বদমেজাজি! এতবড় একটা মানুষের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় জানেনা!”

মা কোনো উত্তর দিলেন না, শুধু স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন টিভির দিকে।

দিওতিমা ততক্ষণে বলতে শুরু করেছে, ”আর্যযুগে নারী পুরুষ প্রত্যেকেই উপবীত ধারণ করতেন। উপনয়নে তখন দুজনের সমান অধিকার ছিল। মহাকবি পাণিনি পর্যন্ত মহিলা অধ্যাপক আচার্যনির দীক্ষা এবং উপনয়নের কথা লিখে গিয়েছেন। কেন আপনি স্মৃতিচন্দ্রিকা পড়েননি?”

বাবা-র স্তম্ভিত মুখ উপেক্ষা করে দিওতিমা একটা সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করতে আরম্ভ করল,

”পুরাকল্পে তু নারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষতে।

অধ্যাপনঞ্চ বেদনাং সাবিত্রীবচনং তথা।।

এর অর্থ পুরাকল্পে নারীদের শুধু উপবীত ধারণই নয়, বেদ অধ্যাপনা, সাবিত্রী পাঠ সবকিছুরই প্রচলন ছিল। ভণ্ড পৌরাণিক পুরোহিতরা পুরুষতন্ত্র কায়েম করতে গিয়ে এরপর নারীদের শাস্ত্রপাঠ বন্ধ করে দেয়, তারপর ধীরে ধীরে সতীদাহ, বাল্যবিবাহের মতো জঘন্য সব প্রথা চালু হতে থাকে কালের অপভ্রংশে। নাহলে, আমাদের হিন্দু ধর্মের মতো ক-টা ধর্মে এতজন নারী ঋষি ছিলেন? আর আপনি প্রণব মন্ত্র উচ্চারণের কথা বলছেন? কক্ষিবান ঋষির কন্যা ঘোষা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩৯ থেকে ৮১ নম্বর

সুক্তের দ্রষ্টা ছিলেন, ঋষিকা বাক ছিলেন বিখ্যাত দেবীসুক্তের দ্রষ্টা, আর আপনি বলছেন মহিলারা মন্ত্রোচ্চারণই করতে পারবেন না! যুগ কি এগোচ্ছে না পিছোচ্ছে?"

আমি বাবার দিকে তাকিয়ে টিভির এ-পাশ থেকেও স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম, বাবা এতটাই অপমানিত হয়েছেন যেকোনো কথা বলতে পারছেন না। অহমিকার কঠোর আবরণ ভেদ করে বাবা-র কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবটা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছিলাম বেশ।

সঞ্চালক এবার বললেন, "ধন্যবাদ আপনাকে দিওতিমা, এত সুন্দরভাবে বিষয়টি আমাদের বোঝানোর জন্য। আমি এবার যাব বিশিষ্ট পুরোহিত শ্রী বিরুপাক্ষ কৃত্যতীর্থ মহাশয়ের কাছে। কৃত্যতীর্থ মশাই, আপনি কী মনে করেন এই ব্যাপারে? কোনো মহিলা পৌরোহিত্য করলে আপনি কি মেনে নেবেন?"

বিরুপাক্ষ কৃত্যতীর্থ ধীরে ধীরে বললেন, "দেখুন, আমি বড় হয়েছি রামকৃষ্ণ মিশনে। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন মেয়েদের বেদ পাঠের অধিকার কেড়ে নেওয়ার পর থেকেই তাঁরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে পড়তে থাকেন। মেয়েদের দূরে সরিয়ে রাখা ছিল তাঁর ঘোরতর অপছন্দ। তাই আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা সারদা মঠে পুজো করেন ওখানকার সন্ন্যাসিনীরাই। এমনকী, শ্রী শ্রী মা-ও একসময় পুজো করেছেন। কাজেই, বারোয়ারি পুজোয় মেয়েরা পৌরোহিত্য করতেই পারেন। ট্র্যাডিশন তো কখনো নিয়ম হতে পারেনা।"

"তার মানে আপনি বলতে চাইছেন পিতৃদত্ত অধিকারে যারা পৌরোহিত্য করেন, সেই কুলীন ব্রাহ্মণরা যোগ্য নন?" আমার বাবা তীক্ষ্নগলায় বললেন।

"দেখুন শাস্ত্রীমশাই, আপনি প্রবীণ মানুষ। আপনার সঙ্গে তর্ক করার ধৃষ্টতা আমার নেই।" নম্রভাবে বললেন বিরুপাক্ষ কৃত্যতীর্থ, "সব ব্রাহ্মণই যে পুজো করার জন্য অযোগ্য, সে-কথা বলার মতো অর্বাচীন আমি নই। কিন্তু, আপনি বলুন তো, প্রত্যেকেই কি যোগ্য? আমরা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করি, মন্ত্র যদি নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করা যায় তবেই তা ভগবানের কাছে পৌঁছয়। আজকাল তো দেখি এমন অনেকে পুজো করছেন যাঁরা ভালো করে মন্ত্রই উচ্চারণ করতে পারেন না, তাঁদের উচ্চারণ শুনে সাধারণ মানুষও ভুলপথেই পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছেন। এঁরা কি সত্যিই যোগ্য?"

"তার মানে আপনি বলছেন, পুরুষ, মহিলা, বৈশ্য, শূদ্র, লিঙ্গ এবং জাতিনির্বিশেষে যে কেউ পৌরোহিত্য করতে পারেন? দিওতিমা বিশ্বাসের জনস্বার্থ মামলার দ্বিতীয় দাবি তো ওটাই, যাকে খুশি তাকে পুজো করতে দিতে হবে। এটা কি আদৌ কোনো কথা হল! পুরোহিত পদটার কোনো সম্মান থাকবে না?" বাবা বললেন।

"সম্মান কি শুধুই পৈতৃক অধিকারে পেতে হয়?" দিওতিমা এবার বলে উঠল, "নিজের কর্ম, নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে পাওয়া যায় না? একজন ব্রাহ্মণপুত্র চরিত্রহীন, লম্পট হয়েও সে পুজো করবে? আর একজন শূদ্রসন্তান সৎ, পণ্ডিত এবং সমস্ত ব্যুৎপত্তি অর্জন করেও পিছিয়ে থাকবে? এটা কেমন নীতি? আর তাছাড়া প্রাচীন বৈদিক যুগে জাত নির্ধারিত হত তাঁর নিজের কর্মের মাধ্যমে। কোনো মানুষ অধ্যাপনা করলে ব্রাহ্মণ, তাঁর ছেলে ব্যবসা করলে বৈশ্য হতেন। তারপর থেকে আস্তে আস্তে পৈতৃক অধিকারে জাত নির্ধারণ শুরু হয়েছিল। পুরোহিত তো ঈশ্বর আর সাধারণ মানুষের মাধ্যম। সাধারণ মানুষের আকুতি, বার্তা, অর্চনা তিনি পৌঁছে দেন ঈশ্বরের কাছে মাধ্যম হিসেবে। সেই মাধ্যম যদি খারাপ হয়, অযোগ্য হয়, মানুষ ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবে কী করে?"

আমি শুনতে শুনতে চমকে উঠলাম। দিওতিমা-র কথাগুলো হুবহু আমাকে ছোটকাকার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ছোটকাকাও ঠিক এটাই বলতো, "পদবিতে নয়, কর্মে ব্রাহ্মণ হতে চেষ্টা কর রূপ!"

সঞ্চালক বললেন, "অর্থাৎ আপনার মামলার দ্বিতীয় দাবি অনুযায়ী আপনি চাইছেন সরকার একটা পরীক্ষা চালু করুক, যাতে যে কেউ বসে উত্তীর্ণ হলেই পুরোহিত হতে পারেন, তাই তো?"

"ঠিক তাই।" দিওতিমা সায় দিল, "আমার লড়াইটা শুধু নারীর অধিকার নিয়ে নয়, লিঙ্গ, জাতি নির্বিশেষে যোগ্যতার অধিকার নিয়ে। শ্রমবিভাজন যোগ্যতার নিরিখেই হওয়া উচিত। তাই আমি আপিল করেছি, যেকোনো পুজোয় পৌরোহিত্য করার জন্য পরীক্ষা নেওয়া হোক, তাতে পাশ করলে তবে পুজো করার লাইসেন্স দেওয়া হোক। তাতে আমরা মেয়েরাও নিজেদের প্রমাণ করতে পারব, আর এতে ব্রাহ্মণদেরও এত ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তাঁরাও নিশ্চয়ই নিজেদের প্রমাণ করতে পারবেন।"

দিওতিমার শেষ বাক্যে ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে আমার আত্মারামের মুখটা মনে পড়ে গেল।

সত্যি, আত্মারামকে যদি এখন পুরোহিত হওয়ার পরীক্ষায় বসতে হয়?

অন্য কিছু তো ছেড়েই দিলাম, ব্যাটা 'পুরোহিত' বানান ঠিকঠাক লিখতে পারবে আদৌ?

ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "আজ থেকে কয়েক দশক আগে বিদুষী অধ্যাপিকা গৌরী ধর্মপাল কলকাতার এক বিবাহবাসরে পৌরোহিত্য করে বিয়ে দিয়েছিলেন। এই নিয়ে তখন অনেক বিতর্কও হয়েছিল। তখনই উনি আমাকে বলেছিলেন, উচ্চগ্রামে সঠিক স্বরে উচ্চারিত হলে তবেই মন্ত্র ফলপ্রসূ হয়। পুরোহিতকে যে পুরুষ হতেই হবে, এমন কথা বেদ-এর কোথাও বলা নেই। সেই সঙ্গে একথাও বলা নেই যে, পুরোহিতকে ব্রাহ্মণ হতে হবে, ভারতীয় হতে হবে। পৌরোহিত্য করতে গেলে যেটা সর্বাগ্রে প্রয়োজন, সেটা মন্ত্রের সঠিক উচ্চারণ এবং অর্থ বুঝে মন্ত্রোচ্চারণ।" বৃদ্ধ অধ্যাপক সামান্য থেমে বললেন, "জানিনা দিওতিমা-র এই আপিলে সরকার কী পদক্ষেপ নেবেন, তবু আমরা যদি যোগ্য ব্যক্তির কদর করতে শুরু করি, তাতে ক্ষতি কী!"

কতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসেছিলাম জানিনা, হঠাৎ টিকলি গায়ে ঠ্যালা দিল, "এই দাদাভাই, 'এই মুহূর্তে' তো কখন শেষ হয়ে গেছে। আমরা এখন সিরিয়াল দেখবো। তুইও কি দেখবি নাকি!"

আমি চমকে উঠে দেখলাম, চ্যানেল কখন পালটে গেছে, এখন একটা মেগা সিরিয়াল শুরু হচ্ছে।

আমি ঘাড় নেড়ে বৈঠকখানা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। মাথাটা এখনো কেমন ভোঁ ভোঁ করছে।

আমার জগদীশকাকার বলা কথাটা মনে পড়ে গেল। "বসন্তদা তো মেয়েটাকে ল্যাজেগোবরে করে দেবেন!"

এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট যে বাবার মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্যক্তি আজ মেয়েটার সামনে নাস্তানাবুদ হয়ে গেলেন। আর সেখানে আমি যাব মেয়েটার সঙ্গে কথা বলতে!

আমার অবস্থা বুঝেই কিনা জানিনা, কাছাকাছি কোথায় একটা ছাগল যেন করুণসুরে ডেকে উঠল।

ছয়

সকালবেলা উঠে তৈরি হচ্ছি, মা মুখ ভার করে এসে বলল, "দ্যাখ, আজকেও কাগজে তোকে নিয়ে খবর হয়েছে।"

সে তো হবেই। কাল তো ওই পুরোহিতদের পান্ডার মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছি।" আমি বললাম।

কালকের পর মেজাজটা অনেকটা ফুরফুরে লাগছে আমার। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি, ওই অ্যাসোসিয়েশন ছাড়া বেশিরভাগ লোকই আমাকে আস্তে আস্তে সমর্থন করতে শুরু করেছেন, যুক্তি দিয়ে মানতে চেষ্টা করছেন পরিবর্তনটা।

এটাই তো চেয়েছিলাম আমি!

মা টানটান করে কাগজটা মেলে ধরল, "ছবিও বেরিয়েছে।"

আমি স্নান করে বেরিয়ে সবে গামছা দিয়ে চুল ঝাড়ছিলাম। আজ বুধবার, শ্যাম্পু করেছি। আগে যখন টিউশনি করতাম সারাদিনই বাড়িতে থাকতাম, ফলে এইসব দিনক্ষণ দেখে শ্যাম্পু করার ঝক্কি ছিল না, যেদিন মনে হত, করে নিতাম। বাড়িতে থাকার ফলে চুল নোংরাও হত না তেমন, ওই সপ্তাহে একদিনই যথেষ্ট ছিল। তার ওপর বাড়ির জল বেশি খরচ করা মানে পাম্পের বিলও হু হু করে ওঠা। আমাদের একটা সুবিধে, গলির মুখেই কর্পোরেশনের জলের লাইন, সেখান থেকে একবার দু-বালতি ধরে আনলেই হত। কিন্তু চাকরি পাওয়ার পর এখন আর তা হওয়ার জো নেই। রোজ রাস্তাঘাটে চুল এত নোংরা হয়, সপ্তাহে অন্তত দুদিন শ্যাম্পু করতেই হয়। তাও আমার চুল ছোট বলে রক্ষা।

এমনিতে আমি বেজায় অলস মানুষ, বাবা দুম করে মারা যাওয়ার জন্য অনেক ছোট থেকে টিউশনি, দোকান-হাট করতে হয় বলে লোকে ভাবে বুঝি আমি খুব পরিশ্রমী। আসলে মোটেই তা নয়। পেটের দায়ে খাটতে হয় ঠিকই, কিন্তু যেটুকু কুঁড়েমি করা সম্ভব আমি ঠিক করে নিই।

আমি গামছাটাকে ভালো করে দু-হাত ঝাপটে ঝাড়লাম। এইভাবে ঝাড়ার একটা সুবিধা আছে। গামছার মধ্যে লেগে থাকা সামান্য জলবিন্দুগুলোও নষ্ট হয়না, সেগুলো শীতের কুয়াশার মতো গিয়ে পড়ে আমাদের একচিলতে বারান্দার টবগুলোয়।

টবের তুলসী, লংকাগাছের পাতাগুলো মুহূর্তে এই মৃদু ধারাস্নানে কেমন কেঁপে উঠল।

আমি লঘুচালে বললাম, "ভালোই তো। তুমি তো সেলিব্রিটি হয়ে গেছ মা। তোমার মেয়ের রোজ কাগজে ছবি বেরোয়।"

"ইয়ার্কি মারিস না।" মা ঝাঁঝিয়ে উঠল, "একটা ভালো কাজ করে নাম কুড়নো আর একটা বাজে কাজ করে সবার আলোচনার পাত্র হওয়ার মধ্যে যে পার্থক্যটা আছে সেটা নিশ্চয়ই বুঝিস। বারবার ছবি বেরোলে পরে কোনো ভালো পাত্র পাব? তোর এই কাজের জন্য সারা পাড়ায় ঢি ঢি পড়ে গেছে।"

"ঢি ঢি?" আমি অবাক চোখে তাকালাম এবার, "ঢি ঢি পড়ার মতো কী কাজ আমি করলাম সেটাই তো বুঝছি না! কালকের শো-টা দেখেছ তুমি?"

"না দেখিনি। দেখার ইচ্ছেও নেই। কী ঢি ঢি পড়ছে, সেটা বুঝলে কি আর তুই এগুলো করতিস? মায়ের বারণ শুনতিস। অর্ধেক লোক তো কিছু বোঝেনা, তাদের অন্যরা যা বোঝাচ্ছে তাই বুঝছে। মিউনিসিপ্যালিটিতেও নাকি খবরটা গিয়ে পৌঁছেছে। লোকে কি ভাবছে বল তো? একেই সেই সরস্বতী পুজোর পর থেকে সবাই কেমনভাবে দেখে আমাদের।" মা গজগজ করল।

"কী আশ্চর্য, লোকে কী ভাবছে সেটাও যদি আমরাই ভাবি তাহলে লোকে কি ভাববে মা?"

"এত কিছুর পর খেটেখুটে একটা চাকরি পেলি, সেটাও যদি চলে যায় আমাদের কী গতি হবে ভেবেছিস একবারও? আমাদের তো কোনো মামা কাকা দাদা নেই যে কিছু হলে তোকে বাঁচাবে।" মা অধৈর্য হয়ে উঠল, "বেশ তো ভালো ছিলি, হঠাৎ তোর মাথায় কে এই পোকা ঢোকাল? নিশ্চয়ই ওই ছবিজ্যাঠা, তাই না?"

এবার আমার বিরক্ত লাগল, "সবসময় অন্যকে দোষারোপ কোরোনা তো মা! দাদুকে দোষ দিচ্ছ কেন? দাদুর কাছ থেকে আমি অনেক কিছু জানতে পারি। ভুলে যেও না দাদু আমার পড়াশুনোয় কত হেল্প করেছে। আমি যা করছি আমার নিজের ইচ্ছেতেই করছি। আর চাকরিটাও আমি দাদুর পড়ানোর জন্যই পেয়েছি।"

"তা এখন এইসব করার দরকারটা কি তোর? কে পুজো করছে, কে পুজো করছে না তা নিয়ে আমরা কী করব! তোর বাবা চলে যাওয়ার পর যখন আমাদের না খেতে পাওয়ার দশা হয়েছিল, তখন কি কেউ দেখতে এসেছিল?" মা তিনশো তিয়াত্তর নম্বর বার সেই একই কথাগুলো বলতে শুরু করল।

"দ্যাখো মা, সমাজের বিপরীতে গিয়ে কিছু করতে গেলেই বেশিরভাগ মানুষ তোমার বিরুদ্ধে চলে যাবে, কারণ কনভেনশন ভাঙার সাহস বা ক্ষমতা সবার থাকে না। এইজন্যই রামমোহন, বিদ্যাসাগর কিংবা মার্টিন লুথার, সবাইকেই সমাজের বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়েছে। আমাকেও হচ্ছে।"

"তুই কি নিজেকে বিদ্যাসাগর রামমোহন ভাবছিস নাকি?" মা খিঁচিয়ে উঠল, "সমাজ পালটানো অত সহজ নয়। তার জন্য টাকার জোর লাগে, ক্ষমতাও লাগে। আমাদের কোনটা আছে?"

বিরক্তির শিখরে পৌঁছে আমি আর তর্ক না করে চুপ করে গেলাম।

সত্যি, আজ যখন চুপ করে বসে ভাবি কিংবা অফিস যাওয়া আসার পথে বাসে ট্রেনে একা বসে থাকি, ভাবি এগুলোর কি আদৌ কোনো দরকার ছিল? অভাবের সংসারে খেটেখুটে একটা ছোটখাট সরকারি চাকরি পেলাম, এবার তো দিব্যি পরিবার পরিজন নিয়ে সুখে কাটিয়ে দিতে পারতাম। টুকটাক সেভিংস, বছর কয়েকের মধ্যে মোটামুটি বাড়িটাকে মেরামত করে বিয়ে। তারপর নিজস্ব সংসার।

আর পাঁচজনের মতো।

পরক্ষণেই নিজেকে বোঝাই, তাতে আমি থিতু হতাম ঠিকই, কিন্তু আমার ইচ্ছেটা মিটত না। পুজো করার ইচ্ছে আমার আজ থেকে নয়, প্রায় জ্ঞান হওয়া ইস্তক। আমরা থাকি হুগলির উত্তরপাড়ার কাছের মফসসল মাখলায়। মূল উত্তরপাড়ার সঙ্গে তফাত শুধু একটা স্টেশন চত্বরের হলেও আমাদের দিকটা অনেকাংশেই অনুন্নত। রাস্তাঘাট,

দোকানপাট, সংস্কৃতি সবেতেই উত্তরপাড়ার থেকে পিছিয়ে। তাই একটু বড় হতেই স্কুল, কোচিং সবকিছুর জন্যই রেললাইন পেরিয়ে আমাকে যেতে হত উত্তরপাড়ায়।

আমার বাবা যখন মারা যান তখন আমি ক্লাস ফোরে পড়ি। বাড়ির পাশেই বাবার ছোট একটা স্টেশনারি দোকান ছিল, বিশাল স্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও আমাদের তিনটি প্রাণীর ভালোই চলে যেত। ছোটবেলায় স্কুলে দিয়ে আসত বাবা, আবার দুপুরবেলা ছুটির সময় নিয়েও আসত।

ছুটির সময়ের সেই কাঠি আইসক্রিম, দু-টাকার আমচুর, আলুকাবলির মধ্যে বাবা এখনো আমার স্মৃতিতে রয়ে গেছে।

বাবা মারা যেতে ছোটখাট একটা বজ্রপাত হয়েছিল বাড়িতে। বড়বাজার থেকে দোকানের জন্য মাল আনতে গিয়ে বাসের তলায় পড়ে গিয়েছিল বাবা, বাসের ভারী ভারী চাকাগুলো মুহূর্তে পিষে দিয়েছিল বাবার শরীর।

সঙ্গে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল আমার শৈশবও।

বাবা-মা'র দুদিকের আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশী প্রথম কিছুদিন সমবেদনায় পাশে থাকলেও সময়ের নিয়মে আস্তে আস্তে তারা ফিরে গিয়েছিল নিজেদের জীবনে।

মা ছিল খন্যানের গ্রামের মেয়ে, পুরোদস্তুর গৃহবধূ। কিন্তু পেট বড়ো বালাই। সেই মা-কেও এত বড় বিপদে পড়ে বেরতে হল রোজগারের আশায়।

দোকানটা ভাড়া দিয়ে প্রথম কয়েক বছর এদিক সেদিক অসীম পরিশ্রম করেছিল মা। লোকাল অফিসগুলোতে রান্না করা থেকে শুরু করে অসুস্থ লোকের বাড়িতে আয়ার কাজ করা, কি না করেনি! অবশেষে দু-তিন বছর পর পার্টির লোকেদের বদান্যতায় কাছের এক নার্সিং হোমে আয়ার কাজ পেয়ে অবস্থা কিছুটা চলনসই হয়েছিল।

ছোট থেকেই রেললাইনের ওপারে গঙ্গার ধারের ছবিদাদুর বাড়িতে আমি সুযোগ পেলেই চলে যেতাম। আমাদের সঙ্গে ওঁদের বাড়ির পরিচয়টা খুবই সামান্য অজুহাতে, যতদূর মনে পড়ে কোনো এক অনুষ্ঠানবাড়িতে গিয়ে।

ছবিদাদু উত্তরপাড়ার বনেদি ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, উত্তর কলকাতার একটা কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, ওঁর স্ত্রী প্রণতিদিদিমাও শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত মহিলা।

দুই পরিবারের অবস্থাতে আকাশ পাতাল তফাত হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে যেন আমি নিঃসন্তান ওই দম্পতির খুব কাছের মানুষ হয়ে উঠেছিলাম। স্কুলশেষে চলে যেতাম দাদুর বাড়ি, দিদিমা যত্ন করে বসিয়ে খাওয়াতেন আমায়। তারপর দাদুর কাছে পড়াশুনো করতাম। পাঠ্য বই যত না বেশি পড়তাম, তার চেয়ে বেশি শুনতাম দেশবিদেশের জানা অজানা গল্প।

ওদিকে মা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করত। নার্সিং হোমে কোনোদিন ডে শিফট, কোনোদিন নাইট শিফট থাকত। ডিউটি সেরে ক্লান্ত অবস্থায় আমাকে দাদুর বাড়ি থেকে নিয়ে আসত বাড়িতে।

এভাবেই আমার বড় হয়ে ওঠা।

মাঝে মাঝে যখন পেছন ফিরে তাকাই, অবাক বিস্ময়ে ভাবি, আমাদের এই এঁদো গলির ভেতরে জন্মে ছবিদাদুর বাড়িতে আমার অত সুন্দর একটা কৈশোর পাওয়াটা যেন

একটা রূপকথা। আজ দাদুদের সান্নিধ্যে না গেলে আমিও হয়তো এই কলোনির মানুষগুলোর মতোই যা চলছে চলুক এই ধ্যানধারণায় অভ্যস্ত হয়ে পড়তাম।

ব্যতিক্রমী হিসেবে কিছু ভাবার চিন্তাটাই লুপ্ত হয়ে যেত আমার!

ছবিদাদু ছিলেন সংস্কৃতের অধ্যাপক। বৈদিক শাস্ত্রে তাঁর এমন অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, ওঁদের পারিবারিক দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে সত্যনারায়ণ সবেতেই উনি পৌরোহিত্য করতেন। আর আমি ওইটুকু বয়স থেকে দাদুর একপাশে বসে অবাক বিস্ময়ে আর মুগ্ধতায় লক্ষ করতাম দাদুর জলদমন্দ্র স্বরের নির্ভুল মন্ত্রোচ্চারণ।

মনে হত দাদু তখন যেন কোন হিমালয় থেকে আসা ঋষি হয়ে গেছেন।

এভাবে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুজো, মন্ত্র, বেদ এগুলো কখন যেন আমার নিশ্বাসে ঢুকে গিয়েছিল। একদিকে অভাবের সংসারের তাড়না আমাকে রুক্ষ, মেজাজি করে তুলছিল, অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিপরীত বৈশিষ্ট্য হিসেবে গড়ে উঠছিল সাংস্কৃতিক দিকগুলো, ছবি দাদুর তত্ত্বাবধানে।

দাদুর বাড়িতে থেকে প্রচুর বই পড়তাম, ফলে সাধারণ জ্ঞান বেশ ভালো হয়েছিল আমার। সঙ্গে দাদুর পড়ানো তো ছিলই। সংস্কৃত নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করে বছর দুয়েকের মধ্যেই তাই রাজ্যসরকারের এই মাঝারিমাপের চাকরিটা জোটাতে পেরেছি আমি। দাদু অবশ্য তাতে ঠিক খুশি হননি। তিনি চান, আমি আরো পড়ি, তারপর কলেজে পড়াই। দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়।

সত্যি কথা বলতে আমার জীবনের সবটাই সুন্দর করে গড়ে দিয়েছেন ছবিদাদু।

মা সবই জানে, তবু কিনা সেই দাদুকেই ... !

মা কখন ঘর থেকে চলে গিয়েছিল আমি খেয়ালই করিনি, এখন হঠাৎ আবার ফিরে এসে আমার চিন্তার জাল ছিঁড়ে দিয়ে বলল, ”খেতে দিয়েছি। আর আজ একটু তাড়াতাড়ি ফিরিস অফিস থেকে, কিছু কাজ আছে।”

দাদুকে নিয়ে কিছু বললে আমি একদম সহ্য করতে পারি না। মা-র ওপর রাগে তখনও আমার শরীরটা গনগন করছিল, ঠিক এইসময় ফোন বেজে উঠল।

আমি স্মৃতি রোমন্থন ছেড়ে বাস্তবের মাটিতে ফিরে এলাম, ঝটিতি ফোনটা রিসিভ করে কানে দিলাম, ”হ্যালো?”

প্রথমে কিছু শোনা গেল না।

একে দেরি হয়ে যাচ্ছে, তার ওপর আমি বুঝে পাই না লোকজন ফোন করে বোবা হয়ে যায় কেন! অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি আরও জোরে বললাম, ”আরে কে বলছেন বলুন না, হ্যালো?”

ওদিক দিকে একটা ইতস্তত করা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল, ”ইয়ে হ্যালো, আ-আমি কি মিস বিশ্বাস, মিস দিওতিমা বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলছি?”

”হ্যাঁ কথা বলছেন।” আমি কথাটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুর করে বললাম, ”আমি কার সঙ্গে কথা বলছি জানতে পারি?”

”ইয়ে, আমি মঙ্গলরূপ ভট্টাচার্য বলছি। আপনার সঙ্গে কি একটু দেখা করা যেতে পারে? খুব দরকার আসলে।”

সাত

"শুনুন আমাকে পি আই এল শেখাবেন না। কে বলেছে আপনাকে সরকারি কর্মচারীরা পি আই এল ফাইল করতে পারেনা? অবশ্যই পারে, তার জন্য অফিসের পারমিশন নিতে হয়। আমিও নিয়েছি।" কমলালেবুর কোয়ার মতো চোখের নীচের দিকে মোটা করে কাজল টানা দিওতিমা একটা টিভি মিডিয়ার নতুন রিপোর্টারকে প্রায় ধমকে দিল।

ছোকরা রিপোর্টারটাও বেয়াড়া, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তখন থেকে বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন করে চলেছে, অন্য কোনো মিডিয়াকে কাছে আসার সুযোগই দিচ্ছে না। এখন টেরিয়া হয়ে একপেশে হেসে স্মার্টনেস দেখিয়ে বলল, "কিন্তু ম্যাডাম, পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশন বলছে আপনার ওই পিলের কোনো মূল্যই নেই যেহেতু আপনি সুপ্রিমকোর্টে ফাইল করেননি!"

দিওতিমা এবার সরু চোখে রিপোর্টারটার দিকে তাকাল, "পিল আবার কি? কনট্রাসেপটিভ পিলের কথা বলছেন নাকি?"

আশপাশের ভিড়ে মুহূর্তে একটা হাসির মৃদু হুল্লোড় উঠল।

ছেলেটা এবার কী বলবে বুঝতে না পেরে চুপ করে গেল।

দিওতিমা কোমরে হাত দিয়ে বলল, "পি আই এল এর ফুল ফর্ম কী বলুন তো?"

ছেলেটা এবার অন্যমনস্ক হয়ে ওর ফটোগ্রাফারের সঙ্গে কথা বলতে উদ্যত হল কিন্তু দিওতিমা ওর হাতে ধরে থাকা নোটবুকটাকে টোকা দিয়ে বলল, "এই যে, হ্যাঁ আপনাকে বলছি।"

ছেলেটা এবার কথা ঘোরাতে লাগল, "না ইয়ে, সে ঠিক আছে, পি আই এল করেছেন, সে আর এমন কী ব্যাপার ...!"

দিওতিমা ঠান্ডা চোখে বলল, "পি আই এল হল পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন। মানে জনস্বার্থ মামলা। আর সেটা যে শুধু সুপ্রিমকোর্টেই ফাইল করা যায় সেটা শুধু সুপ্রিমকোর্ট নয়, দেশের যেকোনো হাইকোর্টে করা যায়। আর দেশের যেকোনো নাগরিক সেটা করতে পারেন। জনসাধারণের কল্যাণের স্বার্থে। এবার থেকে রিপোর্টারি করতে এলে একটু তৈরি হয়ে আসবেন, কেমন?"

টিভি চ্যানেলের ছোকরা রিপোর্টারটা মিইয়ে যাওয়া আলুভাজার মতো দাঁত বের করে হাসল, "বটেই তো ম্যাডাম, বটেই তো। আসলে আইনের অত জানিনা তো! তবে আমাদের চ্যানেলই কিন্তু এক্সক্ল্যুসিভলি আপনার নিউজটা প্রথম কভার করেছিল, প্রাইম টাইমে আপনার শো-টাও। তারপরেই তো সব মিনিস্টাররা এই নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছেন। আর কাল তো মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং বলেছেন কমিটি গঠন করে...।"

দিওতিমা ক্রমাগত তেল দেওয়াতে ভিজল না, বিরক্ত হয়ে থামিয়ে দিল, "দেখুন, আমার যা বক্তব্য এর আগে আমি অনেকবার বলে দিয়েছি। আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?"

আরও কিছু রিপোর্টারের খুচরো প্রশ্নগুলোকে মোটামুটি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে দিওতিমা হাঁটা লাগালো কোর্টের ক্যান্টিনের দিকে।

দূর থেকে এতক্ষণ ধরে দেখেশুনে আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, মা ব্যাগে গ্লুকোজের জল ভরে দিয়েছিলেন।

সেটা বের করে কিছুটা ঢকঢক করে খেয়ে যেন শরীরে কিছুটা বল পেলাম।

অফিস ছুটি নিয়ে এসে শেষে এই আগুনের গোলার সঙ্গে আমায় কথা বলতে হবে? তাও এমনি কোনো কথা নয়, রীতিমতো কনভিন্স করতে হবে?

ভাবতেই আমার কেমন পেটটা গুড়গুড় করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাবার উপর রাগটা যেন আরও বেড়ে গেল।

উহ, এই বসন্ত ভট্টাচার্য পুজো পুজো করে মনে হয় একবছরও আমাকে চাকরিটা করতে দেবে না।

আজ সকালেও ভেবেছিলাম ঠিক এদিক সেদিক করে কাটিয়ে দেব, খামোখা কি একটা অচেনা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাব?

তার ওপর টিভিতে কাল যা নমুনা দেখেছি!

আমি অফিসের জন্য তৈরি হচ্ছিলাম।

হঠাৎ হেডুর আগমন, "শোনো রূপ, জগদীশ কাল তো তোমায় সবই বলেছে। ব্যাপারটা আর ভালো দিকে যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই শুনেছ, কাল কীভাবে বেইজ্জত হতে হয়েছে আমাকে। টিভি চ্যানেলটা পুরো সাজানো লোকেদের নিয়ে এসেছিল, পুরো ইস্যুটাকে অন্যরকম মাত্রা দেওয়ার জন্য। ইয়োলো জার্নালিজমের চূড়ান্ত নিদর্শন! আমার খুব ভুল হয়েছিল কাল ওখানে যাওয়াটা।"

আমার কালকে টিভিতে দেখা বাবা-র হতভম্ব হয়ে যাওয়া মুখটা মনে পড়ে গেল। ওইটুকু মেয়ে যে বাবাকে এমনভাবে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে, সেটা উনি হজম করতে পারছেন না।

না পারাটাই স্বাভাবিক।

"একেই আমাদের দলের মধ্যে এই নিয়ে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তার ওপর হুট করে বিধানসভায় বিল উঠে গেলে আমাদের পক্ষে ব্যাপারটা আরও কঠিন হয়ে উঠবে। আজ তুমি হাইকোর্ট চলে যাও। দেখো, মেয়েটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে।"

"হাইকোর্ট?" আমি অবাক, জগদীশকাকা মেয়েটার সঙ্গে হাইকোর্টে দেখা করতে হবে একবারও বলেননি।

তাই দেখে বাবা আরও জোরে বলেছিলেন, "হ্যাঁ হাইকোর্ট। এতে এত অবাকের কি আছে? আমাদের গোটা কম্যুনিটি অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে, এতবড়ো বিপদ, আর তোমাকে সেই প্রথম দিন থেকে দেখছি কোনো গা-ই করছ না ব্যাপারটায়। আরে গোটা ওয়েস্ট বেঙ্গলে সব জায়গা মিলিয়ে প্রায় আটত্রিশ হাজার সাতশো জন পুরোহিত আমাদের অর্গানাইজেশনের মেম্বার, ধুম করে সরকার লাইসেন্স ছাড়া পুজো করা বাতিল এইরকম কিছু বিল পাশ করে দিলে মুহূর্তের মধ্যে কত লোক সহায়সম্বলহীন হয়ে পড়বে ভেবে দেখেছ? সামনেই দুর্গাপুজো। প্রেসিডেন্ট হিসেবে কি জবাবদিহি করব আমি?"

আমি ঢোঁক গিলে বলেছিলাম, "হাইকোর্ট গিয়ে কী করতে হবে আমায়?"

"ওই যে ওই মেয়েটা, তার সঙ্গে গিয়ে একটা পরিষ্কার আলোচনা করো। কী চাইছে সে, পেছনে কোনো রাজনৈতিক দলের হাত আছে কিনা, মতলবটা কী। সেদিনের একটা

পুঁচকে মেয়ে কিনা ...! ” বাবা চোখ সরু করেছিলেন, ”আমি অন্য কাউকেও পাঠাতে পারতাম, সুদেব তো যাওয়ার জন্য মুখিয়েই আছে, রঘুবীরের ছেলে আত্মারামও বেশ চালাকচতুর, কিন্তু আমি ঠিক করেছি এখন থেকে তোমাকে অল্প অল্প করে দলের কাজ দেব, যাতে ভবিষ্যতে প্রেসিডেন্ট পোস্ট সামলাতে তোমার কোনো অসুবিধে না হয়।”

অল বেঙ্গল পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশনের ভবিষ্যৎ প্রেসিডেন্ট এখন দিওতিমা বিশ্বাস নামের বাবার ভাষায় একটা পুঁচকে মেয়ের সামনে বসে কলকল করে ঘামছে।

হাইকোর্টের ক্যান্টিনে বেশ ভিড়। কেউ কেউ তো মাটিতে বসেই ঝোলা থেকে গুড় রুটি বের করে চিবুচ্ছে। কোন দূরের গ্রাম থেকে এসেছে হয়তো! আমাদের দেশে আর যারই অভাব থাকুক না কেন, বছরের পর বছর ধরে চলা মামলার কোনো অভাব নেই। ন্যায্য বিচারের আশায় কত মানুষ ঘটিবাটি বেচে দিয়েও মামলা চালাচ্ছে।

এইসব দেখলেই কেন জানিনা আমি খুব ডিপ্রেসড হয়ে পড়ি। সেই সানি দেওলের হাত মুঠো করে বলা বিখ্যাত ‘তারিখ পে তারিখ’ ডায়লগটা মনে পড়ে যায়। এমনিতেই অবশ্য টেনশন ডিপ্রেশন আমার চিরকালের সঙ্গী। মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক থেকে শুরু করে গ্র্যাজুয়েশন প্রতিটা পরীক্ষার ঠিক আগে বমি করে ডাক্তারের কাছে যাওয়া ছিল আমার নিত্যসঙ্গী।

এখনো আমাকে সেই ভয়টাই ভীষণভাবে চেপে ধরছে, ঠেসে ধরছে যেন মনের দেওয়ালের একটা কোণে, তবু আমি প্রাণপণে শান্ত থাকার চেষ্টা করছি, কথা সাজিয়ে নিচ্ছি ঠিকমতো।

দিওতিমা মেয়েটার অবশ্য এতদিকে হুঁশ নেই, সে বিশাল বড় একটা অমলেটে কাঁটাচামচ ঢুকিয়ে মুখের মধ্যে পুরছে, লংকা চিবিয়ে ফেলেছে বোধ হয়, চোখ দুটো ছলছল করছে।

নাকটা সুরুৎ করে একবার টেনে নিয়ে বলল, ”অ! আপনি বসন্ত চৌধুরীর লোক?”

আমি ওর দিকে তাকালাম। মেয়েটার নাকের সামনেটা ঝালে কেমন লাল হয়ে উঠেছে।

ইতস্তত করে বললাম, ”ব-বসন্ত চৌধুরী কেন হবে, তিনি তো সিনেমা করতেন। আমার বাবার নাম বসন্ত ভট্টাচার্য। আর আমি মঙ্গলরূপ।”

”ওয়েট!” দিওতিমা এবার মুখে আরেকটা বিশাল টুকরো ঢোকাতে গিয়েও থেমে গেল, আঙুল তুলে বলল, ”আপনিই তার মানে সেই গোবর?”

আমার এবার খুব রাগ হল, তার সঙ্গে মাথাটাও গরম হয়ে গেল। ইচ্ছে হল বাবাকে নিয়ে এসে দেখাই, বাবা এই অ্যাসোসিয়েশন করে করে হেদিয়ে মরছেন, আর দলেরই কেউ এইরকমভাবে আমার সম্মান প্রকাশ্যে ধুলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে।

গোবর নামটা কে লিক করল বাইরে? আমি বললাম, ”গোবর মানে?”

”না কিছু না। আপনি কাল সন্ধেবেলা ফোন করার পর খোঁজ নিয়ে জানলাম। ওসব ছাড়ুন।” আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে দিওতিমা বলল, ”ওমলেট খাবেন?”

”না।” আমি মাথা নাড়লাম, ”আমি বাইরে কিছু খাইনা।”

”অ! তবে বলুন কী চান। শুনুন আপনাদের ওই সুদেব না কে, আমাকে আবার ফোন করেছিল, বলছিল ভালো ক্যাশ দেবে, আমি যেন এখানেই চেপে যাই। কিন্তু ওসব টিকি ওলা ভণ্ডদের আমি পাত্তা দিই না।” দিওতিমা ঠোঁটটাকে বাঁদিকে বেঁকিয়ে বলল, ”টাক

টিকি দাড়ি, এই তিনটে মানেই বজ্জাতের হাঁড়ি। আপনাদের ভণ্ডামি ঘোচাতে আমি একাই একশো, বুঝেছেন?"

আমি চট করে নিজের অজান্তেই আমার হালকা সবুজ দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিলাম, কেশে টেশে বললাম, "ম্যাডাম, আপনি নিজে পুজো করতে চাইছেন খুব ভালো কথা, করুন। কারুর অসুবিধা নেই। সেদিনই তো কাগজে পড়লাম, একজন অধ্যাপিকা বিয়ে পর্যন্ত দিচ্ছেন। তাতে তো কেউ বারণ করেনি। এখন আর ওসব কড়াকড়িও নেই। মানুষ যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। কিন্তু এত লোকের ভাত মারাটা কি আপনার ঠিক? বলুন তো?" বাবার শিখিয়ে দেওয়া অনুযায়ী আমি প্রথমে টুকে খেলা শুরু করলাম।

মনে মনে অবশ্য চিন্তা করছিলাম, এর সঙ্গে লড়তে গিয়ে বাবা কী সব বেনোজল সেধে সেধে ঘরে ডেকে আনছেন! পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশনের মেম্বার হয়ে কিনা সুদেব ঘুষ অফার করছে? ছি ছি।

"এত লোকের ভাত মারা মানে?" দিওতিমা এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যে আমার মনে হল কাঁটাচামচটা অমলেট থেকে উঠে এবার আমার চোখে চলে আসবে সটান, "তার মানে আপনি বলতে চাইছেন চোরেদের ভাত মারা যাবে বলে তাদের চুরি করলে জেলে পাঠানো উচিত নয়, কিংবা পকেটমারদের খাওয়া জুটবে না বলে তাদের নির্দ্বিধায় পকেট কাটতে দেওয়া উচিত!"

"ছি ছি আমি তা বলব কেন!" আমি জিভ কাটলাম। এখন বুঝতে পারছি এই মেয়ে গত কয়েকদিন ধরে সবক-টা মিডিয়ার কী করে প্রাইম নিউজে রয়েছে।

"পুরোহিত বামুনদের সঙ্গে আপনি চোর, পকেটমারদের তুলনা করছেন? মানে, করতে পারছেন? পু-পুরোহিতরা হলেন ব্রিজ, মানে হল সেতু ... যারা মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক ...।" আমি আহত গলায় বললাম।

"থামুন!" ভেবেছিলাম আমার মুখচোখ দেখে বুঝি দিওতিমা এবার একটু নরম হবে, কিন্তু সেই আশায় গরম জল ঢেলে দিয়ে দিওতিমা মুখ বেঁকিয়ে বলল, "ক্লাস সিক্সে পড়তে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে গিয়েছিলাম, রথের সময়। ভিড়ের সময় একটা টিকি ওলা ওড়িয়া পুরুত আমার প্রাইভেট পার্টসে হাত দিয়েছিল, বুঝলেন? ছোট ছিলাম, হাঁদাও ছিলাম। তাই কিছু বলতে পারিনি। এখন হলে ঘুরিয়ে এমন একটা রদ্দা দিতাম না...!"

দিওতিমা বাঁ-হাতটা ওপরে তুলে আমার দিকেই বুঝি নিয়ে আসতে যাচ্ছিল, আমি কোনোমতে হাঁ হাঁ করে থামিয়ে টামিয়ে বললাম, "দেখুন একজনকে দেখে জেনারেলাইজ করা কি ঠিক? মানে সবাই কি একরকম হয়?"

"একজ্যাক্টলি!" দিওতিমা টেবিলে একটা ছোট্ট ঘুষি ঠুকল, "সবাই একরকম হয়না বলেই দেয়ার শুড বি অ্যান এলিজিবিলিটি টেস্ট, রাইট? দুনিয়াশুদ্ধু সব্বাইকে পাবলিক সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা দিতে হয়, ডাক্তাররা দেয়, উকিলরা দেয়, সরকারি কর্মীরা দেয়, বেসরকারী কর্মীরা দেয় আর আপনারা শুধু ভগবানের সঙ্গে আমাদের কানেকশন করান, তাও আবার মোটা ঘুষ নিয়ে, সেইজন্য কিছুই পরীক্ষা টরিক্ষা দেবেন না, সেটা তো হতে পারে না, না! আর কে বলল আপনাকে, মেয়েরা পুজো করতে গেলে কেউ বারণ করবে না? বারণ করার লোক প্রচুর আছে, বুঝলেন? বলে কিনা তুমি মেয়ে, পুজো করতে পারবে না। তুমি অব্রাহ্মণ, তুমি পুজো করতে পারবে না। কোন শাস্ত্রে লেখা আছে? কাল আমার টিভি শো-টা দেখেননি? আপনার বাবাও তো এসেছিলেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ দেখেছি। আমি বলছিলাম এই তো কাগজে পড়লাম একজন অধ্যাপিকা ...!"

"আরে ওসব কাগজে পড়া খবর রাখুন দিকি! ক-টা ক্লাব দুর্গাপুজোর পুরুত হিসেবে মেয়ে বা অব্রাহ্মণ নেবে বলতে পারেন? আমি উত্তরটা দিয়ে দিচ্ছি। একটা ক্লাবও নেবে না। সবদিক থেকে ভালো, যোগ্য পুরোহিত হলেও না। কারণ চলে আসা কনভেনশন।" দিওতিমা চোখ কুঁচকোল, "আর তা ছাড়া, এটা তো আমি ভালোই করছি। যোগ্য লোকেরাই পুরোহিত হবেন, মানুষের রেসপেক্ট পাবেন, পুজোটাও ভালো হবে। এতে আপনাদের যে কেন এত ফাটছে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না!" ঝন্টু না কে, এসে হুমকি দিচ্ছে। এত সাহস?

"না মানে এত হাজার মানুষ তাহলে মুহূর্তের মধ্যে উপার্জনহীন হয়ে পড়বেন।" আমি মিনমিন করলাম।

"কেন? তার মানে আপনারা এটা আগে থেকেই ধরে নিচ্ছেন যে তারা পাশ করতে পারবেন না? যাদের একটা করে সংস্কৃত শব্দ শুনে মানুষ সেটাই উচ্চারণ করে পুষ্পাঞ্জলি দেয়, তাঁদের যদি পরীক্ষায় সামান্য কিছু স্তোত্রের মানে কিংবা সংস্কৃত শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা...।"

"কী যে বলেন!" আমি এবার না হেসে পারলাম না, "অর্ধেক লোক কখনো স্কুলেই যায়নি আর তারা নাকি...!"

"তবেই চিন্তা করুন। যারা স্কুলেই যায়নি, তাদের হাত ধরে আমরা ভুলভাল মন্ত্র পড়ে, তাদের পাপী কামভর্তি মনের চ্যানেল দিয়ে আমরা নাকি ভগবানের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা করি! হুহ!" অদ্ভুত মুখব্যাদান করল দিওতিমা।

"স্কুল যায়নি মানেই কি তারা খারাপ? পুঁথিগত বিদ্যে না থাকলেই তার মন পাপে ভর্তি থাকবে? এটা কেমন কথা হল? শিক্ষিত লোক খারাপ হয় না? কামুক হয় না?" আমি বললাম।

দিওতিমা এবার আমার দিকে ভালো করে দেখল, "হু, আপনাকে যতটা ভেবেছিলাম, ততটা গোবর আপনি নন। এই কথাটা ঠিকই বলেছেন। শিক্ষাগত যোগ্যতাই সব নয়। কিন্তু সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যে দিয়েই যদি আমাদের পুষ্পাঞ্জলি দিতে হয়, তার মানে বাই ডিফল্ট আমি ধরে নেব ঠাকুর সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনো ভাষা বোঝেননা। সেক্ষেত্রে ভুল মন্ত্র বললে ঠাকুরের কাছে আমার প্রার্থনা সঠিকভাবে পৌঁছবে কী করে?" কথাটা শেষ করেই ও উঠে পড়ল।

ওমলেট শেষ। রুমাল দিয়ে মুখ মুছছে। এবার বেরোবে।

আমি এরপর আর কী বলব বুঝতে পারলাম না, এই মেয়ে কারুর কথা শোনার পাত্রী নয়, সেটা পরিষ্কার।

তবু বাবার মুখটা মনে পড়তেই তড়বড়িয়ে উঠে বললাম, "না আপনি প্লিজ একবার ভাবুন, এতগুলো মানুষের রুটিরুজি! একটু ঠান্ডা মাথায় ...।"

"যা করছি ভালোর জন্যই করছি বুঝলেন?" দিওতিমা টেবিল থেকে অল্প মৌরি তুলে চিবোতে চিবোতে বলল, "আপনার ওই কমল মিত্র বাবাকে গিয়ে বলে দেবেন গুন্ডা বা ক্যাবলা কোনোদিক দিয়েই আমাকে কাবু করা যাবেনা। পুরুতদের লাইসেন্স আমি শুরু করবই।" কথাক-টা বলে মেয়েটা ঝড়ের বেগে ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে গেল।

আমি কী করব বুঝতে না পেরে থতমত মুখে বসে রইলাম।

হঠাৎ মনে হল গুন্ডা বা ক্যাবলা কোনোদিক দিয়েই নাকি ওকে কাবু করা যাবেনা, তা গুন্ডাগিরি না হয় ঝন্টু করেছে, কিন্তু ক্যাবলা বলতে কার কথা বলল?

কে জানে কার কথা বলল!

এই দিওতিমা বলে মেয়েটার গায়ে কেমন যেন জুঁই ফুলের গন্ধ। ফুল আমি খুব একটা চিনি না, কিন্তু ছোটবেলায় মায়ের সঙ্গে যখন কৃষ্ণনগরে মামারবাড়ি যেতাম, তখন বাড়ির সামনের এই জুঁই ফুলের গাছটা আমার খুব ভালো লাগত। ভোরবেলা গাছের নীচটা সাদা সাদা জুঁই ফুলে একদম মাখামাখি হয়ে থাকত, আর গন্ধে যেন ম-ম করত গোটা বাড়ি।

মেয়েটা কি জুঁই ফুলের গন্ধ, এমন কোনো ফ্লোরাল পারফিউম মেখেছে?

চারপাশের হাজারো কোলাহল আর চেঁচামেচির মাঝে আমি খাঁটি নির্ভেজাল একটা ক্যাবলার মতোই হাইকোর্টের ক্যান্টিনে বসে রইলাম।
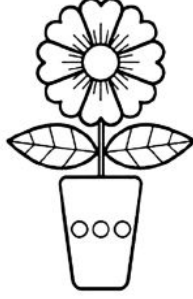
আট

"কলকাতা যাদের সম্পত্তি ছিল, সেই বিখ্যাত সাবর্ণ চৌধুরীদের বংশের একজন পুরুষ, নাম রত্নেশ্বর রায় প্রথম আমাদের এই উত্তরপাড়ায় এসে বসবাস শুরু করেন।" ছবিদাদু চশমার কাচ মুছতে মুছতে বললেন।

আমি উড পেনসিলের পেছনের অংশটা আনমনে চিবোচ্ছিলাম, দাদুর গল্পের মতো করে বলা ইতিহাসটাকে মনে মনে কল্পনা করছিলাম, "কলকাতায় অত বড়ো সম্পত্তি ফেলে রত্নেশ্বর এখানে কেন এসেছিলেন দাদু?"

"কোথায় যেন পড়েছিলাম, জোব চার্নক কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলে রত্নেশ্বর রায়দের গঙ্গা স্নানে অসুবিধা হচ্ছিল। উত্তরপাড়ার দক্ষিণদিকে বালি তখন বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম, তার ওপর ব্রাহ্মণপ্রধান। রত্নেশ্বর ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। বালি গঙ্গা নদীর পশ্চিমদিকে বলে উনি হয়তো বেনারসের মতো তীর্থস্থানের সঙ্গে সাদৃশ্য পেয়েছিলেন। উত্তরপাড়া তখন বালিরই একটা অংশ বুঝলি, মাঝখানে ছিল শুধু ওই বালিখাল। বালি গ্রামের উত্তরদিকে বলে নাম হয়েছিল উত্তরপাড়া।" দাদু চোখ বন্ধ করলেন।

আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম।

সন্ধেবেলা, কাছেই উত্তরপাড়া স্টেশন, সেখান থেকে ট্রেনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

নীচের ঘরে প্রণতিদিদিমা সন্ধে দিচ্ছেন, সেই শঙ্খধ্বনিও আসছে কানে।

আমার এক মুহূর্তের জন্য মনে পড়ল মা আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছেন। জিজ্ঞেস করলাম, "তখন তো এত বাড়িঘর ছিল না, বলো দাদু!"

"বাড়িঘর! ধুস!" দাদু হাসলেন, "উত্তরপাড়ার বেশিরভাগ জায়গাই তখন ছিল বনজঙ্গল, জলাভূমি। তুলনায় বালি অনেক বর্ধিষ্ণু। তুই জিজ্ঞেস করছিলি না, বালি প্রাচীন গ্রাম কিনা? অনেক প্রাচীন। প্রথমে সপ্তগ্রামের দিকটায় রমরমা ছিল, বুঝলি! বিশাল বিশাল নৌকো, ব্যবসাবাণিজ্য তখন ওদিক দিয়েই হত। পরে সরস্বতী নদী মজে যাওয়ায় এদিকটা উন্নত হতে থাকে। তবু এই উত্তরপাড়ায় তখন জেলে, মালা, কৈবর্তরা অনেকেই থাকত যারা সন্ধের পর নদীতে বড় বড় বজরায় হামলা করে ডাকাতি করত।"

"ডাকাতি!" আমি অবাক হয়ে গেলাম, "উত্তরপাড়ার লোকেরা ডাকাতি করত!"

"আহা সবাই ডাকাত হতে যাবে কেন!" দাদু মুখ থেকে পানের ছিবড়েটা ফেললেন পিকদানিতে, "কেউ কেউ করত। তারপর তো রত্নেশ্বর রায় এসে বসবাস আরম্ভ করলে অনেক ভদ্রপরিবার এদিকে এসে থাকতে শুরু করেন। উত্তরপাড়ার জমিদাররা রত্নেশ্বরেরই উত্তরপুরুষ।"

"আর কোন্নগর? সেটাও জঙ্গলে ঢাকা ছিল?"

"ধুর! কোন্নগর অনেক পুরোনো।" দাদু আমার পরিকল্পনায় জল ঢেলে দিলেন, "কবি বিজয়রাম সেন তীর্থমঙ্গলে লিখেছেন—

ডাহিনেতে কোন্নগর বামে আগরপাড়া।

সুকচরে আসিয়া দামায় দিল সাড়া।

দেওয়ানজীর গ্রাম সেই অপূর্ব বসতি।

বালির ঘাটেতে নৌকা গেল শীঘ্রগতি।"

"বুঝলাম।" আমি উঠে দাঁড়ালাম, "এইটাই কনফিউশন ছিল। এবার যাই। অনেকক্ষণ এসেছি। আরও দেরি হলে মা গজগজ করবে।"

"আজ কিন্তু কোনো লাভ হল না তোর।" দাদু মনে করিয়ে দিলেন, "খালি বালি-উত্তরপাড়ার ইতিহাস জেনে গেলি, শাস্ত্র পড়লি না। শূদ্ররা পুজো করবে চাইছিস, এদিকে কাজের কাজ তো কিছুই করলি না।"

"আর কাজের কাজ! ওই অ্যাসোসিয়েশনের পান্ডা কাজের কাজ করতে দিলে তো! সেদিন টিভিতে নাকানিচোবানি খাওয়ার পর একবার গুন্ডা পাঠাচ্ছে, একবার ইমোশনালি হ্যারাস করছে! কেউ স্রোতের উলটোদিকে হাঁটতে গেলেই মানুষ আদাজল খেয়ে পেছনে পড়ে যায়।" আমি ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বেরোতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম, "দাদু আর একটা প্রশ্ন আছে।"

ছবিদাদু ওঠার উপক্রম করছিলেন। অন্ধকার নেমে গেছে, দাদুর এখন বই পড়ার সময়। টানা রাত অবধি বই পড়বেন।

আমার কথায় চোখ তুলে তাকালেন, "কী প্রশ্ন?"

"এই যে তুমি বললে আমি শূদ্রদের পুজো করার অধিকার পাওয়ার জন্য লড়ছি। সেদিন আমি টিভিতেও তো বললাম, শূদ্রদের পুজো করার অধিকার আলাদা করে চাইতে হবে কেন? ভগবদগীতাতেই তো বলা আছে যে,

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।

তদহং ভক্ত্যপহৃতমশ্নমি প্রযতাত্মনঃ।।

অর্থাৎ শ্রীভগবান বলছেন, "যে পত্র অর্থাৎ তুলসীপাতা, পুষ্প, কল, জল আমাকে ভক্তিভরে প্রদান করে, আমি সেই ভক্তের ভক্তির উপহার গ্রহণ করি। কই সেই ভক্ত ব্রাহ্মণ না ক্ষত্রিয়, বৈশ্য না শূদ্র সেই ব্যাপারে তো কিছু বলা নেই।"

দাদু সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসলেন, "কোন শালার ব্যাটা বলেছে যে শূদ্ররা পুজো করতে পারবে না? ওরে ব্রাহ্মণরা তো বাংলার আদি অধিবাসীই নয়, ওরা খ্রিস্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতক নাগাদ উত্তর ভারত থেকে আসতে শুরু করেছিল। মোটামুটি অষ্টম শতকে বাংলায় ব্রাহ্মণ প্রচুর বেড়ে যায়। পাল রাজারাও ওদের খুব সমাদর করতে শুরু করেন। তো পঞ্চম শতকের আগে তাহলে পুজোআচ্চা কারা করত বাংলায়?" দাদু আমার দিকে প্রশ্নটা যেন ছুঁড়ে দিলেন।

"ব্রাহ্মণরা বহিরাগত!" আমি হতবাক, "তার মানে এই রাঢ়ি, বারেন্দ্র এইসব ব্রাহ্মণদের ভাগগুলো ...!"

"কান্যকুব্জ থেকে বাংলার রাজার অনুরোধে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এসেছিলেন বাংলায়। ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, আর সাবর্ণ। এই পাঁচগোত্রের ব্রাহ্মণ বাংলায় এসে রাণীর চান্দ্রায়ণ ব্রতয় পৌরোহিত্য করলেন, তারপর এখানেই থেকে গেলেন। এইভাবে কুলীন ব্রাহ্মণদের বংশবিস্তার বাংলায় শুরু হল।" দাদু বললেন।

"হুম বুঝলাম। তবে দাদু, আমি শুধুমাত্র শূদ্রদের পুজো করার অধিকার চাওয়ার জন্য কিন্তু লড়ছি না।" আমার আজ দুপুরে হাইকোর্টে পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশনের ওই

ক্যাবলা ছেলেটার কথাগুলো মনে পড়ে গেল, "ব্রাহ্মণ শূদ্র যিনিই পুজো করছেন তাঁর যোগ্যতাটা যাচাই করাটাও কিন্তু আমার লক্ষ্য।"

"মানে তুই জাতপাতকে সমর্থন করছিস?" দাদু জিজ্ঞেস করলেন।

"মোটেই নয়। শুধু জাত কেন যে কোনোরকম বিভাজনের নামে সমাজকে ভাগ করারই বিরুদ্ধে আমি। কিন্তু আপাতত আমার লক্ষ্য পৌরোহিত্য সত্যিকারের ব্রাহ্মণরাই যেন করেন। মানে যারা চরিত্রে, যোগ্যতায়, মননে ব্রাহ্মণ, শুধু বংশকৌলিন্যে নয়। সেই যে কবীরের একটা দোঁহা তুমি বলেছিলে,

জাত-পাঁত পুছে না কোই,

হরকো ভজে সো হরকা হোই"

"যাই করিস। মাথাটা ঠান্ডা কর। ওটাই সাফল্যের মূলমন্ত্র। মেজাজটা একটু কমা।" আমি বেরিয়ে আসছিলাম, দাদু পেছন থেকে কথাগুলো ছুঁড়ে দিলেন।

আমি হেসে হাত নেড়ে হাঁটা শুরু করলাম। বেশ দেরি হয়ে গেল। গিয়ে আবার রান্না করতে হবে। মা-র ঘুষঘুষে জ্বর হচ্ছে ক-দিন, শরীরটা ভালো নেই। কাজেও বেরোতে দিইনি তাই।

মনে মনে আমি ঠিকই করে রেখেছি, সুস্থ হয়ে উঠলেও আর বেরোতে দেব না। আমি যখন চাকরি পেয়ে গেছি, শুধু শুধু মা আর কষ্ট পাবে কেন?

বিশ্রী গরম। তার ওপরে আজ অফিসে সারাদিন পাওয়ার কাট, ভ্যাপসা আবহাওয়ার জন্য মাথাটা এখনো বেশ ধরে আছে। যার জন্য এত আয়োজন, সেই পুজোতে মনে হচ্ছে ঢালবে ভালোই।

উত্তরপাড়া স্টেশনের ক্রসিং পেরিয়ে ধীরেসুস্থে হাঁটছিলাম। কাল আবার কোর্টে যেতে হবে, একটা সি এল নষ্ট হবে। নতুন চাকরি, ছুটিছাটা একদমই নেই, কিন্তু কিছু করার নেই। আগের দিন কোনো কাজই হল না, মাঝখান থেকে ওই ছেলেটা, কী নাম যেন, মঙ্গলরূপ বকে বকে মাথা ধরিয়ে দিল। তবে, একটা ব্যাপার ঠিক, ছেলেটা মিনমিনে হলেও আর যাই হোক ওই ঝন্টু বা ওর স্যাঙাতগুলোর মতো অসভ্য নয়। বেশ শান্তশিষ্ট, ভদ্র। বোঝাই যাচ্ছিল, সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছে, আমার কাছে এসে তোতাপাখির মতো শেখানো বুলি আওড়াচ্ছে।

মাখলা জায়গাটা কিছুটা ছড়ানো ছিটনো। একদিকে কিছু দোকানপাট, অন্যদিকে বিড়লা রোড সোজা চলে গেছে হিন্দমোটরের দিকে। বড়ো রাস্তাটা সারাক্ষণ অটো আর টোটোর দৌরাত্ম্যে এমন ব্যস্ত হয়ে থাকে যে একটু অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটাচলা করলেই দুর্ঘটনা ঘটবে।

একটা বড়ো গর্ত থেকে কোনোরকমে পা বাঁচিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমাদের গলির মুখে ঢুকতে যাচ্ছি, দেখি বিনি। ঢোলা একটা সালোয়ার কামিজ পরেছে, এই গরমেও ওড়নাটা গলায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো।

"কিরে, তোর গরম টরম লাগছে না নাকি?" আমি বললাম।

বিনি আমার ছোটবেলার পাড়াতুতো বন্ধু হলেও অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। আমি হাজার কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকি, আর ও কলেজ শেষের পর বাড়ি থেকে বেরোয় না বললেই চলে।

ওদের বাড়ির প্রচুর পয়সা, কিন্তু শিক্ষা নেই, মেয়েদের ঘরে বন্দি করে রাখাটাই নাকি ওদের আভিজাত্য!

"ওমা দিও! দাঁড়া দাঁড়া, তোর সঙ্গে অনেক কথা আছে।" বিনির গোল গোল চোখগুলো যেন আর গোল হয়ে পুরো বিষ্টুদার দোকানের রসগোল্লা হয়ে গেল, আমার কাছে সরে হাত ধরে টিপল, "তুই তো এখন সেলিব্রিটি রে!"

বিনিকে অনেকদিন পর দেখে ভালো লাগলেও এইবার আমার বিরক্ত লাগল। দুমদাম ছেলে মেয়ে যেই হোক, এসে গায়ে হাত দিলে হেব্বি ঝাঁট জ্বলে যায় আমার।

মুখের কথা মুখেই বলো না বাপু! টেপাটেপি কেন?

আর বিনির এই ভিতু ভিতু ফিসফাস করে বলা ন্যাকামি আর গেল না। আমি হাতটা আলগোছে সরিয়ে নিলাম, "কেন কী করলাম আমি সেলিব্রিটি হওয়ার মতো?"

হাতটা সরিয়ে নিতে বিনি একটু মুখটা ভার করল, "উফ, তোর সঙ্গে না গল্প করে সুখ নেই। একরকম রয়ে গেলি!" পরক্ষণেই আবার চোখ গোল গোল করল, "কী করলি কী বলছিস! সব কাগজে এখন প্রথম পাতায় তোর ছবি, আর তুই বলছিস কী করলি?"

আমি এবার হাসলাম, "কিছুই এখনো করিনি রে, একটা অধিকারের জন্য লড়াই চালাচ্ছি এই আর কী!"

"না রে, কী সাহস তোর! এত বড়ো বড়ো জায়গায় বক্তব্য রাখছিস গুছিয়ে। আমাকে তো কাল হাওড়া থেকে পাত্রপক্ষ দেখতে এসেছিল, আমি টুক করে জানিয়ে দিয়েছি, খবরের কাগজে সকালবেলা যার ছবি বড়বড় করে দেখেছেন, সে আমার ছোট্টবেলার বান্ধবী। হি হি।" বিনি মুখ টিপে হাসল।

"হঠাৎ এই প্রসঙ্গ এল কেন?" আমি ভ্রূ কুঁচকোলাম।

"আরে ছেলের চার মাসি, দুই পিসি একসঙ্গে এসেছিল, একজন বলছে তোমার রুটি গোল হয় তো? একজন বলছে সেলাই কেমন পারো? বড়োপিসি যে, সে আবার বলছিল, পুজোর জোগাড় পারো তো? তখনই শুনিয়ে দিয়েছি।" বিনির চোখমুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল, "সবাই তো অবাক!"

আমি ক্লান্ত চোখে ওর দিকে তাকালাম।

আগে হলে সঙ্গে সঙ্গে অনেক তর্ক শুরু করতাম, ইদানীং কালে যেন কেমন ক্লান্তি আসে, মনে হয় এই বিনির মতো মেয়েরা কোনোদিনও শুধরোবে না, এরা পরাধীন থাকতে আসলে ভালোবাসে।

এদের জন্যই মেয়েরা চিরকাল দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হয়ে থেকে যাবে।

"লজ্জা করে না তোর? একটা শিক্ষিত মেয়ে হয়ে গোল রুটি হয় কিনা, চাটনি টক হয় কিনার মতো বোগাস প্রশ্নের উত্তর দিতে?" আমি রেগেমেগে বললাম।

"কী করব বল।" বিনির মুখ ম্লান হয়ে গেল, "তোর মতো লেখাপড়ায় তো অত ভালো ছিলাম না। তার ওপর বাড়িতে সবাই বিয়ের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আমার জন্য বোনেরও বিয়েটা হচ্ছে না।"

আমি ওকে কথার মাঝেই থামিয়ে দিলাম, "তুই কবে হাওড়া যাচ্ছিস দেখতে?"

বিনি অবাক, ”আমি? হাওড়া যেতে যাব কেন হঠাৎ? আগে সব কিছু ঠিক হোক বিয়ের …।”

”কেন তোরই তো যাওয়া উচিত।” আমি ভ্রূ ওপরে তুলে বললাম, ”তোকেই যখন বিয়ের পর গিয়ে থাকতে হবে, তখন ওদের বাড়িটা কেমন, কটা বাথরুম, শ্যাওলা পড়া না পরিষ্কার, কমোড না ইন্ডিয়ান, এসব দেখে আসবি না?”

বিনির চোখ বড় বড় হয়ে যেতে আমি আবার বললাম, ”ভুল বলছি কি? তোদের এত পয়সা, তবু গিয়ে শ্বশুরবাড়ির গুষ্টির সেবা করবি। আর ছেলেটা তো বিয়ের পর তোদের বাড়ি থাকতে আসবে না, তুইই নিশ্চয়ই হ্যাংলার মতো ছুটবি থাকতে!” শেষ দিকে অজান্তেই আমার গলাটা বিদ্রূপাত্মক হয়ে উঠল।

”থাম দিও! তোর সঙ্গে আগ বাড়িয়ে কথা বলতে যাওয়াই আমার অন্যায় হয়েছে।” বিনি ঝঙ্কার দিয়ে আমায় থামিয়ে দিল, ”মেয়েরা শ্বশুরবাড়িতে থাকার জন্য ছোটেনা বুঝলি, শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়েদের লক্ষ্মী করে নিয়ে যায়। এতে হ্যাংলামির কিছু নেই।”

”বটেই তো।” আমি আলতো মুখ বেঁকালাম, ”সেই লক্ষ্মীকে আবার পুড়িয়ে মেরেও ফেলে মাঝেমধ্যে।”

”তোর সঙ্গে কেন যে পাড়ার কোনো মেয়ে কথা বলে না সেটা আজ আবার বুঝলাম। এত বিশ্রী কথাবার্তা তোর, কে আগ বাড়িয়ে অপমানিত হতে আসবে?” রাগে বিনির নাকের পাটা ফুলছিল, ”এই বিয়ের দেখাসাক্ষাৎ, কথাবার্তা, পাকা দেখা এগুলোও এক একটা আনন্দ, তোর মতো খেটে মরা মেয়েরা সেসবের মর্ম বুঝবে না।”

পাশ কাটিয়ে চলে যেতে গিয়েও এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল বিনি, ”আর এইরকম নর্দমার মতো মুখের ভাষা নিয়ে তুই নাকি পুজো করবি! হু! সস্তা পাবলিসিটির জন্য হেদিয়ে মরছিস আবার বড়ো বড়ো কথা বলছিস! সেই সরস্বতী পুজোর দিন থেকেই দেখছি তুই একটা বাজে মেয়ে হয়ে গিয়েছিস।”

বিনি চলে গেলেও আমি কিছুক্ষণের জন্য এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে সামনে এগোতে পারছিলাম না।

একবার মনে হল সোজা গিয়ে বিনিকে টেনে দুটো থাপ্পড় কষাই।

নার্সারি থেকে একসঙ্গে পড়ে আমাকে এই চিনল? আমি সস্তা পাবলিসিটি চাইছি?

কিন্তু তারপর নিজেকে সংবরণ করলাম। বিনি যে কথাগুলো আজ রাগের মাথায় আমাকে বলে ফেলেছে, সেগুলো আসলে আমার আড়ালে পাড়ার মেয়ে-বউদের রোজকার আলোচনা। কিন্তু আমি তো বিনিকে ভালোর জন্যই বলছিলাম, ওকে কষ্ট দেওয়ার জন্য তো বলিনি।

আর কতকাল মেয়েদের সেজে গুজে পুঁটলি হয়ে বসতে হবে পাত্রপক্ষের সামনে? আর কতদিন একইরকম ভাবে বড়ো করেও মেয়ের বাবা-মা ছেলের বাড়ির সামনে নীচু হয়ে থাকবে?

শালা মেয়েরা নিজেরাই চায়না যে ছেলেমেয়ে সমান হোক। আমি তো কোনো পুরুষবিদ্বেষী নই, আমি শুধুমাত্র চাই ছেলেমেয়ে সমান অধিকার পাক। আর বিনি এতগুলো কথা শুনিয়ে দিল!

বিস্ময়টা কেটে যেতেই রাগে আমি রাস্তায় পড়ে থাকা একটা নুড়িকে জোরে লাথি কষিয়ে হাঁটতে লাগলাম।

নয়

"অপদার্থ!" বাবা জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে চাইলেন, "সকালে বেরিয়ে রাতে ফিরলে। সারাদিন কোনো পাত্তা নেই, ফোনও তুলছ না। তোমার আশায় থেকে থেকে আমি অল্টারনেট কোনো স্টেপও নিলাম না। আর এখন ডিনার টেবিলেও মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছ। তোমায় দিয়ে যদি একটা কাজ হয় কখনো। তোমার বড় হওয়ার, একটা প্রকৃত লিডার হবার কোনো মানসিকতাই নেই। সেই টিপিকাল চাকরি করা ভৃত্যসুলভ বাঙালি!"

রাতে খেতে বসেও শান্তি নেই, বাবার ফায়ারিং চলবেই।

আমার পাশেই টিকলি বসে রয়েছে, আর উলটোদিকে মেজোকাকা। তিনিও নিশ্চুপ। মেজোকাকিমা তরকারির বাটিগুলো এক এক করে নিয়ে এসে রাখছেন টেবিলে।

কাকিমাকে সাহায্য করছে আমাদের বাড়িতে প্রায় ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে থাকা দানুকাকা। দানুকাকা আর দানুকাকার ছেলে নন্তু আমাদের বাড়িতেই থাকে। দানুকাকার দেশের বাড়ি এই হাওড়ারই ভেতর দিকের কোনো একটা গ্রামে। নন্তু ছেলেটা পড়াশুনোয় বেশ ভালো, এবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। ওদের গ্রামের স্কুলেই পড়ে, এখান থেকে যাতায়াত করে।

মা থালায় গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত বাড়ছিলেন, মৃদু স্বরে বললেন, "খেয়ে নিয়ে কথা বললে হয় না?"

"না হয় না।" বাবা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, "এই খেয়ে নিয়ে, ঘুমিয়ে নিয়ে, এত কিছু 'নিয়ে'র জন্যই তোমার ছেলেটা আর মানুষ হচ্ছে না!"

আমি মাথা নীচু করে বসেছিলাম, এক হাতে গরম ভাত নাড়াচাড়া করছিলাম আর অন্য হাতে ফোনে খুটখাট করছিলাম।

দিওতিমা নামটা আমি জীবনে প্রথম শুনেছি, কিন্তু নামটা আসলে অনেক পুরোনো। নেট ঘেঁটে দেখলাম দিওতিমা আসলে প্রাচীন গ্রিসের মান্টিনিয়া নগরীর বিখ্যাত এক দার্শনিকের নাম। নামটা উইকিতে পড়ামাত্র যেন সেই জুঁই ফুলের গন্ধটা আবার পেলাম।

"কী করছ বলোতো তুমি ফোনে তখন থেকে?" বাবা তেতো গলায় গর্জে উঠলেন, "কী বলল সেটা কী বলবে গুছিয়ে?"

আমি কাঁচুমাচু মুখে বাবার দিকে তাকিয়ে তাকালাম, "নেগোশিয়েশন বা কোনোরকম মিটমাটের প্রশ্নই নেই। মেয়েটা ভীষণ জেদি। পরিষ্কার বলে দিল পুরোহিতদের লাইসেন্স ও চালু করবেই।"

"লাইসেন্স চালু করেই ছাড়বে? বটে?" বাবা সরু চোখে তাকালেন, "তোমাকে যা যা বলতে বলেছিলাম বলেছিলে?"

আমি ঘাড় নাড়লাম, "সব। কোনো লাভ হয়নি।" তারপরেই আমার ওই কথাটা মনে পড়ে গেল, "আচ্ছা একটা কথা। রবিবার মঞ্চে যে বক্তৃতা দিচ্ছিল তার নাম ঝন্টু তো?"

"হ্যাঁ, কেন? হঠাৎ?" বাবা তাকালেন।

"আমার মনে হয় ওইসব পার্টির লোকেদের এর মধ্যে ঢোকানোটা উচিত হয়নি।" প্রথম পাতে নিমপাতা-বেগুন ভাজা খেতে খেতে আমি মুখটা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখছিলাম, "ঝন্টু নাকি হুমকি দিয়েছে মেয়েটাকে। এরা সব কিছুতে গুন্ডাবাজি করে ভয় দেখিয়ে মুখ বন্ধ করতে চায়। সুদেবদা আবার ফোন করে টাকা অফার করেছে পিছিয়ে আসার জন্য। এটা জানাজানি হলে তো তোমারই ইমেজ খারাপ হবে, না! ঝন্টু জগদীশকাকার ভাইপো বলে হয়তো জগদীশকাকা ওকে কিছু বলছেন না, কিন্তু ব্যাপারটা ভালো হচ্ছে বলে তো মনে হয় না।"

বাবা চুপ করে গেলেন, কিছু বললেন না।

ভাতে ঘন মুগের ডাল ঢেলে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, "মেয়েটার সম্পর্কে সব ডিটেইলস জোগাড় করো তো। কোথায় থাকে, কী করে, বাড়িতে কে কে আছে। বাড়ি তো বোধ হয় উত্তরপাড়ায়, কালই চলে যাও। সন্ধের মধ্যে জানাও আমায়।"

এইবার আমি আবার মিনমিন করলাম, "আজ অফিস যেতে পারিনি। কাল তো আমাকে অফিস যেতেই হবে। নতুন চাকরিতে এত ছুটি ...।"

"কে করতে বলেছে তোমায় চাকরি?" বাবা আবার রেগে গেলেন, "তুমি কি এগুলো আমার সঙ্গে শত্রুতা করার জন্য করছ? ভটচাজ বাড়ির একমাত্র ছেলে তুমি, এত বড় ব্যবসা, এত বড় অ্যাসোসিয়েশন, কে দেখবে এগুলো আমার পরে? তখনই পইপই করে বলেছিলাম ফাইন আর্টস নিয়ে না পড়ে কমার্স নিয়ে পড়তে, তাহলে ব্যবসারও সুবিধে হত। শুনলে না। ফাইন আর্টস নিয়ে পড়লে। তাও ঠিক আছে, কিন্তু এখন চাকরিবাকরি এসব কী!" গর্জে উঠলেন বাবা, "ডিট্টো ছোটন তৈরি হচ্ছে! ভেবো না এইসব বাঁদরামি আমি সহ্য করব। বসন্ত ভট্টাচার্য অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না, সে নিজের ছেলে হোক আর যেই হোক!"

কোনো মানুষ যতই শান্ত হোক, যতই ভিতু হোক, একেক সময় তারও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। আমি কারুর ক্ষতি করছি না, খারাপ কাজ করছি না, শুধু নিজের ভালোলাগাটুকুকে নিয়ে বাঁচতে চাইছি, তাতে এত প্রবলেম কেন লোকজনের? সারাক্ষণ যার তার সামনে অপমান?

আমার আর পোষাল না, সবে নিমপাতা মাখা ভাতটা শেষ করেছিলাম, সেই তেতোমুখেই চেয়ারটা সজোরে ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

দুমদাম করে ঘরে চলে আসার সময়ে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, বাবা আমার এমন অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে অবাক হয়ে গেছেন। থতমত মুখে দেখছেন আমার চলে যাওয়া।

আসলে যে যাই-ই বলুক, আমি মনে মনে কষ্ট পেলেও বাইরে তার কোনো প্রতিফলন দেখাইনা।

তাই আমার রাগ দেখতেও লোকে অভ্যস্ত নয়।

বিরক্ত লাগছে। আর ছোটকাকার ওপর বাবার কিসের এত রাগ বুঝি না। বাবার মতো বৈষয়িক না হলেই সবাই খারাপ? ক্রিয়েটিভিটির কোনো দাম নেই? অন্যসময় হলে আমার চোখে জল চলে আসত, কিন্তু এখন এল না, আমার ঘরের সাবেক আমলের পালঙ্কের একপাশে জানলায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমি চুপ করে।

একটু পরেই কাঁধে কার স্পর্শ, চেয়ে দেখি মা। পেছনে টিকলিও রয়েছে।

মা নরম গলায় বললেন, "খাওয়ার টেবিল থেকে এইভাবে উঠে আসতে হয়? ছি ছি।"

দুনিয়ার ওপর আমার যত রাগ, যত মেজাজ সব আমি এই একটা মানুষের ওপর দেখাই।

"ছাড়ো তো!" ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললাম, "ছি ছি টা আমাকে না করে টেবিলে বসে থাকা ওই কাপালিককে করো, কাজে দেবে।"

"এ কী ভাষা রূপ!" মা-র চোখে মুখে অবিশ্বাস, "বাবাকে কেউ কাপালিক বলে?"

টিকলিও হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, আমার মুখের এমন ভাষা সম্ভবত ও প্রথম শুনল।

কিন্তু আমি দমলাম না, "থামো তো মা! আমার আঁকতে ভালো লাগে, আমি নিজের যোগ্যতায় সরকারি আর্ট কলেজে চান্স পেয়েছিলাম। এখন নিজেরই যোগ্যতায় চাকরিটা পেয়েছি, এবং আমার কাজ নিয়ে আমি যথেষ্ট খুশি। কিন্তু বাবার জন্য আমাকে চাকরিটা ছেড়ে দিতে হবে? আমার কোনো নিজস্ব ইচ্ছে-অনিচ্ছে থাকতে পারে না?

মা বললেন, "দ্যাখ! তোর দিক থেকে তুই একদম ঠিক। কিন্তু তোর বাবা আসলে এই অ্যাসোসিয়েশনের ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব ভয় পান। জগদীশদা, সুদেবেরও তো বয়স হচ্ছে। তুই শক্ত হাতে হাল না ধরলে কতরকমের মতলব নিয়ে লোকে যে আজকাল আসে! এই তো রঘুবীরের ছেলেটা দিনরাত কেমন ...!"

"তুমি একটা থ্রি পর্যন্ত পড়ে পড়াশুনো ছেড়ে দেওয়া ছেলের সঙ্গে আমার তুলনা করছ?" আমি আরও রেগে যাচ্ছিলাম, "আত্মারাম আর আমি এক হলাম?"

মা বললেন, "আহা আমি সেটা বলিনি। আসলে অ্যাসোসিয়েশনের ...!"

"আরে চুলোয় যাক এই অ্যাসোসিয়েশন। ওই দিওতিমা বলে মেয়েটা তো ঠিকই বলছে, ক-টা পুরোহিত ভালো মন নিয়ে পুজো করে বলো তো? সব শালা নিজের ধান্দাবাজিতে ব্যস্ত, তাদের আদৌ প্রণামী নেওয়ার কোনো যোগ্যতা আছে? তুমি আত্মারামের কথাই ধরো না, চুল্লুবাজ অশিক্ষিত। কেন ও শুধু শুধু ভক্তি পাবে মানুষের থেকে? ভারতের এত হাজার মন্দিরের ক-টা পুরোহিত সত্যিই চরিত্রের দিক দিয়ে শুদ্ধ বলো তো?"

টিকলি এতক্ষণে মুখ খুলল, "এভাবেই তো চলে আসছে দাদাভাই!"

"চলে অনেক কিছুই আসে। সময়ের সঙ্গে সেগুলো পালটাতেও হয়।" আমি হঠাৎ আবিষ্কার করলাম নিজের অজান্তেই আমি যেন বিপক্ষ অর্থাৎ ওই দিওতিমা বলে মেয়েটার পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছি।

আমি প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিয়ে বললাম, "আর বাবা যদি ভেবে থাকে এইরকম ভাবে আমার চাকরির বারোটা বাজাবে, আমি সেটা কিন্তু কিছুতেই মেনে নেব না মা। আমার আঁকতে ভালো লাগে, নিজের যোগ্যতায় আমি এই ফার্মে আর্টিস্ট হিসেবে কাজ পেয়েছি। এখন বাবা যদি চান ছোটকাকার মতো আমিও ...!" আমি বলতে বলে ঠোঁট কামড়ালাম।

"চুপ কর রূপ!" মা এবার চেঁচিয়ে উঠলেন, "অনেক বেশি কথা বলছিস আজকাল! মুখে লাগাম টানতে শেখ।"

আমি চুপ করে গেলাম। উত্তেজনার বশে একটু বেশিই কিছু বলে ফেলেছি।

"তোরা সবকিছু আমাকে শুনিয়ে কি মজা পাস? আমি কি তোদের সবার রাগ মেটানোর জন্য রয়েছি?" অস্ফুটে কথাটা বলে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই মা

বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

টিকলিও বলল, ”এসব কী বলছিস তুই দাদাভাই!”

আমার তাণ্ডব মুহূর্তে স্তিমিত হয়ে এল।

প্রত্যেক পরিবারেই এমন কিছু বিষয় থাকে, যা নিয়ে কেউ কথা তোলে না, সবার মনের মধ্যেই ঘুরপাক খেলেও প্রত্যেকে সযত্নে সেটাকে এড়িয়ে যায়।

আমাদের এই ভট্টাচার্য পরিবারে ছোটকাকাও তেমনই এক স্পর্শকাতর বিষয়।

আগেই বলেছি, ছোটকাকা ছিল এই পরিবারের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সন্তান। কিন্তু প্রেসিডেন্সি থেকে সোনার মেডেল নিয়ে বেরনোর পর বাবা যখন তাঁকে বাইরে ব্যারিস্টারি পড়তে পাঠানোর তোড়জোড় করছেন, সেই সময় ছোটকাকা দুম করে ঘোষণা করলেন তিনি আর পড়বেন না।

বাবা তখন অবাক হয়ে বলেছিলেন, ”ছোটন তুই আর পড়বি না? এখন থেকেই দোকানে বেরোবি? কেন তোর এত ভালো মাথা, আরও পড়। আমি আর খোকন তো আছিই।”

”না দোকানেও বেরবো না। যাদবপুরের একটা মিউজিক কোয়্যারে কিছুদিন ভায়োলিন বাজালাম। ভাবছি ওখানেই ফুল টাইম বাজাব।” আলগোছে উত্তর দিয়েছিলেন ছোটকাকা।

সম্ভবত তিনি কল্পনাও করতে পারেননি তাঁর আপাতনিরীহ এই পরিকল্পনায় বাড়িতে কত বড় অশান্তির ঝড় বয়ে যেতে পারে। আমি তখন ছোট, এসব কোনো কিছুই আমার তেমন মনে নেই। কিন্তু পুরোটাই ঠাকুমার মুখে এতবার শুনেছিলাম যে শুনতে শুনতে কখন যেন মনে হতে শুরু করেছিল যে সত্যিই আমার চোখের সামনে ঘটেছে পুরো চিত্রনাট্যটা।

বাবা কিছুক্ষণ নাকি কথা খুঁজে পাননি, হতবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলেছিলেন, ”তুই … তুই বেহালা বাজাস!”

”হ্যাঁ। বাজাই। কেন তোমাদের সবাইকে যে আগের মাসে আমাদের অনুষ্ঠানে যেতে বললাম, মনে নেই? কেউই তো গেলে না।” ছোটকাকা হাত উলটে বলেছিলেন।

বাবা সাতকাজে থাকা মানুষ, ছোট ভাইয়ের কি না কি অনুষ্ঠান, তিনি সময় করে উঠতে পারেননি, সময় থাকলেও সম্ভবত সেটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনেননি। প্রেসিডেন্সির সোনার মেডেল পাওয়া ছাত্র চোখধাঁধানো চাকরি বা আরও পড়াশুনো করবে সেটাই স্বাভাবিক, সেসব ছেড়ে যে কেউ বেহালা বাজানোর মতো একটা অকিঞ্চিৎকর কাজে সময় নষ্ট করতে পারে, তার চেয়েও বড় কথা, বেহালা বাজানোকে পেশা হিসেবে নিতে পারে, সেটা ছিল বাবার কল্পনারও বাইরে।

সেই শুরু হল। প্রথমে বোঝানো, তর্ক-বিতর্ক, মনোমালিন্য। তারপর তিক্ততা, ঝগড়া। ঠাকুমা দুই ছেলেকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। দুই ভাই-ই অসম্ভব জেদি।

শেষের দিকে বাবা ছোটকাকার সঙ্গে আর কথাই বলতেন না। খালি তির্যক মন্তব্য, পরোক্ষ বিদ্রুপ, এভাবেই চলছিল।

বাবার ক্রমাগত উপহাসে ছোটকাকা বাড়িতে সবার সঙ্গে বসে একসঙ্গে খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকতেনও না, তবু নিজের লক্ষ্য থেকে তিনি একচুলও

নড়েননি। দিনরাত পড়ে থাকতেন বেহালা নিয়ে যাদবপুরের ওই কোয়্যারে।

আজ যখন পুরোনো কথাগুলো মনে করি, ভাবি এত শক্ত মানুষ যিনি সবকিছুর প্রতিকূলতায় অত অনমনীয় ছিলেন, হঠাৎ করে তাঁর কি মতিভ্রম হল?

আমি থেমে গেলাম।

ঘড়ির কাঁটায় মধ্যরাত, বারোটা ছুঁই ছুঁই। আমি একটা নিশ্বাস ফেলে বাথরুমে গিয়ে মুখ-হাত ধুলাম। চোখেমুখে জল দিলাম ভালো করে।

ছোটকাকার আমি খুব ন্যাওটা ছিলাম, পায়ে পায়ে ঘুরতাম ছোটবেলায়। কাকা আমাকে পাশে বসিয়ে একেকটা সুর তুলতেন, লিখতেন খাতায়।

শেষদিনও হয়তো আমায় পাশে বসিয়েই সুইসাইড নোটটা লিখেছিলেন গান লেখার খাতায়।

একটুও টের পাইনি আমি। বুঝতেই পারিনি, আর কয়েক ঘণ্টা পরেই ছোটকাকার নিথর দেহটা ঝুলবে কড়িকাঠ থেকে।

আজও ছোটকাকা তার সেই সুর নিয়ে আমার মনের ভেতর থিতিয়ে থাকা পলির মাঝে অদৃশ্য চড়ার মতো রয়েছেন। সেখানে নিস্তব্ধ রাতে নৌকো এসে নোঙর ফেলে, দাঁড় টানার শব্দ হয় ছপাছপ!

আর আমি চোখ বুজে সেই পৃথিবীর আলো না দেখা সুর আর বিষাদের তরঙ্গগুলো নিয়ে খেলা করতে থাকি।
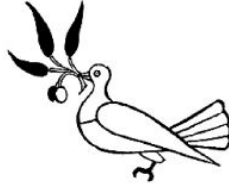
দশ

অন্যদিন অফিস থেকে বেরোই পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। বেরিয়ে দেড়ঘণ্টা ধরে বাসে হেজিয়ে হাওড়া স্টেশন পৌঁছনো, তারপর সেখান থেকে মেন লাইনের ট্রেন ধরে উত্তরপাড়া। সেখান থেকে আবার সাইকেল। মোটামুটি সাড়ে সাতটার মধ্যে বাড়ি ঢুকে যাই। কিন্তু আজ ফিরতে দেরি হবে। দুপুরে লাঞ্চের পরই চলে এসেছি কাছের এক হাইস্কুলে।

রাজ্যসরকারি দপ্তরে আমার পদটার নাম বেশ ওজনদার। ব্লক ইয়ুথ অফিসার। ব্লকের যুবকল্যাণসংক্রান্ত নানা কাজ দেখা আমার কাজ। জেলাশাসকের নির্দেশ এসেছে, এখন থেকে অফিসের কাজের সঙ্গে সঙ্গে কাছের স্কুলগুলোতেও মাঝেমধ্যে ভিজিট করতে হবে, উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলতে হবে তাদের কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা, প্রশাসন থেকে তারা কি সহায়তা পেতে চাইছে এইসব। স্কুল পাশ করে বেরনোর পর সরকারি কী কী প্রকল্পের সুবিধা তারা পেতে পারে, সেই ব্যাপারে সম্যক ধারণা দিতে হবে তাদের।

সেইমতো সপ্তাহে একদিন দুপুরের পর বেরিয়ে পড়ি কোনো একটা স্কুলে। স্কুলের পড়াশুনো, পানীয় জল, শৌচাগার, সবকিছু দেখে এসে রিপোর্ট দিই বিডিও সাহেবকে। আগে এই কাজ স্কুল ইনস্পেক্টরের থাকলেও অ্যাডমিনিস্ট্রেশনও আজকাল এইসব দেখছে।

আজ এসেছিলাম মানকুর বলে একটা গ্রামে। আমার পোস্টিং হাওড়ার বাগনান এক নম্বর ব্লকে। চাকরি পাওয়ার আগে যখন হাওড়া স্টেশন হয়ে কলেজ যেতাম, হাওড়া মানেই চোখের সামনে একটা ঘিঞ্জি ব্যস্ত দোকানপাট, রাস্তাঘাট ভেসে উঠত। এই চাকরিটা না পেলে জানতেই পারতাম না হাওড়া জেলার ভেতরে কত সব প্রত্যন্ত গ্রাম আছে। আমাদের এই বাগনান এক নম্বর ব্লকেই তো মোট একচল্লিশটা গ্রাম। কিছু কিছু গ্রামে গেলে মনে হবে কলকাতা থেকে এইটুকু নয়, পুরুলিয়া বা বীরভূমের কোনো গ্রামে চলে এসেছি যেন।

এই মানকুর গ্রামটাও তেমনই। যতদূর চোখ যায় মাটির রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। কিছুদূর এগোলেই নদী। মানকুর গ্রামের একমাত্র স্কুল এই দেউলগ্রাম মানকুর বাকসি উচ্চ বিদ্যালয়টাও বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে। নিজস্ব পুকুর, খেলার মাঠ সব রয়েছে। আসলে মানকুর, দেউলগ্রাম আর বাকসি, এই তিনটে ছোট ছোট গ্রামের এই একটাই স্কুল।

আমার সব রিপোর্ট মোটামুটি নেওয়া হয়ে গিয়েছিল। হেডমাস্টারের ঘরে বসে চা খাচ্ছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম ক্লাস টুয়েলভের প্র্যাকটিকাল শেষ হওয়ার জন্য। বিডিও স্যার বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন রিপোর্টে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বক্তব্যও থাকতে হবে।

হেডমাস্টার মানুষটা বেশ অমায়িক মানুষ, নাম জয়ন্ত কর্মকার। এসে থেকে বেশ খাতির যত্ন করছেন, আমাকে ভেবেছেন বুঝি কোনো হোমরাচোমরা। চা-র সঙ্গে দুটো মিষ্টিও দিয়েছেন, যদিও আমি সেটা খাইনি।

"এখানে যে এত কাছে নদী আছে আমি জানতামই না!" আমি বললাম। এখন লোডশেডিং চলছে। কিন্তু পাখা না চললেও দিব্যি বিকেলের ঠান্ডা হাওয়া দূর থেকে ভেসে

আসছে।

"রূপনারায়ণ নদী ম্যাডাম। আর একটু আগে বললে গিয়ে দেখিয়ে নিয়ে আসতাম আপনাকে।" হেডমাস্টার হাসলেন, "ভারী সুন্দর জায়গা। শীতকালে তো শহর থেকে দলে দলে পিকনিকেও আসে, তখন বোটিংও হয়।" জয়ন্তবাবু তাঁর চশমার ফাঁক দিয়ে হাসলেন।

"নৌকো চলে না?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, তাও চলে। কাছেই দুধকুমড়ো বলে একটা গ্রাম আছে, আমাদের এই মানকুর থেকে ওই দুধকুমড়োয় নৌকো চলে।"

"দুধকুমড়ো! কী সুন্দর নাম!" আমি অভিভূত হয়ে গেলাম।

সত্যি, জন্মে থেকে মাখলার ওই গলিতে থেকে থেকে না চিনলাম বড় শহর, না চিনলাম সবুজ শ্যামল গ্রাম। না ঘরকা না ঘাটকা!

ইশ! এমন গ্রামে যদি আমার একটা বাড়ি থাকত! আমি ঠিক পয়সা জমিয়ে একটা নৌকো কিনতাম, তারপর দাঁড় উজিয়ে ঘুরে বেড়াতাম ওই রূপনারায়ণ নদীতে।

একজন বেয়ারা এসে খবর দিল, ওদের ল্যাবের কাজ প্রায় শেষের দিকে, আমি চাইলে গিয়ে কথা বলতে পারি।

জয়ন্তবাবু আমার দিকে তাকালেন, "আপনি কি ওদের সঙ্গে ক্লাসরুমে কথা বলবেন? নাকি কেমিস্ট্রি ল্যাবেই? ওরা আসলে প্র্যাক্টিকাল ক্লাস করছে তো।"

"না না চলুন, আপনাদের ল্যাবোরেটরিটা দেখে আসি।" আমি পা বাড়ালাম।

এখনকার উঁচু ক্লাসের ছেলেমেয়েরা অনেক সপ্রতিভ। আমি রুটিন প্রশ্নগুলো আগে করে নিচ্ছিলাম, সবাই সরকারি প্রকল্পের টাকা ঠিকঠাক পাচ্ছে কিনা, ক্লাস ঠিকমতো হয় কিনা, ল্যাবের যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কিনা।

একপাশে কয়েকটা ছেলেমেয়ে একটা জারের মধ্যে ফিতের মতো সরু কাগজ ডোবাচ্ছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই কাগজটার নাম কী?"

"লিটমাস কাগজ।" একদম সামনের চশমা পরা ছেলেটা উত্তর দিল। বাকি ছেলেমেয়েগুলোও আমার দিকে দেখছে।

"রাইট।" আমি হেসে বললাম, "কী করা হয় এটা দিয়ে?"

"কোনো মিশ্রণ, তাতে অ্যাসিড রয়েছে না ক্ষার, সেটা বের করা হয় এই কাগজ দিয়ে। অ্যাসিড হলে নীল রঙের লিটমাস কাগজটা লাল হয়ে যায়। আর ক্ষার থাকলে লাল রঙের কাগজটা নীল হয়ে যায়।" ছেলেটা মোটা পাওয়ারের চশমার ফাঁক দিয়ে স্মার্টলি উত্তর দিল।

গ্রামের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মান বেশ খারাপ। বেশিরভাগই মাধ্যমিক পাশ করে গেলেও সামান্য জ্ঞান পর্যন্ত নেই। তাই ছেলেটার বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরে বেশ চমৎকৃত হলাম, "একদম ঠিক বলেছ। অ্যাসিড আর ক্ষার এইদুটো সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী পদার্থ, এদের মাঝে সেতুর মতো কাজ করে এই লিটমাস কাগজ।" আমি ছেলেটার দিকে তাকালাম, "তোমার নাম কী?"

"অমিয়রঞ্জন কুণ্ডু।" ছেলেটা একটু থেমে বলল, "আমি আপনাকে চিনি।"

এবার আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম।

আমি মানকুর গ্রামে এই প্রথম এসেছি, আমাকে চেনার তো কথা নয়। বললাম, "আমাকে চেনো? কী করে?"

"কাগজে ছবি দেখেছি। আপনার নাম দিওতিমা বিশ্বাস তো?" অমিয় বলল, "আপনাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে খুব গন্ডগোল হচ্ছে রোজ।"

আমি ফেরার জন্য দরজার দিকে পা বাড়িয়েছিলাম, ছেলেটা যে কাগজে আমার ছবি দেখে চিনতে পেরেছে তা আন্দাজ করেছিলাম।

কিন্তু শেষ বাক্যটা শুনে আমি অবাক হয়ে পেছনে ফিরলাম, "মানে? আমাকে নিয়ে তোমাদের বাড়িতে রোজ অশান্তি হচ্ছে! কেন?"

অমিয় ঝকঝকে দাঁত বের করে হাসল, "আমি তো হাওড়ার চণ্ডীবাড়িতে থাকি। আমার বাবা ওঁদের বাজার দোকান করেন। জ্যাঠামশাই মানে বসন্ত ভট্টাচার্য হলেন সব পুরোহিতদের হেডস্যার, জানেন তো? হেব্বি খচা আপনার ওপর। কাল রাতেও রূপদাদার সঙ্গে ঝামেলা হল এই নিয়ে।"

মুহূর্তে আমার মুখটা শক্ত হয়ে যেতে দেখে জয়ন্তবাবু এগিয়ে এলেন, "ম্যাডাম চলুন। আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে। এরপর হাওড়া ফেরার বাস পেতে মুশকিল হবে।" তারপর অমিয়র দিকে তাকিয়ে ধমক দিলেন, "অ্যাই, ক্লাসে যা সব!"

"একটু দাঁড়ান জয়ন্তবাবু।" আমি এগিয়ে গেলাম অমিয়র দিকে, "ঝামেলা হয়েছে কেন?"

"কাল তো রূপদাদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল? সেই নিয়ে জ্যাঠামশাই রূপদাদাকে অপদার্থ বলেছেন। রূপদাদাও না খেয়ে উঠে চলে গেছে ঘরে, তাতে জ্যাঠামশাই আরও রেগে গিয়েছিলেন। এইসব নিয়ে একচোট হল আর কী! রাতে রূপদাদা আর খায়নি। জেঠিমা'ও কান্নাকাটি করছিল।" ছেলেটা গড়গড় করে বলে গেল।

স্কুল থেকে বেরিয়ে সহজে বাস পাওয়া গেল না। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক যুদ্ধের পর যখন হাওড়া স্টেশনে নামলাম, তখন আকাশে ছোপ ছোপ অন্ধকার নেমে এসেছে।

কয়েকদিনের গুমোট গরমের পর গাছের পাতাগুলো বেশ জোরে জোরে দুলছে, সঙ্গে বেশ ঠান্ডা হাওয়া। কোথাও নির্ঘাত বৃষ্টি হচ্ছে।

আমি সাবওয়ে দিয়ে নেমে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছিলাম, বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে বৃষ্টি নেমে গেলে আরেক ঝামেলা, সঙ্গে ছাতাও নেই আমার।

ছুটতে ছুটতে অমিয় বলে ছেলেটার কথা মনে পড়তে আশ্চর্য লাগছিল। মঙ্গলরূপ আর ওর বাবা-র মধ্যে শেষে আমাকে নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে?

কেন, ছেলেটা কী বলছে ওর বাবাকে?

এমনিতে আমি যখন অফিস থেকে ফিরি, ওই বিকেল সাড়ে পাঁচটা ছ-টা নাগাদ, ভিড়ের চাপে সাবওয়েতে ঠিকমতো হাঁটা যায় না। সবাই ছোটে। কিন্তু আজ একটু বেশি রাত হয়ে গেছে বলেই বোধ হয় বেশ ফাঁকা।

একটা পাতি লেবুওয়ালা রোজ একটা নির্দিষ্ট জায়গায় বসে লেবু বিক্রি করে, আমি ওর বাঁধা খদ্দের। লোকটার কাছ থেকে কয়েকটা লেবু কিনে সিঁড়িতে উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু

পারলাম না।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় আমার ঠিক ওপরের ধাপে এসে দাঁড়াল ঝন্টু। হাতে একটা বড়ো চাবির রিং বনবন করে ঘোরাচ্ছে, মুখে বিশ্রীভাবে চিবোচ্ছে কিছু একটা। আগের দিনের দুটো ছেলের মধ্যে একজনও আজ সঙ্গে নেই।

হলদে দাঁতগুলো বের করে বলল, "উত্তরটা কিন্তু এখনো পেলাম না ম্যাডাম!"

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিক তাকালাম। লোকজন বেশ কম হলেও আছে। কিন্তু সবাই নিজের মতো সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, নামছে। বিপদে বাঁচাবার দায় কারুর নেই।

আমার গোটা সালোয়ারটা এতক্ষণ বাসে চিঁড়েচ্যাপটা হতে হতে ঘামে ভিজে উঠেছে, মুখটাও জবজবে। চুলগুলো লেপ্টে রয়েছে গালের দুপাশে, আমি রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে বললাম, "কিসের উত্তর?"

"ওই দেখুন!" ঝন্টু আমার কাছে ঝুঁকে এসে ঘাড় দোলাল, ওর মুখের বিকট গন্ধ অমনি ভক করে আমার নাকে এসে ঝাপটা লাগল।

বদ দুর্গন্ধে গা গুলিয়ে উঠল আমার, কিন্তু তাতে ওর কোনো হেলদোল নেই। একই লয়ে বলে যেতে লাগল, "সেদিন যে এত করে বোঝালাম, সব ভুলে মেরে দিলেন? মালকড়ি কত নেবেন বলুন? কেসটা তুলতে হবে তো, নাকি?"

আমি এক ধাপ পিছিয়ে সাবওয়ের সমতল জায়গায় এসে দাঁড়ালাম। ডানপাশে টিকিট কাউন্টার, কিন্তু সেখানে সব কটা কাউন্টারই বন্ধ। লেবুওয়ালাও উঠে চলে গেছে। দূরে একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে।

একটা লোক এক্ষুনি চলে গেল আমার পাশ দিয়ে, সিঁড়িতে ওঠার আগে একদলা থুতু ফেলে দিয়ে গেল পাশে।

অন্য কেউ হলে আমি তাকে এতক্ষণে চড়থাপ্পড় কষিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দিতাম, কিন্তু এই ঝন্টু ছেলেটার চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এ একেবারে নির্মম গুন্ডা। আর সব জায়গায় হম্বিতম্বি করার ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করাটা বোকামি, এটা ছবিদাদু আমাকে অনেকবার বুঝিয়েছেন।

এইসব পরিস্থিতিতে ঠান্ডা মাথায় কাজ গোটাতে হবে। তাই কিছুতেই মাথাগরম করা যাবে না।

আমি মিষ্টি হেসে ঝন্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, "দেখুন ভাই। আপনাকে আমি পরিষ্কার বলছি। আমি কোনো টাকাকড়ির বিনিময়েই কেসটা তুলব না। সুদেববাবু বলে একজন ফোন করেছিলেন, তাকেও একই কথা বলেছি। আমার পুজো করার ইচ্ছে ছোট থেকে।"

"আরে ম্যাডাম, আপনার পুজো করার ইচ্ছে। কি হাওড়া ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দেওয়ার ইচ্ছে, সেসব করতে কেউ মানা করেনি। কিন্তু এইভাবে যারা বছরের পর বছর পুরুতগিরি করে খাচ্ছে, তাদের পেছনে আছোলা বাঁশ দিচ্ছেন কেন? তারা আপনার কোন পাকাধানে মই দিয়েছে?" ঝন্টু তেরিয়া হয়ে উঠল।

এবার আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, ওকে পাশ কাটিয়ে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে কেটে কেটে বললাম, "যোগ্য লোকেরা পুজো করবে, ওকে? অযোগ্যরা নয়।"

আমি চলে যাচ্ছি দেখে ঝন্টু এগিয়ে এসে দুম করে আমার হাতটা ধরে ফেলল, ”আরে আরে দাঁড়ান, কোথায় যাচ্ছেন!”

আমি আর মাথা ঠান্ডা রাখতে পারলাম না।

গায়ে অবাঞ্ছিত স্পর্শ আমার মাথায় আগুন জ্বালিয়ে দিল। চুলোয় যাক ছবিদাদুর উপদেশ, এত বড় স্পর্ধা একটা লোফার আমার গায়ে হাত দেয়?

আমি ঘুরে সটান এক চড় কসালাম ঝন্টুর গালে, ”অসভ্য লোফার! রাস্তাঘাটে মেয়েদের গায়ে হাত দিতে লজ্জা করে না? আরপিএফ-কে ডাকব? কেরদানি বেরিয়ে যাবে।”

ঝন্টু চড়টা খেয়ে এতটাই হতভম্ব হয়ে গেল যে কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলো না।

আশপাশে যে দু-তিনজন লোক আসা যাওয়া করছিল, তারাও এবার কৌতূহলী হয়ে দেখতে লাগল এদিকে।

আমি আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালাম না। ট্রেন ছাড়তে আর এক মিনিটও বাকি নেই, আমি রুদ্ধশ্বাসে হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়ে দেওয়া মেন লাইনের আপ লোকালে উঠে পড়লাম। উঠে বসতে না বসতে সাইরেন বাজিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল।

উত্তেজনায়, ঘটনার আকস্মিকতায় আমার বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছিল, ঠোঁটদুটো থরথর করে কাঁপছিল। তবু মাথাটা আগুনের মতো গরম হয়ে রয়েছে।

ব্যাগ থেকে বোতল বের করে ঢকঢক করে প্রায় আধবোতল জল খেলাম। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলছে। উলটোদিকের সিটে বসা বাচ্চা মেয়েটা হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

কিন্তু আমার দোষ হল, মাথা একবার গরম হয়ে গেলে সহজে ঠান্ডা হতে চায় না। রাগটা বেরনোর জন্য কাউকে আচ্ছা করে ঝাড়া দরকার। আশেপাশে তাকিয়ে কী করব বুঝতে পারলাম না। বোতলটা ব্যাগে ঢোকাতে যেতেই ব্যাগের ভেতর চোখে পড়ল লিটমাস কাগজগুলো। আসার সময় আমি নিজেই হাতে করে নিয়ে এসেছিলাম কয়েকটা কাগজ।

ইলেভেন টুয়েলভে আমার সায়েন্স ছিল না, তবু কেমিস্ট্রি ল্যাব থেকে এই কাগজগুলো মাঝেমাঝেই বাড়িতে নিয়ে আসতাম, কখনো বাথরুমের অ্যাসিডে চুবিয়ে, কখনো কাপড় কাচার ক্ষারে ডুবিয়ে রং পরিবর্তন দেখাটা ছিল আমার নেশা।

লাল নীল লিটমাস কাগজগুলো দেখতে দেখতে ধাঁ করে একটা মুখ মনে পড়ে গেল।

মনের মধ্যে কথাগুলো সাজিয়ে নিতে নিতে ফোন বের করে ঝটিতি ডায়াল করলাম আমি।

এগারো
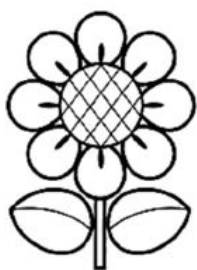
আমি আর জিষ্ণু অফিস থেকে ফিরছিলাম। এসি বাস। রোজই এসি বাসে ফিরি। কিন্তু আজ কেমন যেন কাঁপুনি দিচ্ছে।

জিষ্ণু কানে হেডফোন লাগিয়ে চোখ বন্ধ করে বসেছিল। আমি ওর হাতে মৃদু টোকা দিতেই চোখ খুলে বলল, "কি? এর মধ্যেই এসে গেল নাকি?"

"না না! এখনো দেরি আছে।" আমি আশ্বস্ত করে বললাম, "তোর ঠান্ডা লাগছে না?"

"ঠান্ডা?" জিষ্ণু কান থেকে একটা হেডফোন খুলে আমার দিকে তাকাল, "এই পচা গরমে একটু শান্তির জন্য চল্লিশ টাকা খরচা করে এসি বাসে যাচ্ছি আর তোর ঠান্ডা লাগছে? ফোনটা অন করেছিস? কাকিমা কিন্তু আমাকে একটু আগেও ফোন করেছিলেন।"

আমি চুপ করে গেলাম। এখনো হাওড়া আসতে প্রায় কুড়ি মিনিট মতো দেরি। জিষ্ণু হাওড়ায় নেমে আবার ট্রেন ধরবে। আর আমি অটো। ঠিকমতো গেলে আর আধঘণ্টার মধ্যে আমি বাড়ি চলে যাব।

কিন্তু আজ আমার বাড়ি যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না! একে সেদিন রাতে বাবার বলা কথাগুলো শেলের মতো বুকে বিঁধছে, তার ওপর বলা নেই কওয়া নেই, কাল সন্ধ্যাবেলা হঠাৎ করে দিওতিমার ফোন পেয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

ভেবেছিলাম, কোনো দরকারে ফোন করছে বুঝি। কিন্তু 'হ্যালো' বলামাত্র ওপাশ থেকে শুরু হয়েছিল গোলাবর্ষণ।

মেয়েটা আমাকে কোনো কথা বলারই সুযোগ দেয়নি। আমি, আমার বাবা এবং ওই পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশন নাকি ওর জীবনটা ধ্বংস করে দিচ্ছি, আদতে পুরোহিত ব্রাহ্মণের আড়ালে আমরা সবাই এক একটা গুন্ডা, ইতর ... দিনেদুপুরে মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা করি ... কিচ্ছু বলতে বাকি রাখেনি ও।

একনাগাড়ে সাত মিনিট একুশ সেকেন্ড চোখা চোখা অপমান করে খট করে কেটে দিয়েছিল ফোনটা।

গোটা ঘটনাটা মনে পড়তেই হাওড়া ব্রিজের ওপর থেকে নীচের গঙ্গা নদীর অন্ধকার জলের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেটে জল এল। কিছু মানুষ আছে, যাদের বিনা কারণে বিনা দোষে অপমানিত হতে হয়। লাঞ্ছিত হতে হয়। যেমন আমি। কখনো মনে পড়ে না কারুর সজ্ঞানে কোনো ক্ষতি করেছি, কাউকে ইচ্ছাকৃত আঘাত দিয়েছি। নিজের মনে থাকি। বিশাল কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, নিজের ছোট ছোট খুশিগুলো নিয়ে বাঁচতে চাই। কেউ খারাপ ব্যবহার করলে পালটা জবাব চট করে দিতে পারি না। ভাবি, আহা কষ্ট পাবে! কিন্তু আমার এই অতিভদ্রতাবোধই লোকের কাছে আমার দুর্বলতা বলে প্রতিভাত হচ্ছে। নিজের কেউ হোক বা পর। বহুদিনের চেনা হোক বা দুদিনের। সবাই আমাকে হেয় করে মজা পেতে চায়।

কনুইয়ে সামান্য স্পর্শ পেয়ে দেখি জিষ্ণু ঝুঁকে পড়ে আমার দিকে দেখছে, ওর হাতে আমার ফোন, কখন হাত থেকে নিয়ে নিয়েছে বুঝতেই পারিনি। বলল, "কী ব্যাপার বল

তো তোর! চোখদুটো ছলছল করছে, ফোনটা সকাল থেকে অফ করে রেখেছিস, কোনো কথাবার্তা বলছিস না, দুপুরেও কিছু খেলি না। কী হয়েছে তোর?"

আমি ওর দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসলাম। জিষ্ণু আর আমি আর্ট কলেজের সময়কার বন্ধু, যখন থেকে শিয়ালদা স্টেশনে বসে লাইভ পোরট্রেইট করতাম। পাশ করে একই অফিসে দুজন চাকরি পেয়েছি। তাই চাকরি খুব বেশিদিনের না হলেও জিষ্ণু আমার পুরোনো বন্ধু।

জিষ্ণু মনে হয় কিছুটা আন্দাজ করতে পারল। বলল, "ভাই তুই তোর বাবাকে বোঝা। ওইসব সংগঠন চালানো তোর কাজ নয়। এখানে বস তোর ওপর খুশি আছে, ঠিকমতো মুম্বাইয়ের অফিসের চোখে পড়ে যেতে পারলে বছর দুয়েকের মধ্যে তোর প্রোমোশন পাক্কা। আরে যার যেদিকে নেশা। জোরাজুরিতে হয় নাকি! এখন যদি তোর বাবাকে বলিস তোর মতো আঁকতে, পারবে?"

"সেটা তুই আমার বাবাকে গিয়ে বোঝা না! যদি সত্যিই বোঝাতে পারিস আরসালানের বিরিয়ানি খাওয়াব।" আমি বললাম।

কথায় কথায় হাওড়া এসে গেছে। আমি বাস থেকে নেমে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে মুখ মুছে অটো ধরার দিকে রওনা দিলাম।

জিষ্ণুও হাত নেড়ে ছুটল ট্রেন ধরতে।

ভাগ্য ভালো, অটোর লাইনে আজ তেমন ভিড় নেই। অন্যদিন সামনে ড্রাইভারের কনুইয়ের গুঁতো খেতে খেতে ঝুলতে ঝুলতে যাই, আজ ভেতরে ঢুকে বসলাম।

ব্যাগটা কাঁধ থেকে নামিয়ে কোলের ওপর রাখতেই পাশ থেকে মেয়েলি গলায় কে বলে উঠল, "আরে রূপদা! তুমি এখানে?"

তাকিয়ে দেখি সুরবীণা। টিকলির বান্ধবী। হেসে বললাম, "বিনি তুই! কেমন আছিস?"

"ভালো আছি রূপদা। তোমরা সবাই কেমন আছ?" সুরবীণা হেসে বলল।

টিকলির কলেজ জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বান্ধবী এই সুরবীণা। ডাক নাম বিনি। কলেজে পড়তে কতবার যে আমাদের বাড়িতে এসেছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। থাকে উত্তরপাড়ার দিকে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এদিকে কোথায় যাচ্ছিস?"

"একটু মেজোমাসির বাড়ি যাচ্ছি গো, সালকিয়ায়।" বিনি বলল।

আমার মনে পড়ে গেল, বিনির এক আত্মীয়র বাড়ি এদিকেই ছিল বটে। আমি বললাম, "তারপর? কী খবর? কী করছিস আজকাল? আসিসই তো না আর আমাদের বাড়ি!"

বিনি হাসল, "ওই সকাল বিকেল ক-টা বাচ্চাকে পড়াতে গিয়েই দিন কাবার হয়ে যায় গো, আর কোথাও বেরনো হয়না। আজ একটা কাজে যাচ্ছি মাসির বাড়ি, তাই!"

বিনির পাশে একটা মোটা লোক বসে রয়েছে। অটোওয়ালার অটো ছাড়ার আর নাম নেই। মোটা লোকটা অনেকক্ষণ ধরে উশখুশ করছিল, এবার আমাদের দুজনের খোশগল্পে বোধ হয় আরও অধৈর্য হয়ে খিঁচিয়ে উঠল, "কি ভাই, কখন ছাড়বে? পনেরো মিনিট হয়ে গেল বসে আছি।"

অটোচালক ছেলেটা সামনের সিটে বসেছিল, নির্বিকারভাবে উত্তর দিল, "সামনে তিনজন চাই। হলেই ছেড়ে দেব কাকা। চিল্লাবেন না। চিল্লিয়ে কোনো লাভ নেই।"

"কী? আমি চিল্লাচ্ছি?" লোকটা গরমে তেতেপুড়ে এমনিতেই ভিসুভিয়াস হয়ে ছিল, এবার গলগল করে লাভা বের করতে শুরু করল, "চিল্লানোর কী জানো হে তুমি ফচকে ছেলে! বলি চিল্লানো কাকে বলে তুমি দেখেছ? আমি কি তোমাকে আজেবাজে কিছু বলেছি? রুটে গাড়ি নামিয়েছ, কোনো টাইম বলে কিছু মানবে না?"

অটোর ছেলেটাও তেরিয়া ধরনের, সে বলল, "আরে কাকা আপনি আরও তিনজনের ভাড়া দিন না, এখুনি স্টার্ট করে দিচ্ছি। নাহলে ঘুমিয়ে যান, ময়দান এলে ডেকে দেব।"

"কেন?" লোকটা এবার নেমে সামনে গিয়ে ছেলেটাকে ধমকে উঠল, "আমি বেশি ভাড়া দেব কেন? এটা কী নিয়ম? তোমরা সবকিছু জোরজবরদস্তি করে নিয়ম চালু করবে তাই না?"

"আরে দূর মশাই, তাহলে ফালতু লাফরা করছেন কেন? চুপচাপ বসুন তো নাহলে ফুটুন এখান থেকে।" ছেলেটা এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল।

"ফুটুন মানে? ফুটুন কী ভাষা অ্যাঁ?" লোকটা রাগে বেগুনি হয়ে গেল, "জানিস আমি কে?"

ছেলেটা ঘাড় দুলিয়ে বলল, "না। জানতে চাইও না।"

আমি বিরক্ত হয়ে বিনিকে বললাম, "চল। একটা ট্যাক্সি ধরে চলে যাই। তোকে নামিয়ে দেব।"

বিনি সায় দিয়ে নেমে এল। অটোর ছেলেটা আর মোটা লোকটার ঝগড়া তখনও চলে যাচ্ছে। আমি এগিয়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকলাম।

গাড়ি চলতে শুরু করতে বিনি বলল, "রূপদা, তোমার সঙ্গে আজ দেখা হয়ে গিয়ে ভালোই হয়েছে। কয়েকদিন ধরেই ভাবছিলাম টিকলিকে ফোন করে তোমার নম্বরটা চাইব, একটা দরকার ছিল।"

"কী দরকার বল?" আমি বাইরেটা দেখছিলাম। আমাদের এই হাওড়া জেলাটা দিনকে দিন কেমন অচেনা হয়ে উঠছে, অবাঙালি লোকজন এত বেড়ে যাচ্ছে, ভুলে যাচ্ছি কোথায় বাস করছি। না, আমি এটা খারাপ বলছি না, বিশ্বায়ন সব শহরেই হচ্ছে, তবু খাস হাওড়ার বুকে হিন্দি সাইনবোর্ড দেখলে কেমন যেন অস্বস্তি হয়।

বিনি একটু গলাটা নামিয়ে বলল, "তুমি রাজতিলক বলে কাউকে চেনো?"

"রাজতিলক?" আমি ভ্রূ কুঁচকে ফেললাম, "রাজতিলক নামে তো কাউকে চিনি না বিনি।"

"কিন্তু রূপদা, তুমি যে সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছ, ও-ও ওই সালেই পাশ করেছে তোমাদের স্কুল থেকে। রাজতিলক চোঙদার।"

"চোঙদার? আমাদের স্কুলের ছেলে?" আমি আরও ভালো করে মনে করার চেষ্টা করলাম। মিনিট পাঁচেক বাদে প্রায় নিঃসন্দেহ হয়ে বললাম, "নারে। আমি শিওর। ওই নামে, সবচেয়ে বড় কথা, ওই সারনেমে কেউ নেই। আমার কোনো চোঙদার বন্ধু নেই। কোনোদিনও ছিল না।"

"তুমি তো ফেসবুকে নেই, না? খুঁজেছি তোমায়, পাইনি।"

"না রে, আমার ফেসবুক পাসবুক কিছুই নেই।" আমি হাসলাম।

বিনি এবার ওর ফোনে কিছু টেপাটেপি করতে শুরু করল। মিনিট খানেক পরে একটা ছেলের ছবি ঢাউস স্ক্রিনে ফুটে উঠতেই আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, "এই দ্যাখো। এই ছেলেটা। মাধ্যমিক পাশ করেছে অন্য স্কুল থেকে, কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক তোমাদের স্কুল, তোমার ব্যাচ। তারপর কলেজ বঙ্গবাসী কলেজ অফ কমার্স।"

"ওহ তাই বল!" আমি ভালো করে ছেলেটার ছবিটা এবার দেখলাম, "আমাদের স্কুলে শুধু দু-বছর পড়েছে, তাও কমার্সে। তাই চিনি না। আসলে ওই দু-বছর অনেকে বাইরের স্কুল থেকে আসত তো, সবাইকে চিনতাম না। তার ওপর আমার আর্টস ছিল।"

বিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, "তোমার তো নিশ্চয়ই কমার্সের বন্ধুবান্ধব আছে। কাউকে একবার জিজ্ঞেস করতে পারবে ওকে চেনে কিনা?"

"হ্যাঁ সে কেন পারব না। কমার্সে আমার অনেক বন্ধু আছে। কী ব্যাপার বল তো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বিয়ে টিয়ের ব্যাপার বুঝি?"

বিনি উত্তর না দিয়ে মাথা নীচু করে ফেলল।

আমি আরও কনফিউজড হয়ে গেলাম।

এমনিতেই মেয়েদের ভাবগতিক আমি খুব একটা বুঝি না। কখন কাঁদে, কখন হাসে, কখন কী বলতে চায়, সেই ব্যাপারে আমার ধারণা খুবই কম। কোনোদিন আমার তেমন মেয়েবন্ধু ছিলও না। আমি ভ্যাবলার মতো চেয়ে থেকে বললাম, "কী হয়েছে রে বিনি?"

বিনি এবার একটা কাণ্ড করল। আমাকে হতভম্ব করে দিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারের সামনেই ফোঁপাতে শুরু করল, "রূপদা! তুমি প্লিজ আমাকে একটু হেল্প করো। আ-আমার খুব বিপদ!"

কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল ওর শরীর।

বারো

অরূপ কাঞ্জিলাল কাপ থেকে কিছুটা করে চা প্লেটে ঢালছিলেন, তারপর সেই প্লেট থেকে ঠোঁটটা ছুঁচলো করে সুড়ুত সুড়ুত করে খাচ্ছিলেন।

ভদ্রলোকের বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ পঞ্চান্ন, মাথায় কাঁচা পাকা চুল, পরনে ধবধবে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি, কাঁধে একটা সাদা রুমাল ঘাড়ের ওপর ফেলে রাখা, সম্ভবত ঘাম আর ময়লা থেকে পাঞ্জাবিটাকে বাঁচাতে।

একেবারে শ্বেতস্বচ্ছ ভাবমূর্তি !

আমি লক্ষ্য করছিলাম ভদ্রলোক যখনই একটু করে চা খাচ্ছিলেন, পাল্লা দিয়ে তাঁর ভুড়িটাও ওঠানামা করে যোগ্য সংগত করছিল।

আমাকে অরূপ কাঞ্জিলালের ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ভদ্রলোকের পাশে বসে থাকা নন্দকাকা গলা ঝেড়ে বলল, "ইয়ে … দিও, স্যার আসলে তোর সঙ্গে একটা দরকারি কথা বলতে এসেছেন।"

আমার পাশেই খাটের একটা ছত্রী ধরে মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি না তাকিয়েই বুঝতে পারছি মায়ের মনে প্রবল আশঙ্কা আর ভয় গিজগিজ করছে।

মায়ের চিন্তা হওয়াটা খুব একটা অমূলক কিছু নয়। আমাদের মতো ছাপোষা নিম্নবিত্ত বাড়িতে ছুটির দিন সকালবেলা যদি বলা নেই কওয়া নেই, দুম করে এলাকার এম এল এ'র আবির্ভাব ঘটে, যে কেউই থমকে যাবে।

আমি যতই সাদা হাতিটাকে দেখছিলাম, ততই আমার মাথার ভেতরটা গরম হচ্ছিল। ফ্ল্যাশব্যাকে মনে পড়ে যাচ্ছিল সরস্বতী পুজোর দিনের সেই লাঞ্ছনা।

এর আস্কারাতেই, এর আদেশেই সেদিন ওই কাজ করেছিল ছেলেগুলো।

আসার পর থেকে আমি একবারও হাসিনি, শক্ত মুখে তাকিয়ে রয়েছি লোকটার দিকে।

নন্দকাকা আমাদের এই তেইশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। সে-ই রাস্তা চিনিয়ে বিধায়কবাবুকে নিয়ে এসেছে। সঙ্গে আরও দুজন পার্টির লোক রয়েছে। তারা জুলজুল করে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে।

অরূপ কাঞ্জিলাল ধীরেসুস্থে চা-টা শেষ করলেন, তারপর কাপ আর ডিশটা নামিয়ে রাখতে গেলেন মাটিতে, কিন্তু তার আগেই মা প্রায় ছুটে গিয়ে হাত থেকে সেগুলো নিয়ে নিল, "আমাকে দিন স্যার!"

অরূপ কাঞ্জিলাল পকেট থেকে সাদা একটা রুমাল বের করে মুখ আর গোঁফ মুছলেন, তারপর সোজা তাকালেন আমার দিকে, "কোন কলেজ থেকে পড়াশুনো করেছ তুমি?"

"লেডি ব্র্যাবোর্ন। সংস্কৃত অনার্স।"

"বাহ।" অরূপ কাঞ্জিলাল মন্তব্য করলেন, "কোন সালে পাশ করেছ?"

"দু-বছর আগে।" আমি সংক্ষেপে উত্তর দিলাম।

"এম এ পড়লে না কেন?"

"মা আর টানতে পারছিল না। এম এ'র ভালো খরচ ছিল। টিউশনি করতাম, একটা কোচিং সেন্টারেও পড়াতাম।" আমি নিঃস্পৃহ গলায় উত্তর দিচ্ছিলাম।

"দু-বছরের মধ্যেই সরকারি চাকরি পেয়ে গেলে? ভেরি গুড! কোথায় পোস্টিং?"

"হাওড়াতে। বাগনান এক নম্বর ব্লক।"

"বাঃ! কপালটাও ভালো।" অরূপ কাঞ্জিলাল মাথা দোলালেন, "বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে পারছ। এই যদি দুম করে মালদা কিংবা বীরভূম ঠেলে দিত, গ্রামগঞ্জে গিয়ে একা থাকতে হত। তাতে খরচও বাড়ত, ঝক্কিও। এখানে মা-মেয়ে কেমন একসঙ্গেই রয়েছ।"

আমি ঠোঁট কামড়ালাম, কিছু বললাম না। এর আসল উদ্দেশ্য কী এখনো বোঝা যাচ্ছে না।

সাতসকালে লোকটা নিশ্চয়ই আমার প্রশংসা করার জন্য ছুটে আসেনি।

"তা মা এতদিন খাটলেন, এবার মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, মা একটু বিশ্রাম করবেন, এটাই তো স্বাভাবিক। সব মা-ই তাই চান। কী মাসিমা তাই তো?"

মা আর অরূপ কাঞ্জিলাল সমবয়সি হবে, কিংবা মা হয়তো একটু ছোটই হবে, আকস্মিক 'মাসিমা' ডাকে মা থতমত খেয়ে লম্বা করে সায় দিল, "সেই তো! সেই তো স্যার, আ-আমি তো সবসময়েই তাই বলি ...!"

"তা চাকরি করে টাকা জমাও, বাড়ি সারাও, তারপর পাড়ার দাদারা, এই তো নন্দ, ভোলা এরা তো রয়েইছে, ভালো পাত্র দেখে বিয়ে থা দেবে, সুখে ঘরসংসার করবে, বুড়ো মা-কে দেখবে।" অরূপ কাঞ্জিলাল বলে যেতে লাগলেন, "হঠাৎ করে পুজোর ভূত চাপল কেন?"

এইবার পথে এসেছ চাঁদু! এতক্ষণের ধানাই পানাই শেষ করে লাইনে এসেছ। আমি মনে মনে বললাম।

মুখে নিরাসক্তভাবে বললাম, "পুজো করতে আমার ভালো লাগে। আমার সব মন্ত্র, রীতিনীতি জানা। বেদও পড়েছি। আমি পুজো করতে চাই।"

"আরে চাই বললেই তো হল না, সবকিছুর একটা নিয়ম আছে। সিস্টেম আছে। পুজো করবে ব্রাহ্মণ ছেলেরা, এটাই সমাজের রীতি, যুগে যুগে চলে আসছে, সবাই সেটাকে মেনে আসছে। তোমার ইচ্ছে হলেই তুমি সেটাকে অগ্রাহ্য করতে পারো না। মেয়েরা কখনো পুরোহিত হতে পারেনা হিন্দু শাস্ত্রে।" অরূপ কাঞ্জিলাল নিজের রুমালটাকে সরু করে কানে ঢুকিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে বিজ্ঞের মতো বললেন, "সরস্বতী পুজোর দিনেও তুমি এইরকম একটা কাণ্ড করেছিলে। সেদিনও লোক পাঠিয়ে আটকেছিলাম। তারপর আবার এতবড় কীর্তি। থেকে থেকে কি ভীমরতি হচ্ছে নাকি তোমার? মেয়েমানুষ হয়ে পুজো করার শখ কেন?"

"কিন্তু শুধু ঋগ্বেদেই ত্রিশ জনেরও বেশি মহিলা ঋষির নাম উল্লেখ করা আছে।" আমি বললাম, "অদিতি, গোধা, লোপামুদ্রা, ইন্দ্রাণী ...।"

"আরে তোমার এই জ্ঞান তুমি অন্য জায়গায় ঝেড়ো, আমার সামনে নয়। আদৌ সেগুলো সত্যি কিনা তার প্রমাণ কী?" অরূপ কাঞ্জিলাল মাঝপথে থামিয়ে দিলেন আমাকে, "আর তা ছাড়া তাঁরা ব্রাহ্মণকন্যা।"

"পুরোহিত যে কেউ হতে পারেন, এই ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্টের রায় আছে।" আমার রাগের পারদ ক্রমশ চড়ছিল।

আমি কি আদৌ একজন স্বাধীন দেশের নাগরিক?

"আরে দূর!" অরূপ কাঞ্জিলাল এবার ভদ্রতা ভুলে প্রায় খিঁচিয়ে উঠলেন, "তুমি তো বড়ো টেঁটিয়া মেয়ে দেখছি। আইনে অনেক কিছুই থাকে, সেগুলো বাস্তবে হয় না। পুজো আমরা, মানে ব্রাহ্মণরাই করে থাকি, আর সেটাই শুদ্ধ নিয়ম।"

"আপনি এভাবে কথা বলবেন না আমার সঙ্গে।" আমি কেটে কেটে বললাম।

নন্দকাকা ভয়ার্ত চোখে তাকাল আমার দিকে।

নন্দকাকা লোকটা খারাপ না, পাড়ায় থাকে, কারুর আপদে বিপদে পাশে দাঁড়ায়। বাবা মারা যাওয়ার পর আমাদের অনেক সাহায্য করেছিল।

তুলনায় এই অরূপ কাঞ্জিলাল লোকটার অনেক দুর্নাম শুনেছি। আগে নাকি কোনো নেতার পোষা গুন্ডা ছিল, পরে নিজেই হর্তাকর্তা হয়েছে। আর নিজের পোষা গুন্ডাগুলোকে দিয়ে এলাকা তটস্থ করে রেখেছে।

আমার কাঁধে মায়ের মুহুর্মুহু ইশারাস্বরূপ চিমটিকে আমি ভ্রূক্ষেপ করলাম না। বললাম, "খবরের কাগজ পড়েন? বাংলা নয়। ইংরেজি সর্বভারতীয় কাগজ?"

অরূপ কাঞ্জিলালের মুখটা কেমন ঝুলে গেল।

"যদি পড়েন, তাহলে পাঁচ ছ-মাস আগে নিশ্চয়ই পড়েছিলেন যে কেরালায় বিয়াল্লিশজন অব্রাহ্মণকে পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ করেছে সেখানকার সরকার? তাদের মধ্যে ছত্রিশজন অব্রাহ্মণ আর ছ-জন আবার দলিত। কেরালা সরকারের অধীনে একটা বোর্ড আছে। দেবোস্বম বোর্ড। তারাই গোটা রাজ্যের প্রায় তিন হাজার মন্দিরের পুরোহিত ঠিক করে। দেবোস্বম রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ, দুটো ধাপ পেরিয়ে তারা পুরোহিত হয়েছে। বংশপরম্পরায় ব্রাহ্মণ পদবি পেয়ে নয়।"

মা এবার পাশ থেকে গর্জে উঠল, "বড়ো বেশি কথা বলছিস তুই! চুপ কর এবার। স্যার, ওর কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না দয়া করে। এমনিতে আমার মেয়েটা ভালো, কিন্তু কে যে ওর মাথায় এই সব ...! "

রাগে আমার গলা উত্তরোত্তর চড়ছিল। তবু মার কথামত আমি ভল্যুম কমালাম, কিন্তু থামলাম না, "উত্তরপ্রদেশের গোরখনাথ মন্দিরের নাম শুনেছেন? ওখানে পুরোহিত হবার জন্য জাতপাত দেখা হয় না, জানেন কি? ওদের মতে হিন্দু ধর্মে শুধু চারটে জাত হয়। সৎ - শিক্ষিত, সৎ - অশিক্ষিত, অসৎ - অশিক্ষিত আর অসৎ কিন্তু শিক্ষিত। এইভাবে ওরা সমাজে উঁচু নীচু ঠিক করে।"

নন্দকাকা এবার আমার দিকে সরে এল। আমার মেজাজ কাকা ভালো করেই জানে, চোখের ইঙ্গিতে চুপ করতে বলল।

অরূপ কাঞ্জিলাল মাতব্বরি সুরে বললেন, "বটে? তার মানে একটা মেথরকেও এবার পুরুত ঠিক করতে হবে বলছ?"

আমি চিৎকার করে বললাম, "আপনারা পুরোহিত ঠিক করার কে? পুরোহিত হবে নিজের যোগ্যতায়। কোনো পার্টির দালাল ধরে নয়। কাশ্মীরে একটা মন্দির আছে,

মামালকা মন্দির। লীডার নদীর পাড়ে। নয়শো বছরের পুরোনো মন্দির। জানেন সেখানে পুজো করেন দুজন মুসলিম পুরোহিত?”

‘পার্টির দালাল’ কথাটা শুনে অরূপ কাঞ্জিলালের মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল, এবার একটা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন।

আমি থামিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরের ঘরে যাওয়ার আগে বললাম, ”যারা যোগ্য, যারা শুভ বুদ্ধির অধিকারী, তারাই ঈশ্বরের দূত হিসেবে কাজ করবে। পৈত্রিক অধিকারে বা ছেলে হয়ে জন্মানোর অধিকারে নয়। পার্টির গুন্ডা হওয়ার সুবাদেও নয়।”

আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে পেছন থেকে অরূপ কাঞ্জিলালের হিশহিশে গলা শুনতে পেলাম, ”আমাদের পার্টির ছেলে ঝন্টুকে তুমি হাওড়া স্টেশনে চড় মেরেছ তাই না? দলের ওপরমহল তোমার ওপর ভয়ংকর রেগে রয়েছে। তোমাকে আমি সাবধান করতে এসেছিলাম! ভেবেছিলাম বাচ্চা মেয়ে, এর পরিণাম কী হবে ধারণা নেই বলে উত্তেজনার বশে করে ফেলেছ। কিন্তু এখন দেখছি তোমার মতো ডেঁপো মেয়ের ভালো চাওয়াটা বোকামি। লাইসেন্স! হুঁ! কে উনি এলেন, পুরোহিতদের লাইসেন্স চালু করবেন! এর আগে অল্প ডোজ দিয়েছিলাম, শিক্ষা হয়নি দেখছি …!”

আমি উত্তর না দিয়ে ঘরে ঢুকে গেলাম। এখন বাড়িতে থাকলেই মায়ের অগ্নিবর্ষণ শুরু হবে। খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। রাগে মাথা বনবন করে ঘুরছে।

একটা রিকশা ডেকে উঠে বসলাম। যাব কোথায় জানিনা। আপাতত উত্তরপাড়া স্টেশন। তারপর সেখান থেকে ট্রেন ধরে হাওড়া। একটা ভালো উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা খুবই দরকার। একা একা মিডিয়ার সঙ্গে আর পারা যাচ্ছে না।

আমি রিকশায় উঠে ইন্টারনেটে খোঁজাখুঁজি করতে শুরু করলাম। সময়টা এত খারাপ যাচ্ছে, বলার নয়। একদিকে বিনির সঙ্গে এত ছোটবেলার বন্ধুত্বটা নষ্ট হয়ে গেল, অন্যদিকে ওই অ্যাসোসিয়েশনের লোকেদের হম্বিতম্বি, আজ আবার শুরু হল পার্টির হুমকি।

তেরো

অফিসে এসে সবে কাজে বসেছি, এমন সময় আবীরের ফোন এল।

আমি একহাতে ফোন, অন্য হাতে কফির কাপ হাতে বাইরের লবিতে চলে এলাম। ঘড়িতে সবে ন-টা দশ। এত তাড়াতাড়ি আমাদের বস তো দূর, কেউই অফিসে আসেনি। আমিও সাধারণত পৌনে দশটার আগে অফিস ঢুকিনা, কিন্তু এই সপ্তাহটা তাড়াতাড়ি চলে আসছি।

সেদিন ডিনার টেবিলে ঝামেলার পর থেকে বাড়িতে কারুর সঙ্গে বিশেষ কথা বলছি না। বাবার সঙ্গে তো দূর, মা, কাকিমা, টিকলির সঙ্গেও নয়।

রাতে দেরি করে ঢুকছি, সকাল হতেই কোনোমতে রেডি হয়ে বেরিয়ে আসছি। খাচ্ছিও না, মা দুবার সাধাসাধি করেছিল, এখন আর কিছু বলছে না। অফিসে ঢোকার আগে স্যান্ডউইচ বা কেক টেক খেয়ে নিচ্ছি।

মনটা এমনিতেই বিক্ষিপ্ত, ভার ভার। তাই কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখার চেষ্টা করছি প্রাণপণ। আমার বস দিব্যেন্দুদা নতুন একটা প্রোজেক্টের ভার দিয়েছে আমার উপর। মুম্বাইয়ের ক্লায়েন্ট, অনেকরকম বিজনেস আছে। দিব্যেন্দুদা সবটা বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিল, "তোর ওপর ভরসা করি বলেই পুরো গ্রাফিক্সের কাজটা তোকে দিচ্ছি। ক্লায়েন্ট একবার স্যাটিসফায়েড হয়ে গেলে আমরা ওদের আরো অনেক প্রোজেক্ট পাব।"

আমি ফোন রিসিভ করে বললাম, "বল। খোঁজ পেলি?"

আবীর বলল, "বিলক্ষণ! বাবা, এ তো একদম গঙ্গারামের মতো সুপাত্র!"

"কেন?"

"আরে ইলেভেন টুয়েলভেই ছেলের পাখনা গজিয়ে গিয়েছিল। উচ্চমাধ্যমিকের টেস্টে টুকতে গিয়ে ধরা পড়ে, তারপর হাতে পায়ে ধরে ফাইনাল পরীক্ষায় বসার অনুমতি পায়। তারপর মার্কামারা ছাত্র।"

"হু। সেটাই আশা করেছিলাম।" আমি চিন্তিত মুখে বলে ফোন রেখে দিলাম।

কফিটা শেষ করে ফোন করলাম বিনিকে। আবীর যা বলেছে, পুরোটা ওকে রিলে করে বললাম, "আমার মনে হয়, পুলিশের সাহায্য নেওয়া উচিত তোর। এমনিতেই বদ ছেলে, উচিত শিক্ষা দিতে কোনো সমস্যাই হবে না।"

ওপাশ থেকে বিনির ধরা ধরা গলা ভেসে এল, "না না রূপদা! খবরদার তুমি পুলিশে খবর দিও না যেন! আমার বাড়িতে জানাজানি হয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

আবীর আমার ছোটবেলার বন্ধু, মাধ্যমিক পাশ করার পরে ও কমার্স নিয়েছিল। তাই সেদিন ট্যাক্সিতে বিনির কথাগুলো শোনার পরে আবীরের কথাই মনে পড়েছিল।

বিনি মেয়েটাকে অনেকদিন ধরে দেখছি। একটু ভীতু, লাজুক কিন্তু স্বভাব ভালোই। সেদিন দুম করে ট্যাক্সির মধ্যে ওকে কাঁদতে দেখে আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। ট্যাক্সিওয়ালাও আড়ে আড়ে তাকাচ্ছিল পেছন দিকে। কী যে ভাবছিল কে জানে!

আমি যতটা সম্ভব শান্ত করার চেষ্টা করছিলাম, ট্যাক্সিওয়ালা দুমদাম কিছু ভেবে বসলে আমি কেস খেয়ে যাব।

যদি আমাকে মেয়েপাচারকারী ভেবে বসে? যদি ভাবে আমি বিনিকে ফুঁসলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি? তারপর জনতার হাতে গণধোলাই দিতে তুলে দেয়? বোনের বান্ধবীকে পৌঁছে দিতে ট্যাক্সিতে উঠে একি বিপদে পড়লাম রে বাবা!

আমি বিনিকে মিনতি করে বলেছিলাম, "ইয়ে বিনি, কী হয়েছে খুলে বল। এ-এইভাবে কান্নাকাটি করিস না, বুঝতেই পারছিস। লোকে আমাকে …!"

বিনি আমার কথায় একটু সামলে উঠেছিল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলেছিল, "বিশ্বাস করো রূপদা, আমি খারাপ মেয়ে নই! কলেজে ঢুকেই একদম প্রথমদিকে কী যে হয়েছিল! ওই বাজে ছেলেটার পাল্লায় পড়ে …!" কান্নায় ধেবড়ে যাচ্ছিল বিনির চোখের কাজল, "কিন্তু আমি খুব তাড়াতাড়ি সরে এসেছিলাম। রাজতিলক প্রথম প্রথম চেষ্টা করলেও পরে খুব একটা বিরক্ত করেনি। পরে ও কলেজও ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমার এই বিয়েটা ঠিক হওয়ার পরই …!"

আমি চিন্তিতমুখে বলেছিলাম, "কিন্তু, ব্ল্যাকমেল যে করছে, কিসের বেসিসে? কী আছে ওর কাছে?" একটু ইতস্তত করে বলেছিলাম, "কোনো ছবি টবি?"

বিনি লজ্জায় কুঁকড়ে গিয়েছিল, "আমাদের কলেজ লাইফে তো ক্যামেরা মোবাইল খুব একটা কারুর কাছে ছিল না। একবার ডায়মন্ডহারবার গিয়েছিলাম ওর সঙ্গে, কিন্তু সকালে গিয়েই রাতে ফিরে এসেছিলাম, কোথাও থাকিনি। তবু কীভাবে যে …!"

পরের আধঘণ্টা ধরে বিনি পুরো ব্যাপারটা খুলে বলেছিল।

রাজতিলক বলে ছেলেটা ছিল ওদের কলেজের সিনিয়র, কলেজে ঢোকার পর বিনি প্রথম এক-দেড় বছর জড়িয়ে পড়েছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু সেই সময়টুকুর মধ্যেও রাজতিলক সম্পর্কে গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ, কলেজের বন্ধুদের সাবধানবাণী, আর নিজেদের মধ্যে প্রায়শই ঝগড়ার জন্য বিনি সরে আসে। তারপর রাজতিলক কলেজ ছেড়ে দেয়।

কিন্তু গন্ডগোলটা শুরু হয়েছে মাসখানেক আগে। বিনির জন্য একটা সম্বন্ধ এসেছে। উলুবেড়িয়ার ছেলে, বেশ ভালো অবস্থা। বাড়িতে তেলের কল আছে, সঙ্গে গ্যাসের ডিলারশিপ, রেশনশপ সব মিলিয়ে আরও তিন-চাররকম ব্যবসা। পাত্র নিজে রাজনীতি করে, সমাজসেবাও করে। বিনিকে ওদের বেশ পছন্দ, বাড়ির সবাই এসে দেখে গেছে। বিনির বাবার শরীর ভালো নয়, তাই তিনিও দেরি করতে চাইছিলেন না। বিয়ের ডেট ঠিক হয়েছে দু-মাস পর।

কিন্তু তারপর থেকেই শুরু হয়েছে সমস্যা। সেই রাজতিলক চোঙদার, যার সাথে গত চারবছর বিনির কোনো যোগাযোগই নেই, সে ফোন করে হুমকি দিচ্ছে। রাজতিলকের কাছে নাকি কিছু অন্তরঙ্গ ছবি আছে, সেগুলো সে বিনির হবু বরকে পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু কীভাবে সেই ছবি উঠল, তা নিয়ে বিনি নিজেও ধোঁয়াশায়।

"হুমকি দিচ্ছে কিসের জন্য? মানে ওই রাজতিলক কী চাইছে?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম।

"সেটা এখনো বুঝতে পারছি না রূপদা!" বিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিল, "বাবা আমার বিয়ের জন্য পাগল হয়ে উঠেছেন। বাবার শরীরও ভালো নয়। আমার বিয়ে হয়ে

গেলে বোনেরটাও দিয়ে দায়মুক্ত হতে চাইছেন। সুপ্রতিম নিজে পার্টি করে, ওদের বাড়ি থেকে কিছু দাবিদাওয়াও নেই, সেইজন্য ...!"

নিজের ডেস্কে বসে সেদিনের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কোথায় চলে গিয়েছিলাম। হুঁশ ফিরল জিষ্ণুর ডাকে, "কী ব্যাপার, তুই কি আজকাল অফিসেই রাত কাটাচ্ছিস নাকি?"

"না না, বল।" আমি বর্তমানে ফিরে এলাম, "এই একটু আগে এসেছি।"

"খেয়েছিস না উপোস করে আছিস?" জিষ্ণু ব্যাগ রাখতে রাখতে বলল।

"খেয়েছি।" আমি হাসলাম।

"সত্যি বস, প্রেমিকার জন্য দেবদাস হতে অনেককে দেখেছি, কিন্তু তোর মতো বাপের ওপর রাগ করে দেবদাস একটাও দেখিনি।" কাঁধ ঝাঁকাল জিষ্ণু।

আমি কথা ঘোরানোর জন্য বললাম, "এই নে। বিস্কুট খা।"

"আমি ভাত খেয়ে এসেছি, তুই খা। তোকে যেটা বলতে এলাম, বুধ বৃহস্পতি শুক্র, এই তিন দিন ছুটি নিয়ে নিবি। শনি রবি মিলিয়ে পাঁচদিন হয়ে যাচ্ছে। দিব্যেন্দুদাকে বলে রেখেছি। তোর ক্লায়েন্টকে সুমনা এই ক-দিন সামলে নেবে।"

"মানে?" আমি ভ্রু কুঁচকে তাকালাম, "তিনদিন ছুটি নিয়ে কী করব! পুজোর আর বেশি দেরি নেই। "

"কেন তুমি ক-টা পুজোর ঠেকনা নিয়ে রেখেছ মামা?" জিষ্ণু এবার গলা চড়াল।

চটে গেলেই ওর মুখে আমি 'মামা' ডাক শুনতে পাই।

"পুজোর প্রশ্ন নয়।" আমি কথা গোছাচ্ছিলাম, "তিনদিন কী করব সেটা তো বল?"

"সান্দাকফু যাব।" জিষ্ণু সংক্ষেপে বলল।

"কোথায়?" আমি হকচকিয়ে গেলাম।

"সান্দাকফু সান্দাকফু। ভূগোলে পড়িসনি পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সান্দাকফু?" জিষ্ণু বলল।

"ও বাবা! সে—সে তো এভারেস্টে—ইয়ে মানে—হিমালয়ে! ওখানে কী করে যাব?" আমি হকচকিয়ে গেলাম।

ছোট থেকে রক্ষণশীল একান্নবর্তী পরিবারের সন্তান হওয়ায় বাইরে ঘুরতে যাওয়া খুব একটা হয়নি আমার। খুব ছোটবেলায় একবার সবাই মিলে গিয়েছিলাম পুরী, আবছা মনে আছে। তারপর বছরকয়েক আগে একবার শান্তিনিকেতন, পৌষমেলায়। ব্যস!

জিষ্ণুর কথায় আমার মনে হল, সত্যিই, এত বড় হয়ে গেলাম, এখনো পাহাড় দেখলাম না!

"যেভাবে সবাই যায়। এখান থেকে ট্রেনে চড়ে নিউ জলপাইগুড়ি, ওখান থেকে জিপে মানেভঞ্জন। তারপর সেখান থেকে হেঁটে।" জিষ্ণু এবার সোজা আমার সামনে এসে দাঁড়াল, "দ্যাখ রূপ, আমি কিন্তু তোর টিকিট কেটে ফেলেছি। সবাই বারণ করছিল কাটতে। বলছিল তুই যাবি না, ঠিক বাগড়া দিবি। আমি কিন্তু বড় মুখ করে কেটেছি। এবার তুই যদি ঝোলাস, সত্যি বলছি মাইরি, পিটিয়ে কিন্তু তোর গালের চামড়া হাতে দিয়ে দেব।"

”সে হাতে দিয়ে দিবি কি আবার সেলাই করে গালেই লাগাবি তুই বুঝবি।” আমি কম্পিউটার স্ক্রিনের দিকে চোখ ফেরালাম, কথায় কথায় কিছু কাজই শুরু করা হল না সকাল থেকে।

বললাম, ”আমি যেতে পারব না।”

”মানে?” জিষ্ণু স্পষ্টতই বিরক্ত, ”কেন?”

আমি সত্যিটা বলতে গিয়ে চেপে গেলাম। পঁচিশ বছরের একটা দামড়া ছেলে হয়ে যদি বলি বাবা ছাড়বে না, বলা যায় না জিষ্ণু হয়তো এখানেই পেটাতে শুরু করবে আমায়।

মুখে বললাম, ”বাড়িতে এখন এমনিই অনেক কিছু নিয়ে ঝামেলা চলছে। অ্যাসোসিয়েশনের মিটিং লেগেই আছে। পুজোও এসে গেল বলে। এইসময় আমি পাঁচদিন বাইরে থাকলে সব কিছু বিগড়ে যাবে।”

”মামদোবাজির একটা লিমিট আছে রূপ!” জিষ্ণু খিঁচিয়ে উঠল, ”তোদের ওই টিকিওলা ক্লাব তুই না থাকলে নাকি বিগড়ে যাবে! হু! ফালতু ধানাইপানাই পোষায় না জানিস তো! তুই যাবি ব্যস! চারদিন থাকব, সোমবার ভোরে এসে অফিস জয়েন করব।” কথাক'টা বলেই জিষ্ণু বেরিয়ে গেল আমার কিউবিকল থেকে।

আমি করুণমুখে বসে রইলাম। মনটা এমনিতেই মেঘলা হয়ে ছিল, এখন রীতিমতো কালো মেঘে ভরে উঠতে লাগল।

এই যে জিষ্ণু, আবীর, রাঘব, এদের মতো সাধারণ জীবন আমার নয় কেন? সারাক্ষণ খালি নজরদারি, এটা করবে না, ওটা করা ভটচায বাড়ির ছেলের মানায় না। এত নিয়মের বেড়াজাল কেন?

আর্ট কলেজের ফাইনাল ইয়ারের শেষে সব বন্ধুরা মিলে একবার চাঁদিপুর যাওয়ার প্ল্যান হয়েছিল। বাবা কিছুতেই যেতে দিলেন না। কতদিন আগের কথা, তবু মনে পড়লেই চোয়াল শক্ত হয়ে আসে আমার!

বাবা শুনে বলেছিলেন, ”ওইসব চ্যাংড়া ছেলেদের সঙ্গে তুমি ঘুরতে যাবে? বলতে মুখে বাধছে না? গিয়ে সন্ধ্যাহ্নিক করবে কীভাবে? সমুদ্রের ওই নোংরা জলে?”

আমি চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের বন্ধুরা সবাই ভদ্রবাড়ির ছেলে, চ্যাংড়া বা অসভ্য ধরনের কেউই নয়। কিন্তু সেকথা বাবাকে কে বোঝাবে? আন্দুলের ভট্টাচার্য বাড়ির রক্ষণশীলতা তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে গেঁথে রয়েছে যে সহজভাবে হাসতে, আনন্দ করতে তিনি ভুলে গেছেন।

আর পরিবারের অন্যদেরও সেটা ভুলিয়ে দিতে চাইছেন।

এমন হাস্যকর কথা কবে কে শুনেছে যে সন্ধ্যাহ্নিক করতে হলে বাইরে কোথাও ঘুরতে যাওয়া যাবে না?

অন্য কোনো ছেলে হলে হয়তো শুনতই না, তর্ক করত, ঠিক চলে যেত। কিন্তু কী করব, আমি যে ওরকম নই। আর সেই সুযোগটাই সবাই নেয়। কথায় বলে না, নরম মাটিতে আঁচড় কাটা সহজ! আর আমার এই নরম স্বভাবকেই সবাই, দুর্বলতা ভেবে নেয়।

সারাটাদিন কী যে হল, কাজে মন বসাতে পারলাম না।

এক একদিন এমন হয়। কিছুই করতে ইচ্ছে করেনা, খালি মনে হয় চুপ করে বসে আকাশ পাতাল ভাবি।

জিষ্ণুও তারপর থেকে আমাকে বিশেষ ঘাঁটায়নি, ও বোধ হয় ধরেই নিয়েছে আমি যাব।

দুপুর তিনটে সাড়ে তিনটের দিকে আর ভালো লাগল না, বসকে গিয়ে বললাম, "দিব্যেন্দুদা, আমি আজ বেরিয়ে যাচ্ছি একটু।"

দিব্যেন্দুদা ঘাড় গুঁজে কিছু টাইপ করছিল, মাথা তুলে বলল, "এখন? শরীর টরীর খারাপ নাকি?"

"হ্যাঁ, ওই আর কী। ভালো লাগছে না খুব একটা।" আমি মাটির দিকে তাকিয়ে বললাম। মানুষকে কোনো অনুরোধ বা মিনতি করার সময় তো দূর, আমি কিছুতেই তার চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারি না।

এইতো, আজ বাসে পাশের এক ভদ্রলোক অন্যায়ভাবে আমার পায়ের ওপর তাঁর ঢাউস ব্যাগটা বেমালুম রেখে পুরো রাস্তাটা চলে এলেন, আমি একবার বললাম, "দাদা ব্যাগটা লাগছে পায়ে।"

ভদ্রলোক এমনভাবে আমার দিকে তাকালেন, আমি তারপর আর কিছু বলতে পারলাম না। অথচ বাস বেশ ফাঁকা ছিল, উনি চাইলেই অন্য দিকে ব্যাগটা রাখতে পারতেন।

দিব্যেন্দুদা কী বুঝল কে জানে, বেশি ঘাঁটাল না, বলল, "ওকে। চলে যা তাহলে। আমাকে আজকের আপডেটটা মেল করে দিয়ে যা, আমি ক্লায়েন্টের সঙ্গে কথা বলে নেব।"

আমি সায় দিয়ে বেরিয়ে এলাম। অফিস থেকে বেরিয়ে এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতেও ইচ্ছে করল না, কোথায় যাব ভাবতে ভাবতে চলে এলাম কলেজ স্ট্রিটে।

বহুদিন বইপাড়ায় আসা হয়না। আগে কলেজ জীবনে ফাঁক পেলেই চলে আসতাম, প্রেসিডেন্সির দু-পাশের পুরোনো বইয়ের দোকানগুলোর পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াতাম।

আজকেও তেমনই ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ পার্বণীকে দেখতে পেলাম।

যেদিন এমনিই মন ভারী হয়ে থাকে, সেদিন কি আরও বেশি করে মনকেমন করার কারণগুলো সামনে চলে আসতে থাকে?

ঘন নীল রঙের জিন্স আর একটা লম্বা গোলাপী কুর্তি পরে কফিহাউজের সামনের মোড়ে রাস্তা ক্রস করার চেষ্টা করছে পার্বণী। হাতে বেশ মোটাসোটা একটা প্যাকেট, চুলগুলো ছড়ানো রয়েছে সামনের দিকে।

পাশে একটা ছেলে।

দেখেই আমার হৃদপিণ্ডটা ধক করে উঠল। আমি আলোর চেয়েও দ্রুত বেগে মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম উলটোদিকে।

পার্বণী কলকাতায়?

মানুষের স্বভাব হল যা কিছু নিষিদ্ধ, যা কিছু এড়িয়ে যাওয়ার মতো, সেদিকেই বার বার মন চলে যায়, আর মনকে তাড়া করে চোখের দৃষ্টিও। তাই মুখ ঘুরিয়ে নিলেও আমি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আবার তাকালাম ওদিকে।

পার্বণী এখনো রাস্তা পার হতে পারেনি।

ওদিক থেকে একটা ট্রাম ঢং ঢং করে ছুটে আসছে, এদিক থেকে একটা হলুদ ট্যাক্সি, মাঝখানে আবার একটা হাতে টানা রিকশা ঢুকে পড়েছে। পার্বণী শক্ত করে ধরল পাশের ছেলেটার হাত।

ছেলেটার চাপ দাড়ি, চোখে রিমলেস।

পার্বণী এবার রাস্তা পেরোচ্ছে, দুদিকে তাকিয়ে ছেলেটার হাত ধরে পরম নির্ভরতায় এদিকে আসছে।

এসেই কী একটা কথা বলে হেসে গড়িয়ে পড়ছে ছেলেটার কাঁধে, ছেলেটাও হেসে ওর মাথার চুলগুলো ঘেঁটে দিচ্ছে।

আমার দুম করে মনে পড়ে গেল সাড়ে পাঁচ বছর আগের পার্বণীর ছলছলে চোখে বলা কথাগুলো, "আমি ভাবতেও পারিনি রূপ, তুই ... তোরা এইরকম! আমার বাবা এতটা অপমানিত কোনোদিনও হননি!"

মনে পড়ে গেল সেদিনের সেই সন্ধের কথা, যখন পার্বণী আমাকে ফোন করে বলেছিল কীভাবে আমার বাবা ওর বাবার অফিসে গিয়ে অপমান করে এসেছিলেন, অব্রাহ্মণ হয়ে আমার মতো সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেকে ভালোবেসেছে বলে। অথচ সত্যি বলতে কী, ভালোবাসা তো দূর, আমাদের সম্পর্কটা তখনও ঠিকমতো শুরুই হয়নি।

আসলে পার্বণীর সঙ্গে প্রেমটা ঠিকমতো শুরু হওয়ার আগেই সেটাকে ভ্রূণ দশাতে নির্মমভাবে শেষ করে দিয়েছিলেন বাবা।

আমাদের আর্ট কলেজে ফাইনাল ইয়ারে একটা ওয়ার্কশপ করতে হত, সেখানেই তিনমাসের জন্য অন্য কলেজ থেকে এসেছিল পার্বণী। পার্বণী মাইতি। খুব শান্ত, ধীরস্থির মেয়ে। ওয়ার্কশপের প্রায় শেষের দিকে কোনো একটা ক্লাসে আলাপ হয়েছিল।

দুজন মুখচোরার বন্ধুত্ব হলে বেশ ভালোই এগোয়। আমাদেরও এগিয়েছিল। কিন্তু ঠিক যে সময়টায় দুজনেই মনের কথা বলব বলব করছি, কিন্তু কেউই কিছু বলে উঠতে পারছি না, ঠিক সেই সময়েই একদিন ওয়ার্কশপ সেরে বাড়ি ফেরার পথে আমাদের দেখতে পেয়েছিলেন জগদীশকাকা।

আমি মনটাকে অন্যদিকে ফেরালাম। চোখ সরু করে দেখলাম পার্বণী ছেলেটার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিকোণের বাইরে।

মনে আছে, শেষদিন ও সবুজ রঙের একটা সালোয়ার কামিজ পরেছিল, সঙ্গে কাঁচা হলুদ রঙের ওড়না। আমার দিকে অপরিসীম ঘৃণা আর করুণা নিয়ে বলেছিল, "যারা কিছু না বুঝেই নিজেদের ঠুনকো বংশমর্যাদার দোহাই দিয়ে অন্যদের অপদস্থ করতে পারে, তাদের আমি মানুষ বলে মনে করি না।" একটু থেমে বলেছিল, "আর যারা এই অন্যায়গুলো মেনে নেয়, তারা হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো কাপুরুষ। জীবনে নিজের মেরুদণ্ডে সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতাই তাদের নেই। রূপ, তুই একটা কাপুরুষ!"

সেদিন ওর বিদ্বেষভরা শব্দগুলোর স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নড়ছিল ওর কানের সবুজ রঙের ঝুমকো দুলটা।

কতক্ষণ একভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানিনা, চটকা ভাঙল পেছনের গুমটির দোকানদারের কথায়, "ও ভাই, দোকানের সামনেটা ছাড়ো, একটু সরে দাঁড়াও!"

আমি চমকে পেছন ফিরলাম। দূরে তাকিয়ে দেখলাম পার্বণী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দোকানদার জুলজুল করে দেখল আমায়, ”মেডিকেল, আই আইটির কোর্স মেটেরিয়াল আছে, মাত্র দু-বছর আগের। লাগবে নাকি?”

আমি মাথা নেড়ে সরে এলাম।

মাথায় হঠাৎ করে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। পার্বণী ঠিকই বলেছিল, আমি একটা কাপুরুষ। আমার মেরুদণ্ড নেই। হয়তো বাবা-ই আমার মেরুদণ্ডটা ছোটো থেকে সোজা হতে দেননি।

সেদিনের ওই দিওতিমা বলে মেয়েটাও ঠিকই বলেছিল, আমি একটা ক্যাবলা।

কোনোমতে একটা বাসে উঠলাম। ভাগ্য ভালো, বসার সিটও পেয়ে গেলাম।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বইপাড়ায় এসেছিলাম, পাকেচক্রে সেই ভার চতুর্গুণ হয়ে গেল।

জানলার ধারের সিটে বসে পাশ থেকে পেছন দিকে চলে যাওয়া দোকানগুলো দেখছিলাম। পড়ন্ত বিকেলের নরম রোদ এসে পড়ছিল গালে।

স্মৃতি যেন ক্রমশ রক্তাক্ত করে দিচ্ছে বুকের ভেতরটা আমার। কর্কশ হাতে ছেঁচে রগড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে নরম অনুভূতিগুলো।

চোখ বন্ধ করে সেই নির্মম ওম অনুভব করতে করতে আমি ঠিক করে ফেললাম, সান্দাকফু আমি যাবই।

মেরুদণ্ড সোজা করার সুযোগ বারবার আসেনা।

বাবা যতই আপত্তি করুন। জিষ্ণু, রাঘব এদের কাছেও আমার সময় এসেছে নিজেকে প্রমাণ করার। বাড়িতে যা ঝড় বয়ে যায় যাক, তবু আমি কিছুতেই এই ট্যুরটা ক্যানসেল করব না। কিছুতেই না।

চোদ্দো

হাওড়া স্টেশনে নেমে আজ আর সাবওয়ের দিকে ছুটলাম না, বাঃ, আবার বাস ধরার জন্য স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ালাম।

শরীর আর চলছে না। আজ অফিসে খুব খাটনি গেছে। সরকারের দুটো নতুন প্রকল্পের নোটিশ ইতিমধ্যেই এসে গেছে, সেগুলোর অফিস অর্ডার বের করে প্রতিটা স্কুলে পৌঁছে দেওয়া, হেডমাস্টারদের সঙ্গে ফোনে মিটিং করা, স্থানীয় আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলা। আজ ঠিকমতো খাওয়ার সময়ও পাইনি।

ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে শরীর। তবু কিছু করার নেই। ছবিদাদুর পরিচিত এক উকিল থাকেন পোস্তায়, সেখানে আজ দেখা করতে যেতে হবে।

সেদিন রাগের মাথায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করে বুঝেছিলাম বড় বড় উকিল ধরার ক্ষমতা আমার নেই। আর শুধু বড়ই বা বলি কেন, বড়, মেজো, ছোট, কোনোরকম উকিল ধরার সাধ্যই আমার নেই। তখন একটা ঝোঁকের মাথায় ছিলাম, ইন্টারনেট খুঁজে প্রথমে নামকরা উকিলদের ফোন করেছিলাম খুব উৎসাহ নিয়ে। কিন্তু তাঁদের প্রাথমিক কনসাল্টেশন ফি শুনেই আমার মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড় হয়েছিল। তারপরে কী করব বুঝতে না পেরে ফেরত এসেছিলাম আমার অগতির গতি ছবিজেঠুর বাড়িতে।

জেঠু শুনে মাথা নেড়েছিলেন, "ধুর! ওইসব তাবড় তাবড় উকিলের কাছে গিয়ে সর্বস্বান্ত হবি নাকি? আর তা ছাড়া এখানে উকিল আসছেই বা কোথা থেকে? তুই তো অলরেডি জনস্বার্থ মামলা করেছিস!"

"সেটা তো অন্য কারণে।" আমি রেগেমেগে বলেছিলাম, "ওটা পুজোর ব্যাপারে, লাইসেন্সের দাবিতে। কিন্তু আমাকে যে রাস্তাঘাটে থ্রেট করছে, হুমকি দিচ্ছে, গায়ে হাত দিচ্ছে, এসব দেখে শুনেও আমি চুপ করে থাকব?"

"কেন চুপ করে থাকবি?" ছবিজেঠু বলেছিলেন, "তোকে কি বলেছি চুপ করে থাকতে?"

"তো কি করব তাহলে?" আমি অধৈর্য হয়ে যাচ্ছিলাম, অরূপ কাঞ্জিলালের লাল ফুলকপির মতো মুখটা বারবার মনে পড়ছিল।

এই সব পার্টির গুন্ডাদের এত সাহস কি শুধু আমাদের দেশেই হয়?

ছবিদাদু বললেন, "তুই থানায় যাবি। থানায় গিয়ে নিজের প্রোটেকশন চাইবি। এর মধ্যে উকিল-মোক্তার আসছে কোত্থেকে!"

আমি যেন হালে পানে পেয়েছিলাম।

ছবিদাদু কথাটা ঠিকই বলেছেন। থানায় গিয়েই কাজ হবে, উকিলের তো এই ব্যাপারে কিছু করার নেই।

"ঠিক আছে। আমি তবে থানায় চললাম।" আমি সোৎসাহে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, "এসে জানাব কী হল।"

"দাঁড়া।" ছবিজেঠুর একটা গম্ভীর গলা আছে, যেটা খুব কম শুনতে পাই। সেই কণ্ঠস্বর পেয়ে আমি পেছন ফিরে তাকিয়েছিলাম।

"তোর এই সব ব্যাপারে তড়বড়ানির রোগটা যতদিন না ছাড়তে পারছিস, জীবনে সফল হওয়া কিন্তু খুব মুশকিল।" ছবিদাদু গম্ভীরভাবে বললেন, "তোকে আগেও বহুবার বলেছি। মাথা ঠান্ডা কর। এখন তুই রেগে আছিস। রাগের মাথায় কোনো সিদ্ধান্ত নিবি না। আর খুব খুশি মনে কাউকে কোনো প্রতিশ্রুতি দিবি না।"

আমি বললাম, "তুমি বুঝতে পারছ না। সেদিন হাওড়া স্টেশনে ওই পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশনের গুন্ডাটা আমার গায়ে হাত দিল, আমি এক চড় কষিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আজ এই এম এল এ বলল, আমি নাকি ওদের ঝন্টুকে চড় মেরেছি। তার মানে কি গুন্ডাটা ওই পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশনের লোক নয়, পার্টির লোক?"

ছবিদাদু উঠে দাড়িয়েছিলেন, "আমি তোর সঙ্গে থানায় যাব চল। তুই বেশি কথা বলবি না। যা বলার আমি বলব।"

কিন্তু সেদিন ছবিদাদু থানায় গিয়ে ভালোভাবে সব বুঝিয়ে বলেও কোনো লাভ হয়নি। থানায় গিয়ে প্রথমে তো পাত্তাই দিচ্ছিল না, তারপর অরূপ কাঞ্জিলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনে বলা হল, ওসি সায়েব তো নেই, উনি এলে কথা বলবেন, এখন বসুন।

প্রায় আড়াই ঘণ্টা বসে থাকার পর ওসি এলেন। সব শুনেটুনে পাত্তাই দিলেন না, "আরে এতে এত চাপ নেওয়ার কি আছে? আজকালকার ছেলেমেয়েরা কোনোকিছু সিরিয়াসলি নিতে পারেনা, সত্যি!" ওসি বিরক্তমুখে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, "আরে বাপের বয়সি একটা লোক এসে আপনার ভালর জন্য বকাবকি করছে, উপদেশ দিয়েছে, এতেও আপনার সমস্যা?"

আমি কাটাকাটা গলায় বলেছিলাম, "ভালোর জন্য হাওড়া স্টেশনে গায়ে হুমকি দিচ্ছে?"

"আহা, সে তো অন্য লোক! আর আপনিই তো উলটে তাকে চড় মেরেছেন, তিনি তো কিছু করেননি!" ওসি মাছি তাড়ানোর মতো করে হাতটা নাড়ালেন, "তবু আমরা ব্যাপারটা দেখছি।"

আসলে কিছুই দেখলেন না। ছবিদাদুও অনেকবার অনেকভাবে বোঝালেন, কিন্তু ওসি গুরুত্বই দিলেন না ব্যাপারটায়।

এখন এই ব্যস্ত বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে গরমে সেদ্ধ হতে হতে মনে হল, ধুর! এইসব না শুরু করলেই ভালো হত। আমরা একটা সিস্টেমের জাঁতাকলে আটকে গেছি। দুর্নীতি, শোষণ আর তোষণের সিস্টেম। এই সিস্টেমের বাইরে কিছু করতে গেলেই সবাই নখ দাঁত বের করে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে, পিষে মারতে চাইবে অন্ধকার বাস্তুতন্ত্রের বাইরে শ্বাস নিতে চাওয়া মানুষটাকে।

মনটা আসলে দিনদিন খুব খারাপ হয়ে পড়ছে। নিজের অবচেতনেই আস্তে আস্তে যেন অবসাদের গহ্বরে ঢুকে পড়ছি। পুজো করতে চেয়েছিলাম মনের একটা খুশিতে, চিরাচরিত ধারণাগুলোকে ভেঙে ব্যতিক্রমী কিছু একটা করতে পারার উৎসাহে, লাইসেন্সের মতো একটা যোগ্যতার মাপকাঠি চেয়েছিলাম সাধারণ মানুষের মনে পুরোহিত সম্পর্কে শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনার জন্য।

কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ক্রমশই সেটা দুর্বল হয়ে পড়ছে।

একটা এসি বাস আসছিল, তাতেই উঠে পড়লাম। সাধারণত আমি এসি বাসে উঠি না। কিছুসময়ের আরামের জন্য চারগুণ কী পাঁচগুণ খরচ করার মতো বিলাসিতা আমার সাজে না। মায়ের বুকের যন্ত্রণাটা দিনদিন বেড়ে যাচ্ছে, পুজোর পর একবার ভেলোর নিয়ে যেতেই হবে। কিন্তু আজ এত অন্যমনস্ক ছিলাম যে ওঠার আগে খেয়ালই করিনি, যখন ঠান্ডা হাওয়া অনুভব করলাম, তখন বাস চলতে শুরু করেছে।

বাসে বেশ ভিড়। কনডাক্টর ইশারায় বলল, ”দিদি একদম পেছনে চলে যান। সিট ফাঁকা আছে।”

বড় বড় হাতল ধরে করিডর দিয়ে কিছুটা হেঁটে গিয়ে একদম পেছনের সিটে বসতেই পাশ থেকে কে বলে উঠল, ”ভালো আছেন?”

আমি কণ্ঠস্বরটা শুনেই চমকে গেলাম।

তাকিয়ে দেখি, ঠিক ধরেছি, মঙ্গলরূপ বলে ছেলেটা।

ঈশ! কী অস্বস্তিকর ব্যাপার! আমি মুহূর্তে গুটিয়ে গেলাম।

এই বাসেই ওকে থাকতে হল?

সেদিন ঝন্টুর ওইরকম অসভ্যতার পর মাথার ঠিক ছিল না, ফোন করে যাচ্ছেতাই বলেছিলাম মঙ্গলরূপকে। মঙ্গলরূপ কোনো উত্তর দেয়নি, প্রথমে দু-একবার মৃদু আপত্তি করছিল, শেষের দিকে চুপ করে গিয়েছিল।

পরে মাথা ঠান্ডা হতে খুব খারাপ লাগছিল। নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছিল।

ছবিদাদু ঠিকই বলেন, দুমদাম করে কোনো হঠকারী কাজ করতে নেই।

মাঝে ভেবেছিলাম একদিন ফোনও করব, কিন্তু এতকিছুর ডামাডোলে ভুলে গেছি।

আমি অপ্রস্তুতভাবে হেসে বললাম, ”আরে আপনি! হ্যাঁ, ভালো আছি। আপনি কেমন আছেন?”

মঙ্গলরূপ হাসল, ”ভালো।”

পেছনের সিটে বসলে ঝাঁকুনি বড়ো বেশি হয়। হাওড়া ব্রিজে ওঠার আগেই ক'টা বড়োসড়ো ঝাঁকুনিতে আমি প্রায় ঢলে পড়লাম ওর গায়ে।

তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, ”ইয়ে, দেখুন, সেদিন আপনাকে ফোনে অনেক কিছু আজেবাজে বলে ফেলেছিলাম। আসলে তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না। পরে ভেবেছিলাম আপনাকে ফোনও করব, আপনি প্লিজ কিছু মনে করবেন না। আমি খুব লজ্জিত।”

মঙ্গলরূপ হাসল।

এত কাছ থেকে ওকে আগে দেখিনি। আজ লক্ষ্য করলাম, ছেলেটার চোখগুলো খুব বড় বড়, চোখের পাতাগুলো এত ঘন যে মনে হয় সরু কোনো কাজল পরেছে হয়তো।

আমি আবার বললাম, ”আপনি প্লিজ কিছু মনে করবেন না।”

মঙ্গলরূপ বলল, ”আমি কিছু মনে করিনি ম্যাডাম। আপনার ওপর দিয়ে কী ঝড় যাচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারছি।” কনডাক্টর আসতেই পকেট থেকে নোট বাড়িয়ে ধরল ও, ”তিনটে।”

"এমা না না!" আমি বাধা দিয়ে উঠলাম, "আপনি কাটছেন কেন? আপনার কাছে খুচরো আছে।"

মঙ্গলরূপ স্মিত হাসল, "খুচরো আপনার কাছেই রেখে দিন, পরে দরকার পড়বে। আমার সঙ্গে এমনিতেই একজন আছে, সামনের লেডিজ সিটে বসেছে, আমি একবারে কেটে নিচ্ছি।"

আমি হাসলাম। হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে ছুটছে বাস। নিস্তরঙ্গ গঙ্গার ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে বিশাল বিশাল ভেসেল, স্টিমার। দূরের অফিসপাড়ার উঁচু উঁচু বাড়িগুলোতে একে একে জ্বলে উঠছে আলো। অনেকটা দূরে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় হুগলি সেতু।

এসির ঠান্ডা হাওয়ায় শরীরের ঘামটা আস্তে আস্তে জুড়িয়ে যাচ্ছিল, আরামে বন্ধ হয়ে আসছিল চোখের পাতা।

আমি বললাম, "আপনি কী করেন? মানে চাকরি না অন্য কিছু?"

মঙ্গলরূপ হেসে বলল, "আপনি আগের দিন যাকে কমল মিত্র বললেন, সেই বসন্ত ভট্টাচার্য, মানে আমার বাবার তো হার্ডওয়্যারের ব্যবসা, আমাদের দোকান আছে হাওড়া ময়দানে। কিন্তু আমি ব্যবসাট্যাবসা কিছু দেখি না।"

"তাহলে? চাকরি করেন?" আমি প্রশ্ন করলাম, "কোথায়?"

মঙ্গলরূপ এবার হাসল, "আমি একটা অ্যাড এজেন্সিতে আছি, আর্টিস্ট। চাকরিটা কিছুদিন হল করছি। আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে আগে একটা ফাইন আর্টস গ্যালারিতে ইন্টার্নশিপ করেছিলাম, এখন এখানে আছি।"

আমি অবাক হলাম, "আর্টিস্ট! মানে আপনি আঁকেন?"

মঙ্গলরূপ এবার লজ্জায় চোখ নামাল, "ওই আর কি! ছোটখাটো চাকরি, আপনার মতো সরকারি ছাপ নেই।"

আমি ছেলেটার লজ্জায় বেশ মজা পাচ্ছিলাম, "আমি আপনার মতো অত গুণী নই মোটেই, সংস্কৃত নিয়ে কোনোমতে বিএ পাশটুকু করেছি।"

মঙ্গলরূপ ভ্রূ দুটো পড়ে তুলে কপট ভয়ের ভঙ্গি করল, "ও বাবা! সংস্কৃত! সে তো ভারী শক্ত বিষয়! সেই নরঃ নরৌ নরাঃ। আমি জীবনে কোনোদিন ষাটের বেশি পাইনি সংস্কৃতে।"

"কিছুই শক্ত নয় সেরকম।" আমি হেসে বললাম। অনেকদিন পর দুশ্চিন্তা, অবসাদ সব ভুলে নিছক হাসছিলাম, ছেলেটা সংস্কৃত শুনে এমন মুখভঙ্গি করল! বললাম, "এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?"

"আমার এক বন্ধুর বাড়ি। একটা দরকার আছে।" মঙ্গলরূপ বলল, "আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"আমিও একটা কাজেই যাচ্ছি।" আমি বললাম, "আচ্ছা, আপনাদের ওই অ্যাসোসিয়েশনে সবাই তো পুরোহিত, মানে পুজোর সঙ্গে যুক্ত?"

"হ্যাঁ। সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে প্রায় চল্লিশ হাজার পুরোহিত আমাদের সদস্য।" মঙ্গলরূপ বলতে শুরু করল, "আসলে আমাদের বাড়ি আন্দুলে। সেখানকার চণ্ডীবাড়ির পুজো শুধু হাওড়া জেলা নয়, সারা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম পুজো। প্রায় বারো পুরুষ ধরে চলে আসছে ঐ পুজো। এছাড়া হাওড়াতে আমাদের এখনকার বাড়িতেও পুজো হয়। আমার বাবা পুরো

ব্যাপারটা দেখেন। তার সঙ্গে ওই অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পদও সামলান। তবে, আমি কিছুই করি না বলতে গেলে।" মঙ্গলরূপ হাসল, "আমি আঁকাজোকা নিয়ে থাকতেই ভালোবাসি।"

"ওই অ্যাসোসিয়েশনের কাজটা কী?" আমি প্রশ্ন করলাম।

মঙ্গলরূপ বলল, "প্রধান কাজ হল যাদের প্রধান জীবিকা পৌরোহিত্য, তাঁদের হয়ে কথা বলা। গ্রামে গঞ্জে প্রচুর পুরোহিত আছেন, যাদের সারাবছরের প্রধান রোজগার হল দুর্গাপুজোর সময়, এবার ধরুন কোনো ক্লাব পুজো করিয়ে ন্যায্য প্রণামী দিল না। সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যাসোসিয়েশন কথা বলবে, এইরকম আর কী। প্রতিটা জেলায় আমাদের লোক আছেন। তারা সবার খেয়াল রাখেন। বছরে দু-বার সম্মেলন হয়।"

আমি মাথা নাড়লাম, "বুঝলাম। কিন্তু ওই ঝন্টু মল্লিক আপনাদের সংগঠনের সদস্য, এটা মানতে কষ্ট হচ্ছে। ও ও কি পুজো করে?"

মঙ্গলরূপ এবার চুপ করে গেল।

"আচ্ছা," আমি আবার বললাম, "আপনার বাবাকে জিজ্ঞেস করবেন তো, মতের অমিল হওয়ার জন্য একটা মেয়ের সঙ্গে রাস্তাঘাটে অশালীন আচরণ করা, হুমকি দেওয়া, এগুলো কি ঠিক?"

"অশালীন আচরণ?" মঙ্গলরূপ যেন সত্যি অবাক হয়ে গেল, "মানে? কে অশালীন আচরণ করেছে? কার কথা বলছেন?"

"আপনাদের ওই ঝন্টু। সেদিন হাওড়া স্টেশনে আমার হাত ধরে টানাটানি করছিল।" আমি ঠোঁট কামড়ালাম, "তারপরেই তো আমি আপনাকে ফোন করে আজেবাজে বললাম। আপনি কিছু জানতেনই না?"

মঙ্গলরূপের চোখমুখ যেন আচমকাই শক্ত হয়ে উঠল, আমি খেয়াল করলাম। ও বলল, "আমি কিচ্ছু জানিনা তো! বাবাও জানেননা।"

আমি বললাম, "তবে আমিও ছাড়িনি। দিয়েছি ঠাটিয়ে একটা থাপ্পড়। তাই নিয়েও আমাকে পার্টির লোকেদের কাছে হুমকি শুনতে হচ্ছে। আপনি সত্যি করে বলুন তো, প্রেসিডেন্ট হিসেবে আপনার বাবা কি ঝন্টুর কাজকারবার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন?"

মঙ্গলরূপ মাথা নাড়ল। একটু গম্ভীর হয়ে গেল, মুখে কিছু বলছে না, কিন্তু কিছু একটা চিন্তা করছে।

ওদিকে লাস্ট স্টপেজ এসে গেছে। আমি উঠে দাঁড়ালাম, "যাই হোক আসি। ভালো থাকবেন। আর সেদিনের ব্যাপারটার জন্য আরও একবার ক্ষমা চাইছি।"

মঙ্গলরূপ সচকিত হয়ে বলল, "নানা ঠিক আছে।" তারপর এগিয়ে এসে লেডিজ সিটের দিকে তাকিয়ে বলল, "আলাপ করিয়ে দিই। এ হল সুরবীণা। ওর সঙ্গেই আমি একটা কাজে যাচ্ছি। সুরবীণা, ইনি দিওতিমা।"

এই আকস্মিক ঘটনার জন্য সত্যিই প্রস্তুত ছিলাম না। ততক্ষণে আমি বিনিকে দেখতে পেয়ে গেছি।

বিনিও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শক্ত হয়ে গেছে।

আমি পরিস্থিতি হালকা করতে বিনির দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ও নিমেষের মধ্যে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

উঠে দাঁড়িয়ে হনহন করে বাস থেকে নামতে নামতে মঙ্গলরূপের দিকে তাকিয়ে একটু রুক্ষস্বরে ও কথা ছুঁড়ে দিল, "তুমি কি আসবে?"

মঙ্গলরূপ বিনির এমন অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে সম্ভবত একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, "আচ্ছা আসি। আবার দেখা হবে।"

ওরা চলে যেতে আমি আবিষ্কার করলাম, আমার হাসিখুশি মেজাজটা আবার মেঘলা হয়ে গেছে।

কিসের জন্য জানিনা, বিষাদে ভরে যাচ্ছে ভেতরটা।

সেদিনের বিনির মুখে শোনা সেই সম্বন্ধের পাত্র তাহলে এই মঙ্গলরূপ? বিরক্তিতে আমার মুখটা কেমন সিঁটকে গেল, পরক্ষণেই আমি নিজের মনকে প্রশ্ন করলাম, আশ্চর্য! কে কাকে বিয়ে করছে, তাই নিয়ে আমার কি?

সত্যিই তো।

আমি নিজেই নিজেকে উত্তর দিলাম, বিয়ে করছে করুক না। কিন্তু আমার ছোটবেলার বন্ধু হয়ে বিনি কী ব্যবহারটা করল আজ আমার সঙ্গে? সেদিন ওরও হয়তো মেজাজ খারাপ ছিল, আমারও, ও-ও দুটো কথা বলেছে, আমিও বলেছি।

তাই জন্য আজ এমন অপমান করল?

আমি নিজের মনেই একটা অবজ্ঞার হাসি হাসলাম। ভালো তো! মঙ্গলরূপদের নিশ্চয়ই অনেক পয়সা, বনেদি বংশ যখন। আর বিনিদের বাড়িও তাই, ওদের তিন-চারটে বাস চলে রুটে। যদিও শিক্ষা নেই একফোঁটাও। যাই হোক, বিনি বড়বাড়ির বউ হবে, সব বড়বড় ব্যাপার। আমার মতো গরিব মেয়েকে পাত্তা দিতে যাবে কেন?

মঙ্গলরূপ ছেলেটা খারাপ নয়, আমি নিজের মনেই স্বীকার করলাম। সভ্যভদ্র, শিষ্টাচার বোধও আছে।

কিন্তু আজকের পর বিনি নিশ্চয়ই ওকে আমার সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ রাখতে বারণ করে দেবে, আর মঙ্গলরূপও নিশ্চয়ই একটা সামান্য পরিচয় হওয়া মেয়ের জন্য নিজের ভাবী স্ত্রীকে চটাতে চাইবে না।

মরুক গে যাক! একটা ইটের ঢেলায় পা-টা বেকায়দায় পড়তেই যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠলাম। তারপর শরীরের সবটুকু জোর দিয়ে লাথি কষালাম ওই ঢেলাটায়।

একটু দূরে লাফিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল সেটা।

পনেরো

আবীর মুখ থেকে একটা লম্বা সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, ”দ্যাখ ভাই, এই সুরবীণা হল রূপের বোন। তার মানে হল গিয়ে আমাদেরও বোন। তোর বোনের সঙ্গে যদি কোনো শালা এরকম করত, তুই তাকে ছেড়ে দিতিস?”

মন্টে ওর হলুদ দাঁতগুলো বের করে হাসল, ”প্রশ্নই ওঠে না। তোরা ভালো ছেলে ছিলিস, আমাদের সঙ্গে তেমন মিশতিস না। কিন্তু তুই বিশ্বাস কর, আমি যতদূর তিলককে জানি, ও কিন্তু এমন ছেলে নয়।”

আমি এবার মুখ করলাম, ”এমন ছেলে নয় তো এইরকম হুমকি দিচ্ছে কেন? কত টাকা চেয়েছে জানিস? ত্রিশ লাখ।”

মন্টে এবার মাথা চুলকোল, ”আজব লাগছে মাইরি শুনে। আমার সঙ্গে সেদিনও দেখা হল, কিচ্ছু বলল না।”

পোস্তার যে বিবেকানন্দ ফ্লাইওভার বছরকয়েক আগে ভেঙে পড়েছিল, মারা গিয়েছিল প্রায় পঞ্চাশ জন মানুষ, সেই ফ্লাইওভারের সামনেই একটা দোকানে বসে আমরা কথা বলছিলাম।

আমরা মানে, আমি, বিনি আর আবীর।

আমি আর বিনি একটু আগে বাস থেকে নেমে এখানে এসেছি, আবীর আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল, ও-ই রাস্তা চিনিয়ে মন্টের দোকানে নিয়ে এসেছে।

মন্টেও আমাদের স্কুলে ইলেভেন টুয়েলভ পড়েছিল কমার্স নিয়ে। বিনিকে রাজতিলক বলে যে ছেলেটা হুমকি দিচ্ছে, মন্টে তার বন্ধু। এখনো নাকি ওদের মধ্যে ভালো যোগাযোগ আছে।

মন্টে ছেলেটাকে স্কুলে কোনোদিনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমাদের হাওড়া জেলা স্কুলে অনেক দূরদূরান্ত থেকেও ছাত্র পড়তে আসত, মাধ্যমিকের পর আরও বেশি। আসলে অনেক রকমের সাবজেক্ট কম্বিনেশন নেওয়া যেত আমাদের স্কুলে। এই মন্টে, রাজতিলক এরাও ছিল তেমনই সব পরিযায়ী পাখি। মন্টের বাবার এই শাল রিপেয়ারিং এর বহু পুরোনো দোকান এখন মন্টেই চালায়।

বিক্রিবাটা যে তেমন নেই, তা দোকানের হাল দেখলেই বোঝা যায়। তাই মন্টে আবার দোকানে ফোনের রিচার্জও করে।

আবীর চিরকালই একটু নেতা গোছের, ও বলল, ”শোন মন্টে, তুই তোর ওই তিলককে বোঝা। যে মেয়ের সাথে ওর ঠিক করে কোনো রিলেশনই হয়নি, তাকে এরকম ব্ল্যাকমেল করছে। আমরা এখনো অল্পেতে মিটিয়ে ফেলতে চাইছি, এরপর থানা পুলিশ হলে কিন্তু কোমরে দড়ি দিয়ে জেলে নিয়ে যাবে।”

মন্টে বলল, ”তোরা বলছিস কোনো রিলেশনই হয়নি ওদের মধ্যে। তা কিছুই যখন নেই, তখন এত ভয়ের কী আছে আমি তো বুঝছি না। পাত্তা না দিলেই হল। কিছুই করতে পারবে না।”

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, আমাকে থামিয়ে দিয়ে বিনি মুখ খুলল। একটু ইতস্তত করে বলল, "দেখুন মন্টেদা, আমি নিজেও জানি, রাজতিলকও জানে। আমাদের মধ্যে ছ'-সাত মাসের একটা হালকা সম্পর্ক ছিল।" সামান্য থামল বিনি, "হ্যাঁ, আমরা একবার ডায়মন্ড হারবার গেছিলাম। কিন্তু কোথাও থাকিনি, ভোরে গিয়ে রাতে ফিরেছি।"

"তাহলে প্রবলেমটা কী?" মন্টে রীতিমতো বিভ্রান্ত।

বিনি এবার একটু ইতস্তত করল, তারপর বলল, "আ-আমাকে কিছু ছবি ইমেল করেছে তিলক, যেগুলো আমার ছবি, কিন্তু আমার নয়।"

"তোর ছবি কিন্তু তোর নয় মানে?" আমি অবাক হলাম এবার। এই ব্যাপারে বিনি আমাকে কিছু বলেনি আগে।

"মানে মুখটা আমার, শরীরটা নয়।" বিনির চোখদুটো জলে ভরে গেছে, "আমার মুখটা একটা নোংরা ছবির ওপর বসানো হয়েছে। মেলে লেখা আছে, সুপ্রতিমের ঠিকানা, ফোন নম্বর সব ও জানে, টাকাটা না দিলেই ছবিটা পাঠিয়ে দেবে।"

"এটা তো সাইবার ক্রাইম!" আবীর একবার উত্তেজিত হয়ে আমার দিকে তাকাল, "এখুনি থানায় রিপোর্ট করা উচিত!"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লাম। ব্যাপারটা যে আর লঘু নেই, সেটা বোঝা যাচ্ছে। প্রায়ই কাগজে পড়া খবরগুলো চোখের সামনে জ্যান্ত হয়ে উঠতে দেখে কেমন দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিলাম। এতক্ষণ অতটা গুরুত্ব দিইনি, রাজতিলক বলে ছেলেটার কথাগুলোকে ফাঁকা আওয়াজ মনে হচ্ছিল। বিনি আমার বোনের বন্ধু, ও আমার কাছে সাহায্য চেয়েছিল, সেই ব্যাপারে আমি ওকে হেল্প করছিলাম।

ভেবেছিলাম বন্ধুদের দিয়ে ছেলেটার সঙ্গে কথা বললেই ব্যাপারটা মিটে যাবে।

কিন্তু এবার মনে হচ্ছে বিনির সামনে সত্যিই বিপদ।

আমি বিনিকে বললাম, "থানাতেই তো যাওয়া উচিত মনে হয় রে বিনি। এগুলোকে প্রশ্রয় দেওয়া একদম ঠিক নয়।"

আবীর থানার নাম উল্লেখ করা অবধি বিনির মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল। এবার ও পরিষ্কার ককিয়ে উঠল, "না! থা-থানায় গেলে সুপ্রতিমের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা আর টিকবে না। বিয়েটাও ভেঙে যাবে। ওদের পরিবার এমনিই গোঁড়া।"

"কেটে যাবে তো যাবে।" আবির ঝাঁঝিয়ে উঠল, "তাই বলে তো আর একটা ক্রিমিন্যালকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না!"

"আপনি বুঝতে পারছেন না আবির দা।" বিনি এবার খুব কিন্তু কিন্তু করতে লাগল, "আমার বাবার শরীর ভালো নয়। আমাদের পরিবারও একটু গোঁড়া, মেয়েদের বেশিদিন রাখা হয় না বাড়িতে। আর আমার বিয়ে না হলে বোনের বিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এই সম্বন্ধটা চলে এলে আর ভালো পাত্র পাওয়া যাবে না। বাবা পুরো ভেঙে পড়বেন।"

"ওফ সেই মান্ধাতার আমলের কথাবার্তা!" আবির বিরক্ত হয়ে বলল, "মেয়ে মানেই বোঝা, এই কনসেপ্টটা এই যুগের মেয়ে হয়েও মাথা থেকে বের করতে পারছ না কেন? বিয়েটাই কি সব নাকি? চাকরি বাকরি করো, নিজের পায়ে দাঁড়াও। তারপর নিজের পছন্দমতো বিয়ে করবে। এখনকার মেয়েরা কত এডভান্সড, আর তোমরা বিয়ে বিয়ে করে হেদিয়ে মরছ।"

"আমাদের বাড়িতে মেয়েদের চাকরি করার নিয়ম নেই। আর ব্যাপারটা অতটা সহজ নয়।" বিনি এতক্ষণে কিছুটা স্বাভাবিক হয়েছে।

"কেন সহজ নয়? আবির তো ঠিকই বলছে।" এবার মন্টে নাক গলাল, "আপনি তিলকের ফালতু হুমকিতে পাত্তাই দেবেন না। এই সম্বন্ধ টেকার হলে টিকবে, নাহলে পরে আরও ভালো সম্বন্ধ আসবে, মিটে গেল।"

বিনি এবার আমাদের সবার মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে নিল, তারপর একটা বড়ো নিশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করল, "আমরা দু-বোন। মা ছোটবেলাতেই মারা গেছেন। আমি আর আমার বোন রিনি। আমাদের ট্রান্সপোর্টের বিজনেস, বাবাই পুরোটা দেখতেন। এখন অত্যধিক হাঁপানির জন্য দিনরাত কষ্ট পান বলে খুড়তুতো দাদারা দেখে। আমার প্রায় তিন বছর ধরে অনেক সম্বন্ধ আসছিল, কিন্তু সবই একে একে ভেঙে যাচ্ছে। বোনেরও বিয়ে হচ্ছে না এই জন্য।"

"কেন?" মন্টে উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলো, "মানে, কারণটা কী? আপনাকে দেখতে তো ভালোই, শিক্ষিতা ভদ্র পরিবারের মেয়ে!"

বিনি এবার মাথাটা নামিয়ে নিল, তারপর বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "আমার সারা শরীরটাই আস্তে আস্তে শ্বেতীতে ভরে যাচ্ছে। শুধু মুখটাই কোনো কারণে বাকি আছে।" গলায় মাফলারের মতো পেঁচিয়ে রাখা ওড়নাটা খুলে দিল ও।

সঙ্গে সঙ্গে ধবধবে বিনির গলার রক্তহীন ফ্যাসফেসে সাদা চামড়াটা যেন ওকে নির্মম উপহাস করে উন্মুক্ত হয়ে পড়ল।

আমার মনটা এমনিতেই নরম, তার ওপর বিনির অসহায়ভাবে বলা কথাগুলো শুনতে শুনতে মনটা আর্দ্র হয়ে উঠছিল।

এইজন্য মেয়েটা সবসময় গলাটা ঢেকে, ফুল হাতা জামা পরে থাকে?

বিনি বলে যাচ্ছিল, "আমার বিয়ে না হলে রিনিরও হবে না। তাই বাবা ভীষণ অস্থির হয়ে উঠেছেন। এর আগে দু-একজন পছন্দ করেছিল। কিন্তু তারা সবাই দোজবরে পাত্র, তার ওপর মোটা টাকা পণ চায়। তাদের আসল লোভ বাবার টাকার ওপরে।" বিনি মাথা নীচু করল, "এই সুপ্রতিমদের বাড়িই একমাত্র ব্যতিক্রম। ওরা একটু পুরোনোপন্থী হলেও সুপ্রতিম নিজে সমাজের ভালো কাজে যুক্ত থাকে। ওরা একটা টাকাও চায়নি।"

"বুঝলাম।" আবীর বলল, "আর এই রাজতিলক মালটা সুপ্রতিমের ডিটেইল জোগাড় করে তোমার কাছে টাকা চাইছে, নাহলে তোমার ওই মর্ফ করা ছবিগুলো সুপ্রতিমের কাছে পাঠিয়ে দেবে তাই তো?"

"হ্যাঁ।" বিনি ফোঁপাচ্ছিল, "বাবা অত কিছু বুঝবেন না, ভাববেন আমারই সব দোষ। এই সম্বন্ধটাও ভেঙে গেলে বাবাকে আর বাঁচানো যাবে না। এর আগে একবার স্ট্রোক হয়ে গেছে।"

"পুলিশ যদি তোর পরিচয় গোপন রেখে রাজতিলককে ধরে?" আমি জিজ্ঞস করলাম।

"পুলিশে জানাজানি হলে সুপ্রতিম তো জানবেই, তাহলে এই বিয়েটাও ভেঙে যাবে।" বিনি কাতর স্বরে বলল, "আমি দু-দিন ধরে অনেক কিছু ভেবেছি। রাজতিলক ত্রিশ লাখ টাকা না দিলে বলছে সুপ্রতিমকে সব জানিয়ে দেবে। সুপ্রতিমদের তেলের কল আছে, এ ছাড়া প্রোমোটারিও করে। বলেছে বিয়ের পর বাবার চিকিৎসার জন্য সব দৌড়ঝাঁপ ও-ই করবে। তাই এই বিয়েটা হলে আমাদের আর কোনো চিন্তা থাকবে না।" বিনি এবার

মন্টের দিকে তাকাল, ”মন্টেদা, আপনি তিলককে বলুন, ত্রিশ লাখ টাকা পারব না, কিন্তু কুড়ি লাখ টাকা আমি ওকে দেব। ও যেন প্লিজ ছবিগুলো মুছে ফেলে!”

আবীর এবার কড়া গলায় বলল, ”মানেটা কী? এটাতে তো ও মজা পেয়ে যাবে, আবার কোনো মেয়ের সঙ্গে এমন করবে।”

আমি আবীরের কোথায় সায় দিয়ে বললাম, ”ঠিকই তো! আর তা ছাড়া কুড়ি লাখ টাকাই বা তুই কোথায় পাবি? কাকাবাবুকে তো জানাতেই হবে তোকে।”

”আমাদের দু-বোনের নামে বাবা কুড়ি লাখ টাকা করে ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছেন ব্যাঙ্কে, সেটা আমি একাই তুলতে পারব। ওটাকেই ভাবছি …!” বিনি বলল, ”আপনি প্লিজ কুড়ি লাখে রাজি করান ওকে মন্টেদা!”

আধঘণ্টা বাদে মন্টের দোকান থেকে বেরিয়ে বিনি বলল, ”আমার সুপ্রতিমের সঙ্গে দেখা করার আছে রূপদা। তুমি চলে যাও বরং।”

আমার বিরক্ত লাগছিল। বললাম, ”আচ্ছা। কী হল তোকে মন্টে জানিয়ে দেবে।”

বিনি কিছুক্ষণ আমার দিকে নিস্পলক চেয়ে রইল, তারপর বলল, ”তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেব জানিনা রূপদা! আমার জন্য এত কিছু করছ!”

”না না, কিই আর করতে পারলাম!” আমি তেতো মনে বললাম, ”তুই মেনে নিচ্ছিস ব্যাপারটা, এটাই খারাপ লাগছে। ছেলেটার একটা কড়া শাস্তির দরকার ছিল।”

”ছাড়ো। কিন্তু টিকলিকে কিছু বোলো না রূপদা। ওর চোখে নিজেকে আর ছোটো করতে চাই না।” তারপর কী একটা মনে পড়তেই বলল, ”আচ্ছা, দিওতিমাকে তুমি কীভাবে চিনলে?”

”ওই, পুজো নিয়ে ও মামলা করেছে না? সেই ব্যাপারে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে একটু খটাখটি …।” আমি বললাম।

”বুঝেছি।” মুখ বেঁকাল বিনি, ”সস্তা প্রচারের জন্য পাগল হয়ে গেছে। হু! যাই হোক, আমি যাই।”

বিনি চলে যাওয়ার পর আমি আনমনে হাঁটছিলাম।

রাজতিলকের পুরো ঘটনাটাতেই কেমন যেন আশ্চর্য লাগছে। আমাদের জেলা স্কুলের একটা ছেলে এতটা খারাপ ভাবতেই নিজের ওপরও কেমন যেন লজ্জা হচ্ছে।

কী মনে হতে আবীরকে একটা ফোন করার জন্য মোবাইলটা পকেট থেকে বের করতে তার আগেই একটা ফোন এল।

স্ক্রিনে দেখি জিষ্ণুর মুখ। রিসিভ করে বললাম, ”বল।”

”শোন, তোর ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সব কিছু নিয়ে নিবি। ওখানে পারমিট করতে হবে, তখন লাগবে।”

”সে না হয় হল।” আমি বললাম, ”কিন্তু আমরা শেষপর্যন্ত কে কে যাচ্ছি? রাঘব তো বললি যেতে পারবে না, ওর কী কাজ পড়ে গেছে।”

জিষ্ণু কেজো গলায় বলল, ”হ্যাঁ। ওটা তোরই মতো, চিরকালের ঝোলানো পার্টি। চারজন যাচ্ছি। আমি তুই গৈরিক আর চিরন্তন। মঙ্গলবার রাতে ট্রেনে উঠব। তুই একটু

কাকিমাকে বলিস তো, সেই ডুমো ডুমো করে কেটে সাদা আলুর চচ্চড়িটা যেন বানিয়ে দেয়। লুচিটা আমার বাড়ি থেকে নিয়ে যাব।"

ফোনটা রেখে দিয়ে আমার মনটা বেশ খুশি খুশি হয়ে উঠল। জীবনে প্রথমবার পাহাড় দেখব, জীবনে প্রথমবার বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যাব। দূরের গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আজ বাসে দেখা হওয়া দিওতিমাকে মনে পড়ে গেল।

সত্যিই, আজ মেয়েটা যেন পুরো অন্যরকমভাবে কথা বলছিল। আগের দিন হাইকোর্টের সেই রণচণ্ডী মূর্তির সঙ্গে যেন কোনো মিলই নেই।

আমার মনের আনন্দের সাথে তাল মিলিয়েই বোধ হয়, হঠাৎ দেখলাম এই ভ্যাপসা গরমের মাঝে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল। যাক, পুজোর আগে বৃষ্টিটা হয়ে যাক বাবা, পুজোটা বরবাদ না করলেই হল।

আমার সঙ্গে ছাতা নেই, তবু থামলাম না।

বাসেও উঠলাম না।

হাওড়া ব্রিজের ফুটপাথ দিয়ে হালকা বৃষ্টির ছাঁটে ভিজতে ভিজতে হাঁটতে লাগলাম আমি।

ষোলো

মা যখন কাঁপা কাঁপা গলায় ফোন করল, তখন আমি অফিস থেকে সবে বেরিয়েছি।

মা আমার 'হ্যালো' শুনেই বলল, "তুই কোথায়?"

"এই তো অফিস থেকে বেরোলাম। হাঁটছি। বাস ধরব।" আমি ক্লান্ত গলায় বললাম, "বলো।"

মা এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, "অলোকদা ফোন করেছিল আমায়।"

আমি চুপ করে গেলাম। তার মানে মা-র কাছে আর কিছুই অজানা নেই। অলোকমামা ইতিমধ্যেই খবরটা জানিয়ে দিয়েছে মা-কে।

অবশ্য জানানোটাই স্বাভাবিক। আমার এই সব ঝামেলা শুরু হওয়ার সময় থেকেই মা অলোকমামাকে বলে রেখেছে সব খবর জানাতে। আর আজ তো অফিসে সারাদিন এই আলোচনাতেই ব্যস্ত ছিল সকলে।

আমাদের বাগনান এক নম্বর ব্লকের অফিসেই পিওনের কাজ করে অলোকমামা। খন্যানে মা-দের বাড়ির পাশেই থাকত অলোকমামা। মা-র ছোটবেলার পাড়াতুতো দাদা। এখানে আমি জয়েন করার পর কথায় কথায় যখন সম্পর্কটা বেরিয়ে গিয়েছিল, তারপর একদিন গিয়েছিল আমাদের বাড়ি।

তারপর থেকেই পুরোনো দাদা-বোনের সম্পর্ক জেগে উঠেছে এখন মা-র সাথে প্রায়ই অলোকমামার টুকটাক ফোনে কথা হয়।

আমি বললাম, "আচ্ছা। কী বলল অলোকমামা? আমি তো যখন বেরোলাম, তখন দেখলাম খবরের কাগজ পড়ছে।"

মা খিঁচিয়ে উঠল, "কী বলল বুঝতে পারছিস না? খবরটা কি সত্যি? তোর ... তোর ট্রান্সফারের চিঠি এসেছে?"

বাস এসে গিয়েছিল, আমি এক হাতে মোবাইলটা সাবধানে ধরে বাসে উঠে পড়লাম।

চোখটা হঠাৎ কেমন জ্বালা করে উঠল।

আর এই রুটে যাতায়াত করতে হবে না, আর ছুটতে ছুটতে হাওড়া থেকে ট্রেনও ধরতে হবে না।

প্রথম যেদিন এসেছিলাম, সেদিন মনে হয়েছিল কোনো গণ্ডগ্রামে চলে এসেছি। কিন্তু আজ ... মনটা খুব খারাপ লাগছে, নস্ট্যালজিয়ায় ভরে উঠছে ভেতরটা।

গলার কাছে কী একটা দলা পাকাচ্ছে।

শান্তভাবে মা-কে বললাম, "হ্যাঁ মা। আমার দার্জিলিঙে ট্রান্সফার হয়েছে। আজই চিঠি এসেছে।"

মা প্রায় চিৎকার করে উঠল, "কী বলছিস তুই? দার্জিলিং? এত দূরে ...এরকম হঠাৎ করে ... তোদের তো চার-পাঁচবছরের আগে ট্রান্সফার হয় না বলেছিলি!"

"বাড়ি যাই। গিয়ে কথা বলছি।" আমি ফোন রেখে দিলাম।

মা-র বলা কথাগুলো মনে করতে করতে নিজের অজান্তেই আমার মুখে একটা ম্লান হাসি জেগে উঠল।

মা কথাটা ভুল কিছু বলেনি। আমার বাগনানে মাত্র এগারো মাস চাকরি হয়েছে, এত তাড়াতাড়ি কারুর ট্রান্সফার হয় না। তার ওপর মেয়েদের তো এতদূরে কখনোই পাঠায় না।

তাই অফিসে কাজের মাঝে আজ বেলা এগারোটা নাগাদ ট্রান্সফার অর্ডারটা আসতে সত্যিই হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম।

আমাকে তিনদিনের মধ্যে দার্জিলিঙের পুলবাজার ব্লকে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছিল অর্ডারে। আমি তখন রীতিমতো দিশেহারা।

অফিসের মদনদা, তপোজ্যোতিদা, অলোকমামা প্রত্যেকেই অবাক। সবার মুখেই এক কথা, ”এরকম তো হয় না জেনারেলি! বিশেষ করে মেয়েদের তো …!”

‘জেনারেলি’ শব্দটা যে আমার জন্য প্রযোজ্য নয়, সেটা আমি ভালোই বুঝতে পেরেছিলাম। ঝন্টু আর অরূপ কাঞ্জিলালের কেসটার পর থেকে বিপদের আশঙ্কা তো করছিলামই, তবে আঘাতটা যে সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে, আমার চাকরির দিক দিয়ে আসবে এটা আমি আন্দাজ করতে পারিনি।

আধঘণ্টার মধ্যেই ফোনটা এসেছিল। ওপাশ থেকে অরূপ কাঞ্জিলাল বলেছিল, ”তোমাকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছিলাম। তোমার ভালোর জন্যই কোনো স্টেপ নেওয়ার আগে গিয়েছিলাম তোমার বাড়ি। কিন্তু নিজের দোষে তুমি সেই মর্যাদাটা রাখলে না।”

আমি একটা উত্তরও দিইনি। ঘৃণায় জ্বলছিল মন। যারা সম্মুখসমরে সুবিধা করতে না পেরে পেছন থেকে ছুরি মারে, তাদের কী বলব?

অরূপ কাঞ্জিলাল সম্ভবত আমার অনুনয় বিনয় আশা করেছিল। কিন্তু এপাশ থেকে কোনো রেসপন্স না পেয়ে তখন গলাটা সামান্য নরম করেছিল, ”এখনো সময় আছে দিওতিমা। তোমার মতো এমন অনেক ছেলেমেয়ে আমি দেখেছি। যদি কেসটা সময়মতো তুলে নাও, যদি আর মিডিয়ার সামনে মুখ না খোল, একমাসের মধ্যে পুলবাজার থেকে নিয়ে আসব। নাহলে ওই গন্ডগোলের জায়গায় কিন্তু পচতে হবে। দু-দিন অন্তর ওখানে গোর্খাদের আন্দোলন লেগেই আছে।”

”শুনুন মি. কাঞ্জিলাল।” আমি একটা লম্বা নিশ্বাস নিয়েছিলাম, তারপর বলেছিলাম, ”আমি সরকারের কর্মচারী, আপনার নই। আমার অফিস আমাকে যেখানে ট্রান্সফার করবে, আমি সেখানেই যাব। আপনার আর কিছু বলার না থাকলে ফোনটা রাখতে পারেন। আমার কাজ আছে।”

কনডাক্টর টিকিট চাইতে আমি বর্তমানে ফিরে এলাম। মা-র সামনে যতই নিজেকে স্বাভাবিক দেখাতে চেষ্টা করি, বুকের ভেতরটা থেকে থেকেই কেমন শিউড়ে উঠছিল, ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। জীবনে অনেক লড়াই করেছি, কিন্তু বাড়ি ছেড়ে কোথাও থাকতে হয়নি।

তার ওপর এত দূর!

ছবিদাদু ফোনে সব শুনে মৃদু হাসলেন, বললেন, ”দুনিয়ার আদিমতম নোংরা রাজনীতি। সেই রাজারাজড়ার আমল থেকে চলে আসছে। শত্রুপক্ষের সঙ্গে যুঝতে না পারলেই

তাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দাও।"

এদিকের রাস্তা খুব খারাপ, অন্যদিন ঝাঁকুনিতে সিটের সঙ্গে লাফাতে লাফাতে বিরক্তিতে কুঁচকে যায় আমার মুখ, কিন্তু আজ আর ততটা খারাপ লাগছিল না ঝাঁকুনিগুলো।

হাতল ধরে নিজেকে ব্যালান্স করতে করতে ফোনটা কানে চেপে ধরে বললাম, "কী হবে তাহলে দাদু? আমার পুজো করার ব্যাপারটা তো পুরো শেষ হয়ে গেল।"

"কেন শেষ হয়ে যাবে?" দাদু যেন অবাক হলেন আমার কথায়, "দার্জিলিং কি বাংলার বাইরে নাকি? তুই তোর চেষ্টা চালিয়ে যাবি। কোর্টে শুনানি চলুক, শনি রবিবার বাড়ি চলে আসবি। তা ছাড়া আমি তো আছিই।"

সারাটা রাস্তা আর কাউকে ফোন করলাম না। চোখ বন্ধ করে সিটে হেলান দিয়ে বসে রইলাম।

দুম করে একরকম অপ্রাসঙ্গিকভাবে স্মৃতিতে ফিরে এল সেদিন পোস্তায় ছবিদাদুর চেনা উকিলের কাছে যাওয়ার সময়টা।

মঙ্গলরূপ ছেলেটাকে আগের দিন ফোনে ওরকম বলেছিলাম বলে বেশ খারাপ লাগছিল, তাই সেদিন বাসে বেশ মন খুলে কথা বলছিলাম। ছেলেটার সম্পর্কে ওদের দলের লোকেরা যতই ক্যাবলা, গোবর এইসব বলুক, মানুষ হিসেবে যতদূর মনে হয়েছে ভালোই।

কিন্তু বিনির সঙ্গে যে ওরই বিয়ের ঠিক হয়েছে, এটা আমি কল্পনাতেও আনতে পারিনি।

যেদিন বিনির সঙ্গে ঝগড়া হল, বিনি কথায় কথায় বলেছিল, ওর শ্বশুরবাড়ির লোক নাকি এসে ওকে রুটি গোল হয় কিনা জিজ্ঞেস করেছে। হতেই পারে। মঙ্গলরূপের বাড়ি তার মানে খুব প্রাচীনপন্থী। ভালোই মিল হবে, যেমন দ্যাবা তেমন দেবী।

বিনিদের বাড়িও তো ওইরকমই।

আমার হঠাৎ করে কেন জানিনা, বিনির ওপর খুব রাগ হতে লাগল। বাড়ি ঢুকেও সেই রাগ কমল না।

তার মধ্যে মা রীতিমতো বাংলা সিরিয়ালের মতো ডায়লগ বলতে শুরু করে দিল, "আমি জানতাম! আমি জানতাম এমনই কিছু একটা হবে। এতগুলো বছর মুখে রক্ত তুলে কষ্ট করলাম, কি না করেছি! বাপের বাড়িতে কখনো এক গ্লাস জলও গড়িয়ে খেতাম না। সেই আমি লোকের বাড়ি রান্না থেকে শুরু করে হাসপাতালে আয়াগিরি ... তবু মেয়েকে পড়াশুনো ছাড়াইনি, কারুর কাছে হাত পাতিনি। যত কষ্টই হোক, মেয়েকে সংসারের কাজে হাত লাগাতে দিইনি। এতবছর পরে ভাবলাম মেয়ে সরকারি চাকরি পেল, ভগবান মুখ তুলে তাকালেন। ও বাবা, কোথায় কী!"

আমি কোনো প্রতিবাদ করছিলাম না। মা যদি এইসব বলে নিজের কষ্ট লাঘব করতে পারে তো করুক।

"একা একটা সোমত্থ মেয়ে গিয়ে একা থাকা ...!" মা এবার হাউ মাউ করে উঠল, "যেতে হবে না তোকে। এই চাকরি তুই ছেড়ে দে। আমি যেভাবে চালাচ্ছিলাম সেভাবেই চালাব। আমার অদৃষ্টে সুখ নেই কী আর করা যাবে।"

মায়ের ভাবভঙ্গি দেখে অজান্তেই এবার আমার ঠোঁটের একপাশে হাসি খেলে গেল, ”মা, তুমি এমন করছ যেন আমাকে কাশ্মীরের বর্ডারে পাঠাচ্ছে। পুলবাজার দার্জিলিঙের একটা সাধারণ ব্লক। সেখানে স্কুল কলেজ, অফিস কাছারি, দোকানপাট সবই আছে। আমার কোনো অসুবিধেই হবে না।”

”কী দরকার ছিল তোর এইসব করার?” মা এবার ঝাঁঝিয়ে উঠল, ”কী দরকার ছিল তোর পুজো পুজো করে বড় বড় লোকেদের চটানোর? সেলিব্রিটি হয়েছ, তাই না? কই, এখন তোমার খবরের কাগজওয়ালারা এসে বাঁচাচ্ছে তোমায়?” মা পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাতেই বোধ হয় দুম করে ‘তুই’ থেকে ‘তুমি’তে উঠে গেল।

”বাঁচানোর প্রশ্ন আসছে কোত্থেকে?” আমার এবার বিরক্ত লাগল, ”আমার কী এমন বিপদ হয়েছে যে বাঁচাতে হবে? আমি একটা চাকরি করি, তাতে ট্রান্সফারড হয়েছি। তাতে কী হয়েছে?”

মা এবার রোদন থামিয়ে আমার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকাল, ”তার মানে এর পরেও তুই ওইসব কাণ্ড চালিয়ে যাবি?”

”ওইসব কাণ্ড মানে?” আমি বললাম, ”আমি তো বলেইছি, পশ্চিমবঙ্গে আমি পুরোহিতদের জন্য লাইসেন্স আনবোই। তার জন্য যা করতে হয় করব।”

মা আর একটা কথাও বলল না। গুম হয়ে ভেতরে চলে গেল। এবার কিছুক্ষণ মৌনপর্ব চলবে। তারপর রান্নাঘর থেকে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করে ফ্যাচ ফ্যাচ করে কান্নার শব্দ ভেসে আসবে।

আমিও আর সময় নষ্ট না করে কাগজ পেন নিয়ে বসলাম। পোস্তার উকিলের নাম রাজেন সমাদ্দার। সে ছবিদাদুর প্রাক্তন ছাত্র। সেই রেফারেন্সে সত্যিই সে প্রায় বিনাপয়সায় মামলা লড়বে বলেছে। শুধু হুমকি নয়, আমার আগের দায়ের করা জনস্বার্থ মামলাটাও সে দেখছে। শুধু আমাকে পুরো ঘটনার একটা ব্রিফ করে দিতে হবে। তারপর সেই অনুযায়ী উকিলমশাই কেস সাজাবেন।

সেইমতো ব্রিফ লিখছিলাম। যাওয়ার আগে সব কাজ গুছিয়ে শেষ করে যেতে চাই যাতে কোনো অসুবিধা না হয়। হঠাৎ মোবাইলে টুং টাং শব্দে আমার মনোযোগ ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখলাম যা ভেবেছি তাই।

মঙ্গলরূপ ফোন করছে। সেদিন পোস্তার বাসে বিনি ওরকম অভদ্র ব্যবহার করার পরে হুড়মুড় করে ও নেমে গিয়েছিল হবু বউয়ের পেছন পেছন।

এখন থেকেই স্ত্রৈণ হয়ে গেছে। বিয়ের পর কী হবে কে জানে? মুখ বেঁকিয়ে ভাবলাম আমি।

সেদিন রাতেও মঙ্গলরূপের কাছ থেকে ফোন এসেছিল। আমি ধরিনি। ইচ্ছে করেনি। বিনি আমার ছোটবেলার বন্ধু, তার সঙ্গে সেদিনের একটা সামান্য বাদানুবাদের পর যখন ও এতদিন ধরে জের চালাতে পারে, আমারই বা ওর ভাবী স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর কি দরকার?

তারপর গতকাল একটা মেসেজ পেয়েছিলাম, ”আমি মঙ্গলরূপ ভট্টাচার্য। কেমন আছেন? সেদিন বাসে কথা হয়ে খুব ভালো লাগল। আপনি কোর্টে আবার কবে যাবেন?”

আমি সেটারও কোনো রিপ্লাই করিনি। যে মন নিয়ে বাসে অতক্ষণ কথা বলেছিলাম, সেটা যেন কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটার ওপর সেই আগের রাগ আবার ফিরে

আসছিল।

অথচ মঙ্গলরূপ কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি আমার সঙ্গে।

ফোনটা কেটে গিয়েছিল, আবার বাজছে।

বিরক্তির একটা শব্দ করে ফোনটাকে সাইলেন্ট করে দিলাম আমি।
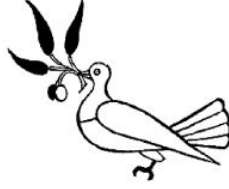
সতেরো

মন্টের পেছন পেছন আমরা যখন দাশনগর স্টেশনে নামলাম, তখন বিকেল হয়ে গেছে। আমার বাড়ি হাওড়াতে হলেও এই দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের দিকে লোকাল ট্রেনে আগে কখনো আসিনি। এই পথে শুধু পুরী গেছি ছোটবেলায়। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে আগে পড়ল টিকিয়াপাড়া স্টেশন, তারপর দাশনগর।

দাশনগর স্টেশনটা বেশ ফাঁকা, একটা করে ট্রেন এলে সামান্য চাঞ্চল্য, তারপরেই নির্জন।

মন্টে একটা বিড়ি ধরাল। হাত বাড়িয়ে আমাদের হাতে একটা করে গুঁজে দিতে আমি আড়ষ্ট হয়ে বললাম, "নানা! আমি এসব খাইনা রে। দাশনগরে আমাদের দোকানের একগাদা কর্মচারী থাকে, কেউ দেখে ফেললে বাজে ব্যাপার হবে।"

মন্টে ওর হলুদ ছোপধরা দাঁতগুলো বের করে হাসল, তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, "আচ্ছা বেশ। চল।"

আবীর মন্টেকে বলল, "রাজতিলকের বাড়ি কি দাশনগরে নাকি? এখানে আমার মামার বাড়ি।"

"তিলকের বাড়িটা ঠিক কোথায় আমি জানিনা ভাই।" মন্টে বলল, "ওর বাপের দোকান কদমতলায়। বাপটা বছর দুয়েক হল টেঁসে গেছে, আমরা ওর দোকানে মাল্লু টানতে যাই। এদিকে আয়।"

আমি একপলক আবীরের মুখে দিকে চেয়ে আবার চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

স্কুলজীবন শেষ হয়ে গেছে আজ প্রায় দশ বছর। এই দশ বছরে আমি যেমন আপাদমস্তক ভালো ছেলের তকমাটা সযত্নে বয়ে নিয়ে চলেছি, তেমনই মন্টে, রাজতিলক, এইসব ছেলেরা নিজেদের মতো করে জীবনের মূলস্রোতে ছড়িয়ে পড়েছে।

কে ঠিক কে ভুল, সেই দাঁড়িপাল্লার মাপ আমার কাছে নেই, আমি সেটা বিচার করারও কেউ নই, কিন্তু এই মুহূর্তে মন্টেকে দেখে আমার নিজের চেয়ে ওকে অনেক বেশি স্বাধীন মনে হল। ও যা চায় মুহূর্তেই করতে পারে। আমার মতো কে কী ভাববে সেই ভেবে নিজের ইচ্ছেগুলো ওকে দমিয়ে রাখতে হয়না।

আবীর আবার মাঝামাঝি, একেবারে গোল্লায় যাওয়া ছেলেও নয়, আবার আমার মতো অতি বশংবদও নয়। মাঝেমধ্যে সিগারেট ফোঁকে। এখন দিব্যি বিড়িতে টান দিল।

দাশনগর স্টেশনটা রাস্তা থেকে উঁচুতে। ফুটব্রিজ দিয়ে নীচে নেমে মন্টে হাত দেখিয়ে একটা টোটো দাঁড় করাল, "যাবে নাকি ভাই?"

"কোথায়?" টোটোওয়ালা ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল।

"কদমতলা যাব।"

"উঠে পড়ুন। দশ টাকা করে লাগবে।"

আবীর বলল, "তুই কি আগে থেকে তিলককে কিছু বলে রেখেছিস?"

মন্টে বলল, "না না। তারপর থেকে আমার সঙ্গে ওর আর কথা হয়নি। মালটা এখন বেজায় ব্যস্ত, সামনে ভোট না!"

"ভোট তো ওর কি?" আবীর বলল, "ওর তো বাইকের দোকান বললি!"

"বাইক মানে পুরোনো বাইক। লোকজন পুরোনো গাড়ি বেচে দিয়ে যায়, সেটাই আবার রংচঙ করে বিক্রি করে।" মন্টে বলল, "ইদানীং আবার সঙ্গে পার্টির কাজকর্ম করছে দেখছি। কে জানে কী ব্যাপার!"

টোটোওয়ালা যেখানে নামাল, সেখানে বেশ চওড়া রাস্তা। মাঝখান দিয়ে ডিভাইডার চলে গেছে। দু-পাশে লোহালক্কড়ের দোকান। মন্টে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "তোরা আগে কিছু বলিস না। আমিই যা বলার বলব।" পিচ করে একদলা থুতু ফেলল ও, "এখন শালা আর উটকো ঝামেলায় জড়াতে ইচ্ছে করে না, কোত্থেকে কী কিচাইন হয়ে যাবে, তখন আরেক ঝক্কি। নেহাত মেয়েটা আমাদের রূপের বোন, আর অমন করে বলল তাই!"

আমি লক্ষ্য করলাম, মন্টে এমনভাবে 'আমাদের রূপের বোন' কথাটা বলল, যেন আমি ওর কতদিনের চেনা। অথচ স্কুলে পড়লে ওর সঙ্গে আমি কখনো বন্ধুত্ব তো দূর, কথাও বলিনি।

এইসব তথাকথিত খারাপ ছেলেরাই কি বিপদেআপদে মানুষের পাশে দাঁড়ায়? কোনো ইগো থাকে না বলেই কি চট করে মানুষকে আপন করে নিতে পারে?

নাহ, তার কোনো মানে নেই। সবাই সমান নয়। মন্টে ভালো, তেমনই রাজতিলক তো কত খারাপ একটা ছেলে।

দু-পাশে দুটো বিশাল বিশাল হার্ডওয়ারের স্টোর, তার মাঝখানে স্যান্ডউইচের মতো চেপটে আছে একটা ছোট দোকান। দোকানের সামনে ভাঙাচোরা কয়েকটা মোটর সাইকেল পড়ে আছে। কোনোটার ইঞ্জিন খোলা, কোনোটার আবার টায়ার লাগানো নেই।

মন্টে এগিয়ে গিয়ে দোকানটার ভেতরে ঢুকল, পেছন পেছন আমরাও। আজ সকাল থেকে মেঘ ডাকছে, কিন্তু বৃষ্টির নাম নেই। ফলে গুমোট হয়ে আছে। দোকানে ঢোকামাত্র ভ্যাপসা গরম নাকেমুখে এসে ঝাপটা মারল। ভেতরে আলোও খুব একটা নেই, হ্যালোজেন বাল্ব জ্বলছে একটা।

আমাদেরই বয়সি একটা ছেলে সাদা হাতকাটা গেঞ্জি পরে উবু হয়ে বসে রয়েছে। হাত কালিমাখা, বুকেও কালির ছোপ লেগেছে। হাতে একটা বাইকের খোলা হ্যান্ডল আর অন্যহাতে ন্যাকড়া।

মন্টেকে দেখে ছেলেটা মাথা তুলল, "কিরে তুই? এখন?" বলতে বলতে আমাদের দুজনের দিকেও তাকিয়ে নিল এক ঝলক।

চিনতে পারেনি। সেটাই স্বাভাবিক।

মন্টে বলল, "তোর সঙ্গে জরুরি কথা আছে তিলক।" কথাটা বলে আমাদের দিকে তাকাল, "এদেরকে চিনতে পারছিস? এ হল মঙ্গলরূপ। আর ও আবীর। এগারো বারো ক্লাসে জেলা স্কুলে পড়ত আমাদের সঙ্গে।"

"না। চিনতে পারছি না।" রাজতিলক একগাল হাসল, "কী নাম তোদের? তুই-ই বলছি। কোথায় থাকিস?"

আমি নিশ্চুপভাবে দেখে যাচ্ছিলাম। এত বড় একটা অপরাধ করেও কোনো বিকার নেই, দিব্যি হাসি হাসিমুখে কথা বলে চলেছে, যেন কত ভালো ছেলে।

এমনভাবেই হয়তো ভালোমানুষের খোলস পরে কত অপরাধী এইভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের সমাজে!

আবীর সংক্ষেপে আমাদের দুজনের পরিচয় দিয়ে গলা খাঁকারি দিল, "ইয়ে রাজতিলক, তোর কাছে আমরা খুব দরকারি একটা ব্যাপার নিয়ে এসেছি।"

"দাঁড়া।" রাজতিলক পেছন দিকে হেলে হাঁক দিল, "অ বউদি, বউদিইইই!"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দোকানের পেছন দিক থেকে খনখনে গলায় আওয়াজ এল, "কী হয়েছে? ষাঁড়ের মতো চেঁচাস কেন?"

রাজতিলক আবার পেছনদিকে হেলল, "চারকাপ চা পাঠাও না গো। ইয়ে...তোমাকে পরে সব বুঝিয়ে বলছি।"

"পরে আর কিচ্ছু বোঝাতে হবে না তোকে।" খনখনে গলা বলে চলল, "বুঝে বুঝে বোঝাই হয়ে গিয়েছি। সব মিলিয়ে আড়াই মাসের চা বাবদ সাড়ে পাঁচশো টাকা বাকি আছে, আগে সেটার হিসেব মেটা রে ড্যাকরা!"

আবীর তাড়াতাড়ি বলল, "না না, চা-টা কিছু লাগবে না। একটা দরকারি কাজে আমরা এসেছি, এখুনি চলে যাব।"

"আরে চা এসে যাবে। চাপ নেই।" রাজতিলক আমাদের দিকে চেয়ে একগাল হাসল, "মেনকাবউদি। আমার দোকানের পেছনেই ওর চায়ের গুমটি। মেজাজটা গরম, কিন্তু হাত সরেস। চা-টা যা বানায় না, খেলে পুরো ছিটকে যাবি।"

মন্টে এইসময় বলল, "তিলক, তুই সুরবেণু বলে কাউকে চিনিস?"

মন্টে বিনির নামটা ভুল বলেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি দোকানের হ্যালোজেন আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম রাজতিলকের চোয়ালটা কেমন ঝুলে পড়ল।

আমি বললাম, "সুরবেণু নয়, সুরবীণা।"

আবীর এবার একটু কড়া গলায় বলল, "দ্যাখ রাজতিলক, তুই আমাদের স্কুলে পড়তিস। আমাদের ব্যাচেরই ছেলে। আমরা শুধু এইজন্য থানাপুলিশ করার আগে তোর কাছে এসেছি। নাহলে বুঝতেই পারছিস পুলিশের কাছে গেলে তুই কতটা ফাঁসবি?"

"ক-কী হয়েছে?" রাজতিলকের হাসি হাসি মুখটা নিভে গিয়ে একটা ধূসর ছোপ পড়ল মুখের ওপর।

"কী হয়েছে সেটা তো তুই বলবি তিলক!" মন্টে বলল, "আমি তো শুনে থেকে অবধি বিশ্বাস করতে পারছিনা! আমরা পড়াশুনো ছেড়ে দেওয়া বখে যাওয়া ছেলে হতে পারি, কিন্তু এইরকম খারাপ কাজ ...!"

রাজতিলক এবার গুম হয়ে গেল।

"তুই শালা এইসব মেয়েদের ছবি নিয়ে নোংরামো কবে শুরু করলি? ব্যবসা কি একেবারেই চলছে না? তেমন হলে বল আমরা নাহয় তোকে ধার-টার ...।" মন্টে বলল, "পুলিশ তো কেলিয়ে কাঁঠাল করে দেবে রে!"

"সুরবীণাকে তোরা কী করে চিনলি?" রাজতিলক মিইয়ে যাওয়া গলায় বলল।

"বলব। তার আগে তুই বল কী করে তুই এই কাজটা করতে পারছিস? মেয়েটার নিজের অনেক প্রবলেম রয়েছে। অনেক কষ্টে একটা বিয়ে ঠিক হয়েছে, আর তুই সেখানে এইরকমভাবে বাগড়া দিচ্ছিস? ত্রিশলাখ টাকার জন্য? এত টাকা মেয়েটা কোথায় পাবে?" মন্টে সত্যিই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল।

"ওদের অনেক টাকা।" রাজতিলক বলল, "মেয়েটার বাপ মহা কঞ্জুষ।"

মন্টে এবার প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজতিলকের ঘাড়ে, "শালা তাতে তোর কী?"

রাজতিলক ঢোঁক গিলল। একটু থেমে বলল, "সুরবীণা আমার কলেজের জুনিয়র ছিল। প্রথমদিকে আমাদের মধ্যে একটা রিলেশন তৈরি হয়েছিল। ব্যস ওইটুকুই!"

আবীর চিরকালের মাথাগরম, ও এবার আর চুপ করে বসে থাকতে পারল না, এগিয়ে গিয়ে রাজতিলকের কলার চেপে ধরল, একটা বিশ্রী গালাগাল দিয়ে বলল, "ওইটুকু যখন, তখন তুই মেয়েটার পেছনে এমন লেগেছিস কেন কুত্তার বাচ্চা? তোকে আমাদের স্কুলের ছেলে ভাবতে ঘেন্না করছে!"

রাজতিলক নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল না। কিন্তু কোনো উত্তরও দিল না। গোঁজ হয়ে তাকিয়ে রইল নীচের দিকে। আবীর আবার কিছু বলতে যাবে, এমন সময় পেছনের দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে ঢুকল একজন দশাসই চেহারার মহিলা। হাতে একটা কেটলি আর কয়েকটা মাটির ভাঁড়।

সশব্দে কেটলিটাকে মেঝেতে বসিয়ে ভাঁড়গুলোতে একে একে চা ঢেলে দিল, তারপর বেরিয়ে যাওয়ার আগে কোমরে হাত দিয়ে রাজতিলকের দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, "পাঁচশো সত্তর হল কিন্তু!"

"চা খা তোরা।" রাজতিলক বলল।

আবির আবার তেড়ে গেল, "তোর বাপকে চা খাওয়াব শালা!" তারপর আমার দিকে তাকাল, "চল রূপ, পুলিশেই যাই, হারামিটা ভাবছে মুখ টিপে বসে থেকে পার পেয়ে যাবে।"

আমি কিছু বলার আগেই রাজতিলক মুখ খুলল, "যেতে পারিস। কোনো লাভ হবে না। সব সেট করা আছে।"

"মানে?" আবির হাঁ হয়ে গেল।

"গিয়ে দ্যাখ না। কিছুতেই ডায়রি নেবে না। পাশের ব্যাঁটরা থানা, ওদিকে হাওড়া সদর থানা, যেখানে খুশি যেতে পারিস।" রাজতিলক একটা লম্বা নিশ্বাস নিল, "সুপ্রতিম লাহিড়ীকে সবাই সমঝে চলে।"

আমি এবার থমকে গেলাম, "সুপ্রতিম লাহিড়ী? কে সে?"

রাজতিলক আমার চোখের দিকে তাকাল, "সুরবীণার যার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে। সুপ্রতিম লাহিড়ী। উলুবেড়িয়ার নেতা।"

আমি এবার কিছু বুঝতে না পেরে আবিরের দিকে তাকালাম, দেখি ও-ও আমার দিকে একইভাবে হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে।

আমি বললাম, "বিনির বর এর মধ্যে কোথা থেকে এল?"

”সুপ্রতিমদা-ই তো আমাকে এটা করতে বলেছে। আমি কি কম্পিউটারে ওসব ছবি বানাতে পারি?” রাজতিলক মন্টের দিকে তাকিয়ে বলল।

আঠেরো

ব্লকের নাম পুলবাজার হলেও আমাদের অফিসটা বিজনবাড়িতে। এই চত্বরে তিনখানা থানা আছে, লোধমা, দার্জিলিং আর পুলিশবাজার। কাছেই রয়েছে পাট্টাবং বলে একটা মনোরম সুন্দর চা-বাগান।

মিথ্যে বলব না, শিলিগুড়ি থেকে বাসে আসার সময় মনটা প্রথমে খারাপ ছিল, কিন্তু তারপর যখন বাস থেকে দূরের পাহাড়টা দেখতে পেলাম, আনন্দে বুকের ভেতরটা কেমন নেচে উঠেছিল।

তারপর দার্জিলিং বাসস্ট্যান্ডে নেমে ট্রলি হাতে কিছুদূর হেঁটে এগিয়ে আসতেই মনটা বেশ ভাল হয়ে গেল। যতই হোক, উত্তরবঙ্গের একটা আলাদা সৌন্দর্য আছে। সরু রাস্তা, দু-পাশে ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। বাড়ির সামনে ছবির মতো সাজানো রংবাহারি ফুলের টব।

ভালো করে খেয়াল করছিলাম, আমাদের মতো মাটির টব নয়, পলিথিনের এক ধরনের টব, থরে থরে বসানো রয়েছে বাড়িগুলোর সামনের রাস্তায়, ঝুলছে কার্নিশে।

প্রতিটা টবেই অজস্র রংবেরঙের নাম না জানা ফুল ফুটে রয়েছে। একটু আগেই বোধ হয় একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, সেই বৃষ্টির জলের ফোঁটায় আরও সতেজ দেখাচ্ছে চারপাশ।

উলটোদিক থেকে কলকল করতে করতে একদল বাচ্চা ছেলেমেয়ে আসছে, স্কুলের পোশাকে। আমি এই একটা জিনিস আগেও খেয়াল করেছি। সমতলেও সবাই স্কুলে যায়, কিন্তু পাহাড়ি বাচ্চাদের মতো তাদের দেখতে অত সুন্দর লাগে না,

মাথার ওপরের একটা গাছ থেকে টুপ করে কয়েক ফোঁটা জল আমার গায়ে পড়তেই শরীর থেকে ক্লান্তি মুছে গিয়ে মনটা কেমন তাজা হয়ে উঠল।

মনে হল, এটাই তো জীবন! নতুন জায়গা, নতুন বাসস্থান, নতুন লোকজন। পরিবর্তনই জীবন।

ব্লক অফিসে যার কাছে জয়েন করলাম, তার নাম সসীম বটব্যাল। বয়স্ক মানুষ, রিটায়ারের আর বছর দুই বাকি। আমি এতদূর থেকে এসেছি শুনে একটু বিস্মিত হলেন, কিন্তু খুব বেশি প্রশ্ন করলেন না। এ-কথা সে-কথার পর জিজ্ঞেস করলাম, "এখানে কোথায় থাকবেন কিছু ঠিক করেছেন?"

"না এখনো তেমন কিছু ভাবিনি।" আমি উত্তর দিলাম, "আপনি আমাকে তুমি করেই বলুন সসীমদা, আমি আপনার মেয়ের বয়সি।" আমি প্রাণপণ হাই চাপতে চাপতে বললাম।

রাতে ট্রেনে একদম ঘুম হয়নি। একে একা আসছি, সঙ্গের মালপত্রের দিকে খেয়াল রাখতে হচ্ছে, তার ওপর ট্রেন শিয়ালদা ছাড়তে মনটা সত্যিই হু হু করে উঠেছিল। বাড়িতে নিজেকে ইচ্ছে করেই এই কয়েকদিন ভাবলেশহীন রেখেছিলাম, মা এমনিতেই থেকে থেকে বিলাপ করছিল, আমি তাতে ইন্ধন দিলে মা হয়তো আমাকে আর আসতেই দিত না, বলত, "তোকে আর এই চাকরি করতে হবে না, ছেড়ে দে!"

মা স্টেশনেও আমাকে ছাড়তে আসতে চেয়েছিল, আমিই আসতে দিইনি। কী হবে! মায়া যখন কাটাতেই হবে, সেটাকে টেনে নিয়ে না চলাই ভালো।

আসার আগের দিন কী করে জানিনা, দুটো টিভি চ্যানেলের রিপোর্টার ঠিক খবর পেয়ে গিয়েছিল, খুঁজে খুঁজে চলে এসেছিল বাড়ি। তখন আমি শেষমুহূর্তের গোছগাছ করছিলাম, তখন আচমকা আগমনে বিরক্তই হয়েছিলাম।

এই কয়েকদিনের ঘটনায় একটা কথা আমি বুঝেছি, মিডিয়া সুবিধা যেমন করে, অসুবিধাও কিছু কম করে না। যেটা আমি বলিইনি, সেটাও আমার মুখে বসিয়ে দিয়ে এক্সক্ল্যুসিভ করে দেয় বেমালুম।

"ভাবিনি বললে কী করে হবে!" সসীমদা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন, "একা মেয়ে থাকবে, ভালো দেখে একটা ঘর দেখতে হবে তো! কোয়ার্টার তো প্রথম কয়েকদিনের বেশি পাবে না, আর সেখানকার অবস্থাও তথৈবচ।" কথাটা বলেই সসীমদা হাঁক দিলেন, "স্বপন, অ্যাই স্বপন, কোথায় গেলি রে। এসেই কি ফুঁকতে গেছিস নাকি?"

আরও কয়েকবার হাঁকডাকের পর স্বপন এসে উপস্থিত হল, একহাতে চায়ের কেটলি, অন্যহাতে প্লাস্টিকের কাপ, কাঁধে গামছা, "ফুঁকতে যাব কেন বাবু? এসে আপনাদের জন্য চা-টা করব না নাকি? স্বপন গুছাইত কাজে ফাঁকি দেয় না, এটা জেনে রাখুন।" গজগজ করতে করতে চা ঢালে স্বপন।

"সেতো ঠিকই! তুই যে কত কাজ করিস, তা কী আমি জানিনা!" ব্যঙ্গের সুরে কথাটা বলে আমার দিকে দেখালেন, "এই দ্যাখ, নতুন দিদিমণি এসেছে কলকাতা থেকে। চা দে।"

স্বপন একগাল হাসল, "কলকাতা থেকে? নমস্কার দিদিমণি!"

আমি হাসলাম। স্বপনদার থেকে চায়ের কাপটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে চুমুক দিলাম। খিদে পেয়েছে খুব, সকালে ট্রেনে শুধু দুটো বিস্কুট খেয়েছিলাম। এখন প্রায় বেলা বারোটা।

গরম চা পেটে পড়তেই খিদেটা আরো চনমনিয়ে উঠল।

সসীমদা বললেন, "শুধু নমস্কার করলে হবে না স্বপন, দিদিমণির জন্য একটা ভালো ঘর দেখে দিতে হবে তোকে। ভালো পাড়া দেখে দ্যাখ দিকিনি একটা!"

"আচ্ছা। আজই দেখছি।" কথাটা বলে স্বপন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

"এই অফিসে কি সব স্টাফ বাঙালি নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমি আশা করেছিলাম এসে গোর্খাদেরই দেখতে পাব।

"না না। এই আমি আর স্বপনই যা বাঙালি। বাকিরা সব আসবে। এলে তোমার সাথে আলাপ করিয়ে দেব। বাড়িতে কে কে আছে তোমার?" সসীমদা জিজ্ঞেস করলেন।

"মা আর আমি, ব্যাস! বাবা অনেকদিন আগে মারা গেছেন। আপনার বাড়ি কি এখানেই?"

"আমার বাড়ি ঠিক এখানে নয়, তবে উত্তরবঙ্গেই।" সসীমদা হাসলেন, "শিলিগুড়ির নকশালবাড়িতে। নাম শুনেছ নকশালবাড়ির?"

"হ্যাঁ।" আমি বললাম, "নকশালবাড়ি থেকেই তো নকশাল আন্দোলন শুরু হয়েছিল তাই না!"

সসীমদা একটু অবাক হলেন, বললেন, ”তুমি নকশাল আন্দোলন জানো? তখন তো তুমি জন্মাওনি বোধহয়!”

”বাঃ, জানব না? জন্মাইনি তো কি, বইতে পড়েছি, চারু মজুমদার, কানু সান্যাল!” আমি বললাম।

”ঠিক বলেছ।” সসীমদা একটু উদাস হয়ে গেলেন, পাশের জানলা দিয়ে দূরে তাকালেন, ”আমাদের নকশালবাড়ির পশ্চিমদিকে সোজা চলে গেলে পড়বে মেচি নদী। সেই নদী চলে এসেছে এদিকে নেপালের সীমান্ত বরাবর। সেই নদীর পাশের একটা ছোট্ট গ্রামে আমি জন্মেছিলাম।”

”তারপর বড়ো হয়ে এদিকে চলে এসেছেন বুঝি?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সসীমদা যেন শুনতেই পেলেন না। বললেন, ”নকশালবাড়ির পুরোটাই ছিল প্রায় চা-বাগান আর চাষের জমি। আমার বাবা কাজ করতেন ওখানকার একটা টি এস্টেটে। আমাদের কিছু জমিও ছিল, কিন্তু সেগুলোর ভাগ পেতাম না।”

”নিজেদের জমি, তবু ভাগ পেতেন না কেন?”

সসীমদা এবার আমার দিকে তাকালেন, ”১৯৬৭ সালের ২৫ মে বাবা এবং আরও কয়েকজন গ্রামবাসী মিলে সেই ধানের জমির ভাগ পাওয়ার জন্য আন্দোলন করছিলেন। সারাদিন নেগোশিয়েশনের পর বাবা আর আরো আটজনকে পুলিশ গুলি করে খুন করে। সঙ্গে আমার দিদিও ছিল, তখন ও অবশ্য একদম বাচ্চা। ওকেও পুলিশ ছাড়েনি। গুলি করে শেষ করে দিয়েছিল।” সসীমদার গলাটা সামান্য কেঁপে গেল।

”তারপর?” সসীমদা থামতেই আমি বলে উঠলাম।

এই ঘটনাটা আমি কোথায় যেন পড়েছিলাম!

”আমার তখন তিন-চার বছর বয়স। পুলিশি জুলুম থেকে বাঁচতে রাতারাতি মা আমাকে পাঠিয়ে দিল মালদায়, মামাদের কাছে। সেখানেই মানুষ হয়েছি, লেখাপড়া শিখেছি, চাকরি জুটিয়েছি। তারপর এই কিছু বছর আগে ইচ্ছে করেই এদিকে ট্রান্সফার নিলাম, নিজেদের ভিটের জন্য মন কেমন করছিল। নকশালবাড়িতে পেলাম না, তবে শনি রবিবার ওখানেই চলে যাই।” সসীমদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ”তোমারও নিশ্চয়ই এখনো খুব মন খারাপ করছে মায়ের জন্য।”

আমি কিছু না বলে মুখটা নামিয়ে নিলাম।

”আমি কিন্তু তোমাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছি। রোজই তো ছবি দেখছিলাম কাগজে। তুমি কিন্তু ভেঙে পড়বে না একদম। সারাজীবন প্রতিবাদী মানুষদের কষ্ট সহ্য করতে হয়, সেই কষ্ট দাঁতে দাঁত চিপে সহ্য করতে পারলে তারাই জেতে, বুঝলে?” সসীমদা বললেন।

উনিশ

বিনি থরথর করে কাঁপছিল, ”তার মানে?”

আবীর বলল, ”তোমার হবু বড় সুপ্রতিম লাহিড়ীর টাকার লোভ বিশাল। কিন্তু সে নিজে পার্টি করে, জনদরদি নেতা। সমাজের আপদে বিপদে, মানুষের সুখ দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে কি করে নিজের মুখে টাকা চাইবে? পাড়ার লোক কী বলবে? পার্টি কী বলবে?”

বিনি সাদা চোখে তাকিয়ে ছিল সামনের দিকে, ”এটা কী করে সম্ভব!”

আবীর বলে চলল, ”সুপ্রতিমের পরিবার বেশ পুরোনোপন্থী। বিনির গায়ে শ্বেতী হয়েছে জানার পর তারা সম্বন্ধ করতে চায়নি। কিন্তু সুপ্রতিম উদারতা দেখিয়ে বলেছিল যে সে বিনিকে ভালোবেসেছে, ওকেই বিয়ে করবে। কারণ ও কোনোভাবে জানতে পেরেছিল রাজতিলকের সঙ্গে বিনির পুরোনো সম্পর্কের কথা।”

বিনির ঠোঁটটা ঈষৎ কেঁপে উঠল।

”সুপ্রতিম পাকা মাথার খেলোয়াড়। রাজতিলকের এমনিই ব্যবসা চলছে না, তার ওপর দোকানের প্রপার্টি নিয়েও শরিকি ঝামেলা রয়েছে। রাজতিলককে সেই ঝামেলা সামাল দেওয়া, পার্টির বড় পোস্ট আর আধাআধি বখরার লোভ দেখিয়ে বিনিকে ব্ল্যাকমেল করার বুদ্ধি দিল সুপ্রতিম। বিনি, তুমি মনে হয় কখনো কথায় কথায় সুপ্রতিমকে বলেছিলে যে বাবা তোমার নামে একটা বড়সড়ো অঙ্কের টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছেন?

বিনি বিমূঢ়ভাবে বলল, ”হ্যাঁ। একদিন গল্পচ্ছলে বলেছিলাম। বাবা ওই টাকাটা আমার বিপদ আপদের জন্য রেখেছেন।”

”ব্যাস, সুপ্রতিম জব্বর ফন্দি কষল। ও জানত ত্রিশ লাখ টাকা চাইলে তুমি দরাদরি করে সেই কুড়ি লাখই দেবে। আর এটা এমন একটা প্ল্যান যাতে এক ঢিলে তিনটে পাখি মারা যাবে। একদিকে লক্ষ্মীলাভ, একদিকে পার্টি এবং মানুষের কাছে নিজেকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা, আর অন্যদিকে বিনির কাছে স্বামী হিসেবে নিজের ইমেজ আকাশপ্রমাণ করে তোলা।” আবীর থামল।

বিনি এবার দু-হাতে মুখ ঢেকে জোরে কেঁদে ফেলল।

আমরা আগেই আন্দাজ করেছিলাম এমন একটা কিছু ঘটবে। আমি বললাম, ”দ্যাখ বিনি, এখন কাঁদার সময় নয়। তুই আমাদের সঙ্গে চল এখন।”

বিনি কাঁদতে কাঁদতে দু-পাশে মাথা নাড়ল, ”আমি কোথাও যাব না। তোমরা আমার অনেক উপকার করেছ, এই ঋণ আমি কোনোদিনও শোধ করতে পারব না। তোমরা এখন চলে যাও।”

”চলে যাওয়ার জন্য তো এত কাণ্ড করিনি বিনি!” আবীরের হাতের সিগারেটটা শেষ হয়ে আসছিল, ওটাকে এককোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ও বলল, ”তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতেই হবে। অপরাধীকে শাস্তিটা দিতে হবে না?”

”কী শাস্তি?” বিনি জলভরা চোখে তাকাল, ”কোথায় যাব?”

"থানায়। রাজতিলক সব সত্যি কথা বলতে রাজি হয়েছে, কারণ এমনিই ও ধরা পড়বে, বরং সত্যিটা বললে ওর শাস্তি অনেক কমে যাবে। সুপ্রতিম লাহিড়ী উলুবেড়িয়ার নেতা, হাওড়ার থানাগুলো হয়তো ডায়রি পেয়েও কিছু করবে না। তুমি উত্তরপাড়ার মেয়ে, তুমি উত্তরপাড়ায় ডায়রি করবে। তেমন হলে আরও দূর যাব, তবু ওই মুখোশপরা শয়তানটাকে ছাড়ব না। চলো আমাদের সঙ্গে।" আবীর বলল।

বিনি আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ কেঁদে গেল।

তারপর রুমালে চোখমুখ মুছে বলল, "ছেড়ে দাও তোমরা। অন্যকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, আমার কপালের দোষ এটা। নাহলে সব প্রতারণা আমার সঙ্গেই কেন হয়! এমনিতেই জানিনা এই বিয়ে ভাঙার খবর শুনিয়ে বাবাকে বাঁচাতে পারব কিনা! তার ওপর থানাপুলিশ করলে সারা পাড়া জানাজানি হয়ে যাবে, ঢি ঢি পড়ে যাবে। আমার জীবনটা তো শেষ হবেই, বোনেরও বিয়ে হবে না।"

"তা বললে তো হয় না!" আবীর কড়া গলায় বলে উঠল, "আগেকার দিনের মেয়েদের মতো কথা বোলো না বিনি! আধুনিক হও একটু। লোকে কী বলবে সেইজন্য তুমি একটা ক্রিমিন্যালকে ছেড়ে দেবে? সুপ্রতিম নিজে ওই বিকৃত ছবিগুলো বানিয়ে রাজতিলককে পাঠিয়েছিল। পুলিশ আইপি অ্যাড্রেস ট্র্যাক করলেই ধরা পড়বে, রাজতিলকও সব খুলে বলবে। এইরকম জঘন্য একটা লোককে ছেড়ে দেওয়ার কোনো মানেই হয় না। আজ তোমার সঙ্গে এমন করেছে, শাস্তি না পেলে পরে আরও কোনো মেয়ের সঙ্গে করবে।" আবীর এবার এগিয়ে এসে আলতোভাবে হাত রাখল বিনির কাঁধে।

নরম গলায় বলল, "আর ... আমি, মানে আমরা সবাই তো রয়েছি তোমার সাথে। ভয় কিসের?"

আমি এবার অপরাধীর গলায় বললাম, "আমার খুব খারাপ লাগছে রে, কাল সকালে যেতে পারব না বলে। বিনি, তুই কিছু ভাবিস না। আবির আছে, ও-ও তোর দাদার মতো, ও তোর পাশে থাকবে।"

আজ রাতেই আমাদের দার্জিলিং মেল। রাজতিলককে আগে থেকেই বলা ছিল, পরের দিন সকালে সবাই মিলে উত্তরপাড়া থানায় যাওয়া হবে। প্রথমেই সব স্বীকার করতে রাজতিলক গাঁইগুই করছিল, কিন্তু মন্টের দাবড়ানিতে রাজি হয়েছে, তা ছাড়া ওর নিজের মনেও ভয় আছে। বেচারা টাকা আর ওই সব ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসার লোভে করে ফেলেছিল কাজটা, কিন্তু বুঝতে তো পেরেছে কত বড়ো বাজে কাজ এটা!

আবির আমার কাঁধে হাত রাখল, "ভাই তুই চলে যা তাহলে!"

আমি অবাক হলাম। দুজনেই নিজের নিজের অফিস থেকে এসেছি, বিনিকে হাওড়া থেকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বাড়ি ফিরব এমনই কথা ছিল।

বললাম, "তুই যাবি না?"

আবীর আমার দিকে সরে এসে চাপাগলায় ফিসফিস করল, "মেয়েটা এত ভেঙে পড়েছে, ওকে একটু বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি, বুঝলি! তুই যা ভাই, দেরি করিস না।"

আমার একটু খারাপ হচ্ছিলো, আসল সময়টাতে থাকতে পারব না বলে, আমি আমতা আমতা করে বললাম, "কাল থাকলে ভালো হত। তোর ওপর পুরোটা এসে ...!"

"আরে না না ঠিক আছে।" আবীর আলতো চাপড় দিল কাঁধে, "তুই ভালো করে ঘুরে আয়, কোনো চিন্তা করিস না। আমি কাল সকালে ফোন করে তোকে আপডেট দেব।"

আমি মাথা নেড়ে বেরিয়ে এলাম। আবীরের আমার চেয়ে একটু বেশিই উৎসাহ লক্ষ করছি দুদিন ধরে।

কিন্তু চিরকালই আমি চাপা গোছের, চট করে মুখে কোনো উত্তর আসে না।

দূর থেকে দেখলাম আবির আর বিনি পাশাপাশি হাওড়া ব্রিজের দিকে চলে যাচ্ছে।

আমার হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে হল, আজ প্রায় এক সপ্তাহ হয়ে গেল দিওতিমার কোনো খোঁজ পেলাম না।

না মানে, খোঁজ যে পেতেই হবে তেমন কোনো ব্যাপার নেই, তবু এমনি মনে হল আর কী! সেই যে সেদিন বাসে দেখা হল, তারপর থেকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছি, মেসেজ করেছি, কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি। বিনিকে একবার জিজ্ঞেস করলে হত, ওদিকেই তো থাকে! যদিও বিনি ওকে তেমন পছন্দ করে না বলেই মনে হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার মনে হল, ধুর, বিনিকে শুধু শুধু জিজ্ঞেস করতে যাব কেন! একে বেচারি এতবড় ধাক্কা খেয়েছে, কাটিয়ে উঠতে সময় লাগবে। তবু ভালো যে টাকাটা বেঁচে গেছে, আর তা ছাড়া যে বিয়ের আগেই এতবড় ক্রাইম করতে পারে বিয়ের পর বিনির জন্য আরও কী কী সব অপেক্ষা করছিল কে জানে!

আমি মনে মনে মা মঙ্গলচণ্ডীকে ধন্যবাদ দিলাম।

একটু পরেই জিষ্ণু ফোন করল, "কি ভাই, সব গোছগাছ কমপ্লিট?"

"ওই মোটামুটি। টুকটাক কিছু বাকি আছে, গিয়েই গুছিয়ে নেব। আজ এলি না কেন?" আমি বললাম।

জিষ্ণু আজ অফিস আসেনি। আমিও বিনির সঙ্গে দেখা করব বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়েছি। ও বলল, "আর বলিস না। একটা কাজ পড়ে গিয়েছিল। আমি সোজা স্টেশন চলে যাব। তুই বেশি লাগেজ করিসনি তো? মানেভঞ্জন থেকে পুরোটা ট্রেক করে উঠব তো তাই বলছি।"

"না না! আমার একটাই রুকস্যাক, পিঠে নিয়ে নেব।" আমি বললাম। আজ রাতে আমাদের ট্রেন। বাড়িতে এখনো অবধি শুধু মা-কে বলেছি, বাবা যে বারণ করলেও আমি এবার আর শুনব না সেটাও বলে দিয়েছি।

মা কিছু বলেননি, গুম হয়েছিলেন।

অনেকক্ষণ বাদে বলেছিলেন, "এখন ওদিকে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, বর্ষার সময় পাহাড়ে ...!"

"বৃষ্টির ছিটেফোঁটা নেই, গরমে পচছে সবাই আর তুমি বলছ বৃষ্টি!" আমি বলেছিলাম।

মা তখন সেদিনের কাগজটা নিয়ে এসে চোখের সামনে মেলে ধরেছিলেন, "এই দ্যাখ, এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না তো কী হয়েছে, পাহাড়ে ভালো বৃষ্টি হচ্ছে।" তারপর মা একটু থেমে বলেছিলেন, "পুজোর পর গেলে হয় না? তোর বাবারও চাপটা একটু কমবে আর ওয়েদারটাও...!"

আমি কাকুতির ভঙ্গিতে বলেছিলাম, "মা! এই প্রথম বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও যাচ্ছি। প্লিজ তুমিও বাধা দিও না।"

মা চুপ করে গিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে বলেছিলেন, "সাবধানে যাস।"

এখন মা-র কথাগুলো মনে পড়তেই চোখ গেল ঈশান কোণের দিকে, কালচে মেঘ জমাট বেঁধেছে। ঢালুক একটু, এই বিশ্রী গরম থেকে বাঁচা যাবে। আমার সঙ্গে ছাতা নেই, জলদি পা চালালাম।

মনে বেশ আনন্দ হচ্ছে, এই প্রথম বন্ধুদের সঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি।

ঠিক করলাম, বেরনোর সময় বাবাকে বলে বেরিয়ে যাব।

আচ্ছা, একবার দিওতিমাকে ফোন করে জানালে কেমন হয়? চিন্তাটা মাথায় আসতেই আশ্চর্য লাগল, কী মুশকিল, খামোখা অজানা অচেনা দুদিনের আলাপ একটা মেয়েকে ফোন করে আমি আমার ঘুরতে যাওয়ার কথা জানাতে যাব কেন?

সব কেন-র কোনো উত্তর হয় না।

আমি দিওতিমাকে ফোন করলাম। আর এবারেও সেই একই ব্যাপার। রিং হয়ে হয়ে কেটে গেল।

কী ব্যাপার? ফোন টোন ধরে না কেন? কোনো সমস্যা হয়নি তো? বিনিকেও জিজ্ঞেস করা হল না।

আর কে জানতে পারে ওর খবর?

মিনিট দশেক বাদে কী মনে হল, ঝন্টুকে ফোনটা করেই ফেললাম। যদিও ওই ছেলেটাকে আমার একদম পোষায় না। এমনিতেই সেই ঘটনার পর থেকে বাবার সঙ্গে আমার একবারও আর কোনো কথা হয়নি, তার ওপর জগদীশকাকা সব ব্যাপারে এই বাজে ছেলেটাকে ইনভলভ করছেন। পুজো, সংগঠন, কোথাও বাদ দিচ্ছেন না।

বাবাও প্রথমে আমাকে দিওতিমার ওপর নজরদারি চালানোর ভার দিলেও পরে ওই ঝামেলার পর ঝন্টুই সব দিক সামাল দিচ্ছে।

আমার কেমন জানিনা মনে হচ্ছে, রাগের বশে বাবা খাল কেটে কুমির ঢোকাচ্ছেন ঘরে। জগদীশকাকা-কে আমার কোনোদিনই সুবিধের মনে হয় না, আমি সক্রিয়ভাবে ব্যবসা বা সংগঠন কোনোটাই করিনা ঠিকই, কিন্তু যেটুকু খবর রাখি, আমার মনে হয়, মেজোকাকার চেয়েও যাতে বাবা জগদীশকাকাকে বেশি প্রাধান্য দেন, জগদীশকাকা সারাক্ষণ সেই চেষ্টাই করেন। গত দশবছরে সকলের অগোচরে ব্যবসা এবং সংগঠন, দুটোরই কান্ডারি যেন হয়ে উঠছেন জগদীশকাকা, বাবা সবার ওপরে থাকলেও দোকানের প্রতিটা কর্মচারী থেকে শুরু করে সংগঠনের জেলাস্তরের নেতারাও জানে যে জগদীশকাকার কথাই শেষ কথা।

এই যে ঝন্টু মল্লিকের মতো রাজনীতির লোকগুলোকে ঢোকানো হচ্ছে, এর পেছনেও জগদীশকাকা।

আমি আগে দু-একবার বাবাকে বলেছিলাম, বাবা যে একেবারে গুরুত্ব দেননি তা নয়, কিন্তু ওই পর্যন্ত। কাজের কাজ কিছু কি হচ্ছে? দিনের পর দিন কচুরিপানার মতো দলে ঢুকে পড়ছে ঝন্টুর সাকরেদরা, তা কি বাবা দেখতে পাচ্ছেন না?

যাই হোক, ঝন্টু ফোনটা রিসিভ করতেই আমি বললাম, "কে ঝন্টু? আমি মঙ্গলরূপ বলছি, ভটচাজবাড়ি থেকে।"

"আরে রূপদা, বলুন কী খবর!" আমি ফোনের এপাশ থেকেও যেন ঝন্টুর হলদে দাঁতগুলো দেখতে পেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ে গেল, এই ঝন্টুই সম্ভবত দিওতিমার কাছে আমার গোবর নামটা ফাঁস করেছিল।

আমি গম্ভীরগলায় বললাম, "ওদিকের খবর কদ্দুর?"

"কোনদিকের বলুন তো?" ঝন্টু বুঝতে পারল না।

"আরে ওই যে মেয়েটা, পুজো পুজো করে লাফাচ্ছিল, আমি কোর্টে গিয়ে কথা বললাম!" আমি যতদূর সম্ভব নিজেকে নিরাসক্ত দেখানোর চেষ্টা করলাম।

"ওহ ওই দিওতিমা!" বাস-ট্রামের হর্ন ছাপিয়ে ঝন্টু চেঁচাল, "আর কোনো চিন্তা নেই রূপদা, কেস একদম সাল্টে দিয়েছি। আরে ঝন্টু কোনো কাজের ভার একবার নিলে আর কোন টেনশন নেবেন না দাদা। জমিয়ে পুজো করবেন এবারে, কোনো লাফড়া নেই।"

আমি বললাম, "কেস সাল্টে দিয়েছ মানে? দিওতিমা কেস তুলে নিয়েছে?"

"আরে নানা, ওই ডেঁপো মেয়েটাকেই হাপিশ করে দিয়েছি রূপদা! হে হে!" ঝন্টুর ষাঁড়ের মতো গলা ভেসে এল।

নিজের অজান্তেই আমার গলাটা কেমন তুতলে গেল, "মা-মানে? হাপিশ করে দিয়েছ মানে? কী করেছ মেয়েটার?"

ওপাশ থেকে ঝন্টু কী বলল বুঝলাম না, চার-পাঁচবার হ্যালো হ্যালো করেও কিছু শুনতে পেলাম না।

এইসময়েই নেটওয়ার্কটা চলে যেতে হল?

রাগে, হতাশায় আমার মনে হল হাওড়া ব্রিজ থেকে ফোনটাকে ছুঁড়ে নদীতে ফেলে দিই!

দূরে আর্মেনিয়ান ঘাটের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, কোথায় গেল দিওতিমা?

কুড়ি

ছবিদাদু ফোনের ওপার থেকে বললেন, "অত উতলা হোসনা। রাজেন সমাদ্দার লড়ে যাচ্ছে।"

আমি হতাশ গলায় বললাম, "সমাদ্দার লড়লে কী হবে। আমিই তো চলে এলাম!"

"চলে গিয়েছিস তো কী হয়েছে? ঝড়টা তো তুলে দিয়ে গিয়েছিস, সেটাই যথেষ্ট। কাল বিধানসভা অধিবেশন চলার সময় একটা দলিত সংগঠন প্রতিবাদসভা আয়োজন করেছিল তোকে সমর্থন করে। বলেছে মেধার ভিত্তিতে পুজো করার লাইসেন্স চালু করতে হবে।" ছবিদাদু বললেন।

"তাই?" আমি উৎসাহভরে জিজ্ঞেস করলাম।

"তবে আর বলছি কী! সব জায়গা থেকেই চাপ বাড়ছে। একটা কাগজ আবার তোর এই ট্রান্সফার নিয়েও লিখেছে, যে অন্যায়ের শিকার হতে হয়েছে তোকে। এখানে আয়, সব বলছি। তোর ট্রেন ক-টায়?" ছবিদাদু গলার স্বর পালটে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি সসীমদার দিকে তাকালাম। একটা খবরের কাগজে মুখ গুঁজে বসে আছেন সসীমদা, চোখাচোখি হতেই বলে উঠলেন, "আর দেরি কোরো না, ওদিকের রাস্তা একদম ভালো নয়। কাল রাত থেকে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। সেবক রোড বন্ধ হয়ে গেলে মুশকিলে পড়বে। এইবেলা বেরিয়ে যাও।"

আজ শুক্রবার। একটু পরেই আমি বেরিয়ে যাব, আজ রাতের ট্রেনে যাব কলকাতা। আগের সপ্তাহেই এসেছি সবে, তবু মনে হচ্ছে যেন কতদিন বাড়ি ছেড়ে রয়েছি এখানে!

এমনিতে এখানে জীবনযাত্রা খুব শান্ত। আমার ওপর কাজ এখনো তেমনভাবে অ্যালট হয়নি, ফলে অফিসে হালকাই থাকি বেশ। বেশ কিছু বই নিয়ে এসেছি সঙ্গে। ছবিদাদুও কিছু বই কিনে দিয়েছিলেন। সেগুলো পড়ি।

থাকার ঘর একটা ভালোই পেয়েছি। ব্লক অফিস থেকে খুব দূরে নয়। স্বপনই ঠিক করে দিয়েছে। দোতলা বাড়ি, ওপরে বাড়িওয়ালি ভদ্রমহিলা থাকেন। তিনি গোর্খা, কিন্তু ভাঙা ভাঙা বাংলাও বলতে পারেন। আমাদের অফিসে আগে যত বাঙালি কর্মচারী আসতেন, ওঁর বাড়িতেই নাকি ভাড়া থাকতেন। সেই থেকেই বাংলা শেখা। মহিলা একাই থাকেন, স্বামী বহুদিন হল গত হয়েছেন, নিঃসন্তান। নীচে আমি। রোজকার ঠিকে কাজের জন্যও একটা মেয়ে পেয়েছি, নীচের দিকে একটা গ্রামে থাকে।

সব জায়গাতেই থিতু হয়ে বসতে একটু সময় লাগে, আমারও লাগছে। কিন্তু এখানকার প্রকৃতি এত সুন্দর লাগলেও অফিস থেকে ফেরার পর মনটা ভারী হয়ে থাকছে। যাদের ভুলেও ফোন করতাম না, তাদের ফোন করছি, এটা সেটা কথা বলছি।

একদিন বিনিকেও ফোন করেছিলাম। ও যতই মুখ ফিরিয়ে থাকুক, আমার ছোটবেলার বন্ধু, তার ওপর ক-দিন বাদেই বিয়ে হয়ে যাবে, ভেবেছিলাম মিটিয়ে নেব ঝগড়াটা।

সত্যিই তো, আমাদের ঝগড়াটার তো কোনো গুরুতর কারণ ছিল না, এমনিই মাথাগরমের মনোমালিন্য।

কিন্তু বিনি আমার ফোনই তোলেনি।

দু-একবার ভেবেছি মঙ্গলরূপকেও ফোন করি। ছেলেটা আমাকে অনেকবার ফোন করেছিল। কিন্তু, শেষপর্যন্ত বিনির এড়িয়ে চলার জন্যই আর করলাম না।

রাতে যখন একলা ঘরে শুয়ে থাকি, চট করে ঘুম আসতে চায় না, তখন কখনো কখনো আচমকা মনের গভীরে মঙ্গলরূপের ছবি ভেসে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে বিনির ওপর রাগ ওঠে, কেন জানিনা।

এই নিয়ে নিজের মনকে অনেক প্রশ্ন করেছি। অদ্ভুত তো! বিনি কোথাকার কোন ছেলেকে বিয়ে করছে তা নিয়ে আমার রাগ উঠছে কেন?

মন তক্ষুনি বলেছে, ”বিনি কেন মঙ্গলরূপকে বিয়ে করবে?”

”কেন করবে না?” আমি আরও অবাক হয়ে মনকে প্রশ্ন করি, ”বিনির বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছে মঙ্গলরূপের সঙ্গে। দুজনেই ব্রাহ্মণ, তার ওপর গোঁড়া পুরোনোপন্থী অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলেমেয়ে। বেশ মিল হবে। ওই বসন্ত ভটচাজের বাড়ির অন্দরমহলে ঘোমটা টেনে বিনি বসে থাকবে। ওটাই তো ওদের মতো ভীতু মেয়েদের জীবন!”

মন বলেছে, ”কিন্তু মঙ্গলরূপ তো তোমার প্রশংসা করেছিল। বলেছিল তুমি প্রশংসনীয় কাজ করছ। কই, ও তো তেমন প্রাচীনপন্থী নয়!”

”আলবাত প্রাচীনপন্থী! ও নিজে যাই হোক, ওর বাবার জন্য ওর নিজের কোনো ভয়েস আছে নাকি বাড়িতে? ওদের বাড়িতে বাবা যা বলেন সবাই তাই করে। প্রশংসা করতে হয় সে এমনিই করেছিল। নাহলে কোনো অব্রাহ্মণ কায়স্থ মেয়েকে বিয়ে করার সাহস ওর হত কোনোদিন?”

”অব্রাহ্মণ মেয়ে!” মন অবাক, ”কার কথা বলছ!”

”কারুর কথাই বলছি না।” আমি নিঃশব্দে উত্তর দিয়েছিলাম, ”সেই তো জাত, বংশ দেখে বিয়ে করতে যাচ্ছে!”

নীচের একটা স্ট্যান্ড থেকে বাস চলে টানা শিলিগুড়ি টাউন অবধি, সময় লাগে ঘণ্টাতিনেক। আমি হাতে অনেকটা সময় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বাসের জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে বলা যাচ্ছে না। এদিকে বেশ ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

দার্জিলিং জায়গাটাই যেন কেমন মনকেমন করা। চুপচাপ বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমি ভাবছিলাম। এই কয়েকদিনে কিছুই ঘোরা হয়নি, শুধু অফিসের পরে হাঁটতে হাঁটতে একদিন ম্যাল পেরিয়ে গভর্নর রোডের দিকে গিয়েছিলাম। ওই দিকটা তুলনামূলকভাবে বেশ নির্জন।

শিলিগুড়ির দিকে কাল রাত থেকে টানা বৃষ্টি হলেও এখানে ভোরের দিকে এক পশলা হয়েই থেমে গেছে। কিন্তু সেই বৃষ্টির গুঁড়ো এখনো লেগে আছে গাছের সবুজ পাতাগুলোয়।

যতদূর চোখ যায় সরু মাখন পিচের রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে দূরে, নীল আকাশ এসে মিশেছে সেই দূরের দিগন্তে। বন্ধ দোকনগুলো নরম রোদে ঝকঝক করছে, আর রাস্তার দু-পাশের নাম না জানান হরেক রকমের বুনো গাছের পাতাগুলো অল্প হাওয়ায় দুলছে তিরতির করে।

আমি এক হাতে ট্রলিটাকে শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। সকাল থেকে মা তিনবার ফোন করেছে। প্রতিবার একই কথা, "কিরে কখনো বেরোচ্ছিস? সাবধানে আসবি কিন্তু! খবরে দেখাচ্ছে উত্তরবঙ্গে নাকি খুব বৃষ্টি হচ্ছে। মালদা পুরো ভেসে যাচ্ছে।"

আমি হেসে বলেছি, "হ্যাঁ রে বাবা, সাবধানেই আসব। আমি তো আর মালদায় থাকি না। আমাদের এদিকে নো বৃষ্টি। তুমি কাল সকালে ওই কুমড়োর ছক্কাটা কোরো কিন্তু আমি দশটার মধ্যে ঢুকে যাব!"

এখন মায়ের কথাগুলো ভাবতে ভাবতে আমার মুখে একচিলতে হাসি ফুটে উঠল। সত্যি, মা যতই আমাকে বকুনি দিক, এখানে আসার পর থেকে মায়ের অভাবটা যেন খুব বেশি করে বুঝতে পারছি। অফিস থেকে তেতেপুড়ে এসে ঘরের সব কাজ আমাকেই করতে হচ্ছে, জামাকাপড় ভাঁজ করা, ধুয়ে যাওয়া বাসনকোসন রান্নাঘরে তুলে রাখা, মনে করে জলের বোতল ভরা, সব।

মা ছাড়া জীবন কেমন যেন নুন ছাড়া আলুমাখার মতো। পেট ভরছে, কিন্তু মন ভরছে না।

আমি মনে মনে ঠিক করলাম, আর কিছুদিন থিতু হই, তারপর মা-কে নিয়ে চলে আসব এখানে। অরূপ কাঞ্জিলাল এখনো আশায় আশায় আছে, আমি বুঝি গিয়ে ওর পায়ে পড়ব এখান থেকে সরানোর জন্য। হুহ! আমাকে তো চেনে না, লাইসেন্স চালু হোক আর না হোক, কিছুতেই মাথা নোয়াবো না আমি। দরকার হলে এই পুলবাজারেই সারাজীবন কাটাব, তবু ভালো!

চিন্তা ভাঙল আচমকা ফোনে। দেখি ছবিদাদু ফোন করছেন। এই তো একটু আগেই কথা হল, এখন আবার কী হল!

ফোন রিসিভ করে কানে দিতে না দিতেই দাদুর গলা শুনতে পেলাম, "বসন্ত ভট্টাচার্যের গুন্ডাটার কী নাম রে?'

"ওই তো, ঝন্টু না কী নাম যেন!" আমি বললাম, "কেন, কী হয়েছে?"

"আরে ছেলেটা অতি বদ জানিস তো! কাল রাতে সমাদ্দার উকিলের বাড়িতে ঢিল মেরে জানলার কাচ ফাটিয়েছে, সমাদ্দার নাকি তখন বাথরুমে, দেখতেও পেয়েছে চার-পাঁচটা ছেলেকে গুন্ডামি করতে।"

"সেকি!" আমি বললাম, "কী করে বুঝল যে ওরাই ছিল? সমাদ্দার কি ঝন্টুকে চেনে নাকি? অন্য কেউও তো হতে পারে! মানে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে!"

"ঢিলগুলো চিরকুট দিয়ে মোড়ানো ছিল। সেই চিরকুটে লিখেছে, পুজোর ব্যাপারে মাতব্বরি বন্ধ কর, নাহলে বুল্টুর লাশ দেখার জন্য তৈরি হ' রাজেন সমাদ্দার!"

"এই বুল্টুটা কে?" আমি বললাম। এই নামটা কখনো শুনিনি আগে।

"সমাদ্দারের পাঁচ বছরের ছেলে।" ছবিদাদু একটু থেমে বললেন, "সমাদ্দার চিরকুটগুলো নিয়ে থানায় গেছে।"

"ঠিক করেছে!" আমি বলতে বলতে শূন্যে একটা ঘুষি ছুঁড়লাম, "ওই ঝন্টু মস্তানটার বাঁদরামি না চাবকে সোজা করে দিতে হয়!"

"আরে পুরোটা শোন।" দাদু বললেন, "সমাদ্দার থানায় গেছে ঠিকই, কিন্তু এই কেস আর লড়বে না বলছে।"

"অ্যাঁ! কেস লড়বে না!" আমি হতাশ গলায় বললাম, "কেন? আ-আমি তো আসার আগেই পুরো ফিজ দিয়ে এলাম!"

"তোর ফিজ ফেরত দিয়ে দেবে বলেছে।"

"সেটা কথা নয়।" আমার এবার গলা চড়ে গেল, "উকিলদের তো অনেকেই হুমকি টুমকি দেয়, তাই বলেই অমনি ভিতুর মতো ছেড়ে দিতে হবে? এ এবার কেমন লোক!"

"ওরে, এ তো তেমন বাঘা উকিল নয়, এমনি গোবেচারা লোক, কিন্তু কাজটা ভালোই করছিল। ছোটবেলায় আমি ওকে পড়াতাম, খুব গরিব ছিল, আমি হেল্প করতাম বলে এখনো খুব শ্রদ্ধাভক্তি করে, তাই এত কম ফিজে রাজি হয়েছিল। আসলে ছেলেকে নিয়ে ভয় দেখিয়েছে তো, ভয় পেয়ে গেছে।" ছবিদাদু চিন্তিত স্বরে বললেন, "যাকগে, তুই আগে আয়, তারপর দেখছি কী করা যায়!"
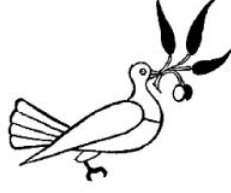
একুশ

ট্রেন শিয়ালদা ছাড়া মাত্র মনটা কেমন দুলে উঠল ভেতরে, আনন্দের মাঝেও মেঘের মতো মনখারাপটা ফিনকি দিয়ে উঠে আসতে শুরু করল গলা দিয়ে।

এই প্রথম বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে যাচ্ছি।

শুধু তাই নয়, এই প্রথম বাবার আদেশ অমান্য করলাম আমি।

আসার সময় রুকস্যাক কাঁধে বাবাকে বলতে গিয়েছিলাম। বাবা তখন যথারীতি আমাদের ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাহ্নিকে ব্যস্ত ছিলেন।

আমি মৃদু স্বরে বলেছিলাম, ”বাবা, আসছি।”

বাবা মুখে একটাও কথা না বলে আমার দিকে চেয়েছিলেন। আমি মিনিটদুয়েক দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে আসতেই বৈঠকখানা ঘরে আমাকে চেপে ধরেছিলেন জগদীশকাকা, ”ছি ছি বাবা রূপ, তোমার কাছে এটা আমি আশা করিনি!”

আমি থেমে গিয়েছিলাম, ”কি আশা করেননি?”

”পুজোর আর দশদিনও বাকি নেই। কাল মহালয়া। এই সময় বাড়িতে এত কাজ, সংগঠনের দায়িত্ব, তার ওপর সদস্যদের বিপদ, এইসময়ে কোথায় তুমি উপযুক্ত পুত্র হিসেবে বাবার কাঁধে কাঁধ মেলাবে, তা নয়, তুমি কিনা ঘুরতে যাচ্ছ!”

জগদীশকাকার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল আমি বোধ হয় কাকার কিডনি বিক্রি করতে যাচ্ছি।

আমার ইচ্ছে হল বলি, তা আমাকে কোন কাজে ঠিকমতো ইনভলভ করা হয়েছে জগদীশকাকা? যখন যা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, আমি পালন করেছি। তা সত্ত্বেও অহেতুক অপমান, ব্যঙ্গবিদ্রুপ করা হয়েছে আমায়।

আমি বাবাকে বলেছিলাম যাতে ঝন্টুর মতো ছেলেদের পুরোহিত সংগঠন থেকে দূরে রাখেন। এই তো আজকের কাগজেই পড়লাম দিওতিমার ওই উকিলের বাড়ি ঢিল মেরে হামলা করেছে ওরা, উকিলটা থানায় গিয়ে নালিশ করেছে। মেয়েটার ব্যাপারে তো কোনো আপডেটই নেই। এই ধরনের অসভ্যতা আমাদের লোকেদের পক্ষে সাজে কি? ওরা কি এইসব করে আমাদের ভাবমূর্তিটাই নষ্ট করছে না?

বাবা সে-কথা তো শোনেনেই নি, উলটে আমার চেয়ে বেশি ওদের ওপর ভরসা করেছেন। আমার নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল কি?

শুধু ঝন্টুকেই বা দোষ দিই কেন, এই যে জগদীশকাকা, ইনিই যে আস্তে আস্তে বাবার ডানহাত হওয়ার সুযোগ নিয়ে আমাদের সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠনটার মধ্যে পার্টির লোক ঢুকিয়ে চলেছেন, সেটা কি আর আমি বুঝি না?

আর তা ছাড়া আমার নিজের একটা জীবন আছে, সেটা আমাকে কাটাতে দেওয়া হোক।

কিন্তু এত কথা জিভের ডগায় এলেও আমি কিছুই বলতে পারিনি। শুধু নতমুখে কিছুক্ষণ অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম।

মা আর মেজকাকিমা ওপরের বারান্দা থেকে বলেছিলেন, ”সাবধানে যাস!”

ট্রেনে জানলার ধারে বসে আনমনে এই সবই ভাবছিলাম, হঠাৎ গৈরিক কাঁধে চাপড় মারল, ”কি ভাই, তুই কি কলকাতা ছাড়ছিস বলে সাধু হয়ে গেলি নাকি? তখন থেকে পুরো মিউট মোডে রয়েছিস! কথাবার্তা বল! এই নে, চা খা।” গৈরিক চায়ের কাপ এগিয়ে দিল আমার দিকে।

শেষমেশ আমরা চারজনই যাচ্ছি। আমি জিষ্ণু গৈরিক আর চিরন্তন। গৈরিক আর চিরন্তন জিষ্ণুর বন্ধু হলেও আমার সঙ্গে আগে থেকে আলাপ ছিল। দুজনেই হুল্লোড়বাজ ছেলে, জিষ্ণুরই মতো।

চিরন্তন হাত উলটে বলল, ”ওহ, অবশেষে আমার একটা স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে। হাতে ক্যাম্পিং ম্যালেট আর বরফ ভাঙার কুড়ুল, মাথায় হেলমেট, সঙ্গে হারনেস, র‍্যাপেল ডিভাইস …!”

”কী সব বকছিস বলতো তুই!” জিষ্ণু ভ্রূ কুঁচকে বলল।

”আরে মাউন্টেনিয়ারিং এ এগুলো তো সব লাগবে। দেখবি বেস ক্যাম্পেই দেবে। ওহ কবে থেকে ইচ্ছে ছিল মাইরি, ছন্দা গায়েনের মতো একটা শৃঙ্গ জয় করতে যাব!” চিরন্তন চোখ বুজে মাথা দোলাল।

”বেস ক্যাম্প! শৃঙ্গ! আরে আমরা কী এভারেস্ট জয় করতে যাচ্ছি নাকি!” গৈরিক এক দাবড়ানি দিল, ”সান্দাকফু যেতে গেলে শুধু পাহাড়ি রাস্তায় হাঁটতে হয় বস! ওর থেকে অমরনাথ যাওয়া সোজা। হু!”

চিরন্তনের মুখটা মুহূর্তে চুপসে গেল, ”অ্যাঁ! ওইসব ওসব কিছু লাগবে না?”

”না।” গৈরিক বলল, ”পেট খারাপের ওষুধ নিয়েছিস তো? ওইটে লাগতে পারে। পাহাড়ি রাস্তা, দুমদাম পেট গোলমাল শুরু করে দেয়। আর কিচ্ছু লাগবে না চাঁদ!”

সবাই হাসছিলাম। জিষ্ণু গম্ভীর হয়ে গেল, ”নাহ! আমার পুরো ইটিনেরারিটা বিশদে আগেই বলে দেওয়া উচিত ছিল তোদের!” পাক্কা নেতার মতো মাথা দুলিয়ে ও বলতে শুরু করল, ”শোন। আমরা তো মাউন্টেনিয়ারিং করতে যাচ্ছি না। যাচ্ছি পাহাড়ের কোল বেয়ে ট্রেক করতে। ট্রেন থেকে নেমে একটা গাড়ি ভাড়া করে প্রথমে আমরা চলে যাব মানেভঞ্জন। সেখান থেকে সান্দাকফু প্রায় বত্রিশ কিলোমিটার। চিত্রে, লামাইধুরা, টুমলিং, গৈরিবাস এইসব ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা আস্তে আস্তে উঠব, বুঝলি?”

চিরন্তন মাথা নাড়ল এবার। বুঝেছে ও।

ট্রেন এখন ঝড়ের গতিতে দক্ষিণেশ্বর পেরোচ্ছে। আমি আবিরকে একবার ফোন করলাম, ”ভাই আমি তো চলে যাচ্ছি। খারাপও লাগছে, কালকের দিনটায় থাকতে পারছি না …।”

”আরে এত ফরম্যালিটির কিছু নেই।” বাস-অটোর আওয়াজের মধ্যে আবীরের গলা শুনতে পেলাম, ”আমি কাল সব সামলে নেব। মন্টে তিলককে নিয়ে আসবে। আমি যাব বিনিকে নিয়ে। তুই ভালোভাবে ঘুরে আয়!”

দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের দিকে চোখ পড়তেই অভ্যেসমতো হাতদুটো কপালে উঠে গেল আমার। অনেকদিন হয়ে গেল দক্ষিণেশ্বর আসিনি। আগে মা আর মেজোকাকিমা-কে নিয়ে

বছরে দু-একবার ঠিক আসতাম। আসলে অফিস শুরু হওয়ার পর থেকে বড্ড বেশি যেন ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সারাক্ষণ যে অফিসেরই কাজ তা ঠিক নয়, ভেতরে ভেতরেও যেন একটা অলসতা ঘিরে ধরছে আমায়। অফিস আর অফিসের কাজ ছাড়া কিছু করার উদ্যমটা যেন চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে।

অথচ সবাই কতকিছু করছে। এই যে দিওতিমা বলে মেয়েটা, অভাবের সংসার শুনেছিলাম, সেই দায়িত্ব পালন করছে, চাকরি করছে, আবার এমন একটা ব্যতিক্রমী আন্দোলনে একা লড়ে যাচ্ছে। সফল হবে কিনা সেটা পরের ব্যাপার, কিন্তু সমাজের একটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে, এত বড়ো গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একা লড়ে যাওয়াটা কি চাট্টিখানি ব্যাপার? অনেক জোর লাগে মনের।

দূরে বোধ হয় কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। ঠান্ডা হাওয়া এসে লাগছে আমার চোখে মুখে। চোখ বন্ধ করে সেই বাতাস অনুভব করতে করতে আমি ভাবলাম, কতদিন দিওতিমার কোনো খোঁজ নেই!

ফোনেও পাওয়া যায় না, কাগজেও ওকে নিয়ে কিছু লেখা নেই। ঝন্টুকেও তারপর থেকে ফোনে পেলাম না।

মেয়েটা ভালো আছে তো?

আমি ঠিক করলাম, সান্দাকফু থেকে ফিরে একদিন উত্তরপাড়া যাব। সে দিওতিমা যা ভাবে ভাবুক!

বাইশ

বাসটা পাহাড়ি রাস্তা ধরে বেশ চলছিল, কিন্তু করোনেশন ব্রিজে ওঠার আগে আচমকা একটা কর্কশ শব্দ করে থেমে গেল। আমি উঁকিঝুঁকি মেরে দেখলাম করোনেশন ব্রিজে ওঠার আগে প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কিছু গন্ডগোল হয়েছে নাকি?

আমি বুঝতে পারলাম না।

বাস ভর্তি লোক ঠায় বসে রয়েছে, কিন্তু কারুর কোনো বিরক্তি নেই। এইসব পাহাড়ি লোকেদের অসীম ধৈর্য, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরা অপেক্ষা করতে পারে, কোনো বিরক্তি নেই। আর আমরা সমতলের লোকেরা একটু কিছু হলেই চেঁচিয়ে মেচিয়ে মাথায় তুলি চারদিক।

কিন্তু এক্ষেত্রে চাইলেও শান্ত হয়ে বসে থাকার উপায় নেই আমার। ট্রেনের আর বেশি দেরি নেই। এর মধ্যেই প্রায় বিকেল পাঁচটা বাজে। সবকিছু মিটিয়ে বেরোতে দেরি হয়েছিল, তার ওপর ঠিকমতো বাস পেতেও অনেকক্ষণ সময় লাগল। শিলিগুড়িতে খুব বৃষ্টি হচ্ছে বলে অনেক বাস এদিকে আসতে পারছে না।

আমি আরও কিছুক্ষণ উশখুশ করে ট্রলিটা সাবধানে ধরে বাস থেকে নেমে এলাম। অজস্র গাড়ি পেরিয়ে হাঁটতে লাগলাম সামনের দিকে। এদিকে ইতস্তত বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমি ছাতা আর খুললাম না, ভিজতে ভিজতেই চললাম।

তিস্তা নদীর ওপর এই করোনেশন ব্রিজ ব্রিটিশ আমলে দার্জিলিং আর জলপাইগুড়ি এই দুটো জেলাকে কানেক্ট করার জন্য বানানো হয়েছিল। তখন ইংল্যান্ডের কোনো এক রাজার নাকি রাজ্যাভিষেক হয়েছিল, সেই করোনেশনকে স্মরণীয় রাখতে এই ব্রিজের নাম দেওয়া হয়েছিল করোনেশন ব্রিজ। আমি এত কিছু জানতাম না, সেদিন ফোনে ছবিদাদু বলছিলেন। এখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা বলে বাঘপুল।

এই অঞ্চলটির নাম সেভক। আমি আরেকটু এগিয়ে গিয়ে একটা প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভারকে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, ”কী হয়েছে ভাইয়া? সব গাড়ি দাঁড়িয়ে কেন?”

ড্রাইভারটা বলল, ”ম্যাডামজি, সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে বৃষ্টিতে। কার্শিয়াঙ- এর কাছে সিপাইধুরাতে বিরাট ধস নেমেছে, পঞ্চান্ন নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ।”

”সেকি!” আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। পঞ্চান্ন নম্বর জাতীয় সড়ক ছাড়া এদিক থেকে শিলিগুড়ি ঢোকার কোনো রাস্তাই নেই।

বেশি সময়ও তো নেই হাতে।

ড্রাইভারটাকে বললাম, ”কিন্তু আমার তো ট্রেন আছে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে আজ রাতে!”

”আরে কিসের ট্রেন ম্যাডামজি?” ড্রাইভার অবাক হল, ”সব ট্রেন বন্ধ। সকালের দার্জিলিং মেল চারঘণ্টা লেটে ঢুকেছে। আর কোনো ট্রেন যাবে না। লাইন সব জলের তলায়। আলুবাড়িতে দুজন মারা গেছে। আপনি হোটেলে ফিরে যান।”

"হোটেল নয়, আমি এখানেই থাকি, পুলবাজারে চাকরি করি। কলকাতায় বাড়ি ফিরতে হবে আজ।" আমি অসহায়ভাবে ককিয়ে উঠি।

"তো ফিরতেই পারবেন না। কী করে ফিরবেন! শিলিগুড়ি পৌঁছে গেলে তবু বাগডোগরা থেকে প্লেনে যেতে পারতেন। সব ট্যুরিস্ট এখন ওদিকেই ছুটছে। কুড়ি হাজারের ওপর টিকিট যাচ্ছে। কিন্তু আপনি তো পৌঁছতেই পারবেন না ওদিকে। মহানন্দা, রায়ডাক, জলঢাকা সব নদীর জল ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দিনের আলো থাকতে থাকতে ডেরায় ফিরে যান।" ড্রাইভারটা নিজের মনেই স্বগতোক্তি করল, "এমন হঠাৎ করে বন্যা বহুবছর হয়নি এদিকে।"

আমি অসহায়ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। ফোনে কথা বলার সময় মা সকালে মনে করিয়ে দিয়েছিল, আজ মহালয়া।

পুজোর সময়েও বাড়ি ফিরতে পারব না? এবারে পুজোর আগে এত কিছু করলাম বলেই কি মা দুর্গা আমার ওপর রেগে গেলেন? বাড়িও ফিরতে দিচ্ছেন না?

ড্রাইভারটা আমার দিকে দেখছিল, বলল, "পুলবাজারে ফিরতে চাইলে আপনাকে আমি পৌঁছে দিতে পারি। আমিও ওদিকেই যাব। যাবেন নাকি?"

আমি চুপ করে রইলাম। ড্রাইভারটা গোর্খা, এমনিতে গোর্খা ড্রাইভাররা ভালোই হয়। পাহাড়ি রাস্তায় লিফট নেওয়াটা বেশ কমন ব্যাপার। কিন্তু পাহাড়ে বন্যা একবার শুরু হয়ে গেলে এখানেই আটকে থাকতে হবে। আর একবার আটকে গেলে যদি পুজোতেও না যেতে পারি? আমার এতদিনের প্রচেষ্টা, ইচ্ছে সবই বিফলে যাবে।

লাইসেন্স চালু হোক বা না হোক, পুজো দেখব না নিজের চোখে? শুনব না ছবিদাদুর মন্ত্রোচ্চারণ?

আনমনে ভাবতে ভাবতে আমি করোনেশন ব্রিজের দিকে হাঁটতে লাগলাম। ড্রাইভারটা আমার দিকে অবাক চোখে চেয়ে আছে দেখেও আমি ভ্রূক্ষেপ করলাম না। পৌঁছতে পারি বা না পারি, পুলবাজার আমি এখন কিছুতেই ফিরে যাব না।

হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজ পার হলাম। শিলিগুড়ির দিকটায় এসে দেখি এদিকে দশগুণ বেশি ভিড়। হাজার হাজার পর্যটক ঘুরতে এসে এখানে আটকা পড়েছেন। ব্রিজের নীচে খরস্রোতা তিস্তা যেন উন্মত্ত সিংহের মতো ফুঁসছে। গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে দু-তরফের পুলিশ।

মানুষ এক আশ্চর্য জীব। যখন প্রাথমিক প্রয়োজনগুলো ঠিক থাকে, তখন সে ব্যাপৃত হয় পরচর্চা, পরশ্রীকাতরতা, দুঃখবিলাসের মতো নিজের তৈরি অসূয়াতে, সমুদ্রে ঝিনুক খোঁজার মতো করে সন্ধান চালায় অসন্তোষের। অথচ যখনই অন্ন, বস্ত্র বাসস্থানের মতো চাহিদাগুলোয় কোন বাধা পড়ে, আকস্মিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে টান পড়ে তার নিরবচ্ছিন্ন সুখে, তখন সে দিব্যি বিস্মৃত হয় তার নিজেরই তৈরি করা অকিঞ্চিৎকর দুঃখগুলোকে।

এখানেও তাই। একটু আগেও যারা দিব্যি হাসিখুশি ছিলেন, ঘুরতে যাওয়ার আতিশয্যে মেতেছিলেন, তাঁদের মুখ থেকে সব আনন্দ উধাও হয়ে গেছে, পরিবর্তে বিরক্তি, উৎকণ্ঠা এসে জায়গা করে নিয়েছে। দুশ্চিন্তায় ছটফট করছেন অধিকাংশ ট্যুরিস্ট।

বাঙালি পর্যটকদেরই আধিক্য বেশি। রাস্তা ছেড়ে ব্রিজে ওঠার মুখ থেকে সার দিয়ে দিয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রচুর মানুষজন গাড়ি থেকে নেমে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছেন, গাড়িচালকদের বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলছেন।

একজন মোটাসোটা বাঙালি ভদ্রলোক একটা ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করছেন, ”ও ভাই, গাড়ি কব চলেগা?”

এখানকার মানুষজন কম কথার মানুষ, ড্রাইভারটা সংক্ষেপে উত্তর দেয়, ”নেহি চলেগা।”

”অ্যাঁ?” ভদ্রলোক যেন অজ্ঞান হয়ে যাবেন উত্তরটা শুনে, ”কিউ নেহি চলেগা ভাই? ইয়ে ক্যায়সা বাত হুয়া? ইতনা পাহাড়মে বিবি-বাচ্চা লে কর কিধার জাউঙ্গা? জয় মা তারা, একি হল গো ঘুরতে এসে!”

শেষ কথাটা অবশ্য নিজের মনেই বললেন, ড্রাইভারকে নয়। গাড়ি থেকে ততক্ষণে উঁকি দিচ্ছে দু-তিনটে ছোট ছোট বাচ্চা। একটু বড় যে, সে বলছে, ”দার্জিলিং কখন পৌঁছব বাবা?”

”আরে দাঁড়া তো, তখন থেকে জেনারেটরের মতো বকবক করেই চলেছে!” ভদ্রলোক দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন।

আমি সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, ”দার্জিলিং এখন যেতে পারবেন না। ব্রিজই তো বন্ধ করে দিয়েছে।”

ভদ্রলোক বললেন, ”কি কাণ্ড বলুন দেখি ঘুরতে এসে, অ্যাঁ? ভাবলাম পুজোর আগে একটু ফাঁকায় ফাঁকায় ঘুরে আসব, তা না …। কী করব এখন?”

আমি বললাম, ”আপাতত তো কিছু করা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। ওদিকে বৃষ্টি একনাগাড়ে হয়েই চলেছে। এই সেভকেই আপনাদের থেকে যেতে হবে আজ রাতটা। ছোটখাট হোটেল পেয়ে যাবেন। তারপর কাল সকালে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।”

ভদ্রলোক আমার আশেপাশে আর কাউকে না দেখে এবার বললেন, ”আপনি কি একাই ঘুরতে এসেছিলেন নাকি?”

”না। ঘুরতে আসিনি।” আমি বললাম, ”আমি দার্জিলিঙে চাকরি করি। ওখানেই পোস্টেড। বাড়ি ফিরছিলাম আজ, হঠাৎ এই বিপত্তি। আপনি আর দেরি করবেন না। সবে আটকে পড়েছেন, এই বেলা কাছাকাছি হোটেলগুলোয় গিয়ে খোঁজ নিন। অর্ধেক ট্যুরিস্ট এখনো গাড়িতেই বসে আছে, ভাবছে রাস্তা খুলে যাবে একটু পরে। আরও কিছুক্ষণ পরে হোটেলগুলোয় আর জায়গা পাওয়া যাবে না।”

”হ্যাঁ। এই যাচ্ছি। দেখুন দিকি, বাচ্চাদের নিয়ে কী ঝামেলায় পড়লাম।”

ভদ্রলোক গাড়ির দিকে এগোতে উদ্যত হলে আমিও হাঁটা লাগালাম।

গোটা এলাকাটা গিজগিজ করছে লোক। করোনেশন ব্রিজে ওঠার আগের রাস্তাটায় থরেথরে দাঁড়িয়ে রয়েছে গাড়ি।

আমি গাড়িগুলোর পাশ দিয়ে, দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনকে পাশ কাটিয়ে হনহন করে হাঁটছিলাম। কোথায় যাব, কীভাবে যাব, কিছুই জানিনা। এখান থেকে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলে হয়তো শিলিগুড়ি পৌঁছনোর গাড়ি মিললেও মিলতে পারে, কিন্তু তারপর কী করব? ট্রেন তো বন্ধ!

বৃষ্টি একনাগাড়ে হয়েই চলেছে, বরং বাড়ছে। আমি বাস থেকে নামার আগে বুদ্ধি করে একটা কাজ করেছিলাম। রেনকোটটা পরে নিয়েছিলাম। ফলে, এক হাতে ট্রলি নিয়ে হাঁটতে খুব একটা অসুবিধা হচ্ছে না।

দেখতে দেখতে প্রায় দুই-আড়াই কিলোমিটার চলে আসার পরে গাড়ির ভিড়টা যেন একটু কমল। তবে মিনিটে প্রায় তিন-চারটে করে গাড়ি আমার পাশ দিয়ে গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ছে।

আমি একটু জিরিয়ে নেওয়ার জন্যও একটা চায়ের দোকানে থামলাম। দোকানদারকে এক কাপ চা দিতে বললাম। ঘড়িতে দেখি প্রায় ছ-টা। আজ রাতে কপালে কী আছে জানিনা।

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করলাম, "আর একটু এগিয়ে গিয়ে শিলিগুড়ি ফেরার গাড়ি পাব আঙ্কল?"

"পাওয়ার তো কথা।" দোকানদার জবাব দিল, "তবে যা খবর পাচ্ছি, কোনো গাড়ি শিলিগুড়ি থেকে এদিকে আসতে চাইছে না। যদি সকালে চলে আসা কোনো গাড়ি এখন ফেরে, তাহলে পাবে।"

"হুম।" আমি চায়ের দাম মিটিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করি।

পশ্চিমদিকে সূর্য অনেকক্ষণ হল ঢলে পড়েছে। পাহাড়ি জায়গা, এতক্ষণ শীত না করলেও এইবার হালকা গা শিরশির করছে কেমন যেন। রাস্তার পাশের খাদে প্রায় কুড়ি মানুষ উঁচু গাছগুলো যেন প্রতি মুহূর্তে আরও বেশি উঁচু হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের চাদর গায়ে মেখে।

আমার গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল।

চা-ওয়ালা কাছেই একটা জিপগাড়ির স্ট্যান্ড আছে বলেছিল, আমি জলদি পা চালালাম সেদিকে। যেভাবেই হোক, শিলিগুড়ি আমাকে পৌঁছতেই হবে।

তারপর ওখান থেকে কী করব, সে দেখা যাবে। এমনিতে মহিলা হিসেবে আমার তেমন ভয় নেই। হাঁটা শুরু করার আগেই রেনকোট, জ্যাকেট দিয়ে এমনভাবে নিজেকে মুড়ে ফেলেছি, কেউ খুব ভালো করে মুখের সামনে এসে খুঁটিয়ে না দেখলে ধরতেই পারবেনা যে আমি মেয়ে। আর এমনিতেও মা থেকে শুরু করে পাড়ার সবাই বলতো আমার হাঁটাটা নাকি খুব পুরুষালী, কোনো লক্ষ্মীশ্রী নেই হাঁটার মধ্যে।

কাজেই সেদিক থেকেও এখন সোনায় সোহাগা।

তেইশ

কথায় বলে অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়। এই বন্ধ গাড়ির মধ্যে বসে তুমুল বৃষ্টির তোড়ে সাদা হয়ে যাওয়া জানলার কাচ দেখতে দেখতে সেটাই ভাবছিলাম আমি।

বাইরে প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের গাড়ির ড্রাইভারটা ছেলেমানুষ, বড়োজোর কুড়ি বছর বয়স হবে। ছেলেটা কীভাবে যে গাড়ি চালাচ্ছে, এটা একটা আশ্চর্যের বিষয়। কারণ গাড়ির সামনেটা কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না। উইন্ডগার্ডদুটো যে কাজ করছে না তা নয়, কিন্তু বৃষ্টির তোড় ও প্রাবল্যের সঙ্গে ওইদুটো একই গতিতে ছুটতে পারছে না। ফলে, চারপাশ পুরো ঝাপসা হয়ে আসছে।

জিষ্ণু ড্রাইভারের পাশেই বসেছিল, ভিতু গলায় এরমধ্যেই অন্তত পাঁচবার বলা কথাটা আবার পুনরাবৃত্তি করল ও, "ও ভাই, গাড়িটা নিয়ে সাইড হয়ে যাও। এইরকম বৃষ্টিতে, পাহাড়ি রাস্তায় ... কী দরকার!"

প্রত্যুত্তরে ছেলেটা বিড়বিড় করে কী বলল, কিচ্ছু শোনা গেল না, তবে এইটুকু বোঝা গেল, তার গাড়ি থামানোর আপাতত কোনো পরিকল্পনা নেই।

আমি বেশ জোরে বললাম, "খাদে টাদে পড়ে যাব না তো রে?"

আমার ডান পাশ থেকে গৈরিক জোর একটা ঠ্যালা দিল, "শালা, অলক্ষুণে কথাগুলো না বললেই নয়?"

গৈরিকের কথাটা শেষ হতে না হতেই প্রচণ্ড জোরে কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে একটা বাজ পড়ল খুব কাছেই কোথাও। সেই ঝলকানিতে আমি এক সেকেন্ডের জন্য দেখতে পেলাম দূরে পাহাড়ের মতো উঁচু গাছগুলো ভীষণ জোরে জোরে দুলছে।

কী আছে আমাদের কপালে, সত্যিই জানিনা।

অথচ ঘণ্টাতিনেক আগেও যখন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমেছিলাম, ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি এমন অবস্থায় পড়তে হবে। আমাদের ট্রেন অনেক লেটে ঢুকলেও ওখানে তখন বৃষ্টি সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। কলকাতার গুমোট গরম ছেড়ে এসে টিপটিপ বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে স্টেশন থেকে বেরোতে মন্দ লাগেনি।

জিষ্ণুর মতো একটা জিপগাড়ি ভাড়া নিয়ে আমরা রওনা দিয়েছিলাম মানেভঞ্জনের উদ্দেশ্যে।

প্রথমে ভালোই লাগছিল। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনেই পেটপুরে জলখাবার খেয়ে নিয়েছিলাম, গল্পগুজব করতে করতে চলছিল আমাদের গাড়ি।

আমাদের, বিশেষ করে আমার তো খুবই আনন্দ হচ্ছিলো। বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে যে কতটা খোলা মনে থাকা যায়, সেটাকে বারবার অনুভব করছিলাম।

তার মধ্যেই আবির ফোন করে জানিয়েছিল, উত্তরপাড়া থানা ডায়রি নিয়েছে। শুধু তাই নয়, রাজতিলক সব খুলে বলেছে ওদের। ওসি আশ্বাস দিয়েছেন সুপ্রতিমের বিরুদ্ধে শীগগিরই ব্যবস্থা নেওয়ার।

বিনির এতবড় বিপদ থেকে বাঁচার ঘটনায় অত্যন্ত সামান্য হলেও যে আমারও কিছু ভূমিকা আছে, এটা ভাবতেই মনটা আরও খুশি হয়ে উঠছিল।

জিষ্ণু ওর পকেট নোটবুক বের করে আমাদের প্ল্যানটা পড়ে পড়ে শোনাচ্ছিল, "শোন মানেভঞ্জন থেকে ট্রেক করে কাল পৌঁছব টংলু বলে একটা গ্রামে।"

"টংলু?" আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, "কী সুন্দর নাম রে!"

জিষ্ণু চোখ নাচিয়েছিল, "জায়গাটা আরও সুন্দর রূপ। পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটা ছবির মতো গ্রাম। মেরেকেটে কুড়ি পঁচিশটা পরিবার থাকে। হোটেল টোটেল কিস্যু নেই, ওই বাড়িগুলোর লোকেরাই দু-একটা ঘর ট্যুরিস্টদের জন্যও হোম স্টে করে রেখেছে। দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা, মন ভুলে যাবে, বুঝলি!"

"বাঃ।" চিরন্তন বলেছিল, "টংলুতে তাহলে কয়েকদিন স্টে' করে ক-টা ভালো ল্যান্ডস্কেপ নামাব।"

"ধুর!" জিষ্ণু হাত নেড়েছিল, "পাগল হলি নাকি তুই? টংলুতে আমরা শুধু একটা রাত কাটাব, পরের দিন ভোরে উঠেই সান্দাকফুর জন্য রওনা দিতে হবে না?"

এইভাবে গল্পগুজবে কেটে যাচ্ছিল বেশ, কিন্তু বিপত্তিটা বেধেছিল কিছুক্ষণ পরেই।

সকাল থেকে হওয়া টিপটিপ বৃষ্টি কিছুতেই কমছিল না, অবশেষে মুষলধারে পড়তে শুরু করল। ক্রমশ আকাশের চেহারা পালটে যেতে লাগল, কালো কুচকুচে রঙা মেঘগুলো যেন পাহাড়ের মধ্যে এসে গিলে ফেলতে চাইছিল আমাদের।

চিরন্তন ভয়ে ভয়ে বলেই ফেলল, "এ কী ওয়েদার হল। মানেভঞ্জন পৌঁছতে পারব তো?"

"আরে হ্যাঁ।" জিষ্ণু বলেছিল, "পাহাড়ের বৃষ্টি। এখুনি কমে যাবে দেখ না!"

কিন্তু আস্তে আস্তে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে লাগল। এত জোরে জোরে বাজ পড়ছিল, মনে হচ্ছিলো যেন আমাদের গাড়ির ওপরেই পড়ছে। কমার কোনো লক্ষণই নেই।

তখনও নেটওয়ার্ক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কাজ করছিল। জিষ্ণু অনেকক্ষণের চেষ্টায় খবর জোগাড় করল যে কাল রাত থেকেই এই অঞ্চলে বৃষ্টি হচ্ছে, এখন ধীরে ধীরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।

রেগেমেগে ও ড্রাইভার ছেলেটাকে বলল, "আমাদের বলোনি কেন এদিকে এত বৃষ্টি হচ্ছে?"

ছেলেটা সংক্ষেপে জবাব দিয়েছিল, "মুঝে ভি পতা নেহি থা।"

অতঃপর এখন এই দু-ঘণ্টায় আমাদের মুখের হাসি মুছে গিয়ে ক্রমে বিরক্তি, উদ্বেগ, শেষে ভয় এসে জমা হয়েছে। এই প্রবল বৃষ্টিতে পাহাড়ের ওপর দিয়ে গাড়ি করে যাওয়ার অর্থ যেচে মৃত্যুর দিকে পা বাড়ানো। কোনোভাবে একবার যদি চাকা স্লিপ করে যায়, মুহূর্তে হাজার হাজার ফুট নীচের খাদে ভবলীলা সাঙ্গ হবে আমাদের।

আমি জিষ্ণুর কাঁধে টোকা দিলাম, "কী ব্যাপার বলতো? ছেলেটা গাড়ি থামাচ্ছে না কেন? আমাদের মারার তাল টাল করছে নাকি?"

জিষ্ণু ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল, "ও ভাই, গাড়িটা থামাচ্ছ না কেন? সবাই মিলে মরব তো এবার!"

জিষ্ণুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা গাড়ি আমাদের পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল।

ছেলেটা হিন্দিতে বলল, "এখানে থামিয়ে কী করব? এইসব রাস্তা একবার ভেসে গেলে কোথায় দাঁড়াবেন? রাতে এদিকে কোনো থাকার জায়গাও তো নেই। বৃষ্টিতে যদি ধস নামতে শুরু করে?"

জিষ্ণু সাদা চোখে বলল, "তাহলে? তুমি কোথায় যাচ্ছ ভাই?"

ছেলেটা বলল, "যতক্ষণ পারছি চালাচ্ছি। বাঘপুল একবার পেরিয়ে গেলে আর তেমন টেনশন নেই। ওদিকে রাতে কোথাও একটা থাকার জায়গা হয়ে যাবে ঠিক।"

"বাঘপুল আবার কোথায়?" আমি ফিসফিস করলাম।

জিষ্ণু বলল, "আরে করোনেশন ব্রিজ। শিলিগুড়ি আর দার্জিলিং-এর কানেক্টর। ওটাকেই ওরা বাঘপুল বলে।"

"তো সেই ব্রিজ আসতে কতক্ষণ লাগবে ভাই?" আমি ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করলাম।

ছেলেটা চ্যুইং গাম চিবোচ্ছিল, বৃষ্টির ছাঁটে বেচারার মুখে বিন্দু বিন্দু জলভরে উঠেছে, "আরও এক ঘণ্টা।"

"শালা এই সাইক্লোনের মধ্যে দিয়ে এক ঘণ্টা যেতে হলে বেঁচে থাকব তো? টেঁসে যাব না তো ভাই!" বিড়বিড় করল গৈরিক।

দলের পান্ডা হিসেবে মুখ শুকিয়ে গেলেও জিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে বরাভয় দিল, "এই ছেলেটা লোকাল। ও ঠিকই বলছে। কোনোমতে করোনেশন ব্রিজ পেরিয়ে গেলে হয়তো আর চিন্তা নেই।"

গৈরিক আবার চিরকালের কল্পনাপ্রবণ, ও বলল, "ধর এই ছেলেটা যদি কোনো ডাকাত দলের চ্যালা হয়? হয়তো এইভাবে ভুলিয়ে ভালিয়ে ওদের ডেরায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের?"

আমি বললাম, "অ্যাঁ! ডাকাত দলের? এইদিকে ডাকাত আছে নাকি?"

"বাঃ! ডাকাত থাকবে না? জঙ্গল আছে, তার মানেই ডাকাত আছে।" বিজ্ঞের মতো বলল গৈরিক।

জিষ্ণু সামনের সিট থেকে পেছনে ঝুঁকে এসে প্লাস্টিকের জলের বোতলটা তুলে আছাড় মারল গৈরিকের মাথায়, "তোর এই গল্প বানানোর অভ্যেসটা বন্ধ কর। এখানে খামোখা ডাকাত কোত্থেকে আসবে! শালা একে ওয়েদার নিয়ে চিন্তায় মরছি, ইনি এলেন ডাকাতদল নিয়ে।"

জিষ্ণুর কথা শেষ হল না, তার মধ্যেই ছেলেটা ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থামিয়ে দিল গাড়িটা।

"কী হল কী হল? থামল কেন? কোনো লোকজন ঘিরে ধরেছে ...?" গৈরিক বলে উঠল।

না, কেউ আমাদের ঘিরে ধরেনি। উলটোদিক থেকে একটা গাড়ি আসছিল, তার ড্রাইভারের সঙ্গে কিছু একটা কথা জানলা নিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলছে আমাদের ড্রাইভারটা।

ওদের ভাষা কিছু বুঝতে না পারলেও এটা আন্দাজ করতে পারছি যে সামনের রাস্তার কথাই বলছে ওই গাড়ির চালক।

আগেই বলেছি, যেহেতু আমাদের এই ট্যুরটা জিষ্ণুই অ্যারেঞ্জ করেছে, আমাদের সবার নেতা হিসেবে অঘোষিত পদটা ও নিজের কাঁধে এসে থেকেই তুলে নিয়েছে।

সবেতেই সবজান্তা ভাব দেখাতে গিয়ে ও এবার একটা কাণ্ড করে বসল। দুটো গাড়ি থেমে গেছে, সেই উৎসাহে ওর পাশের জানলার কাচটা নামাতেই একটা প্রায় আধখানা ইটের আয়তনের শিল এসে লাগল মাথায়।

জানলা বন্ধ থাকায় শিলাবৃষ্টি হচ্ছে বুঝতে পারলেও সেটার তীব্রতা যে এতটা, সেটা আমরা কেউই বুঝতে পারিনি।

মুহূর্তের মধ্যে সেই শিল ভেঙে বরফ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, আর জিষ্ণুর মাথা ফেটে দরদর করে রক্ত ঝরতে শুরু করল।

চব্বিশ

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে হেঁটেও যখন কোনো গাড়ির দেখা পেলাম না, আমার তখন অল্প অল্প টেনশন হওয়া শুর করল। সন্ধে প্রায় নেমে গেছে। এই অন্ধকার ঝড়বৃষ্টির রাতে পাহাড়ের রাস্তায় একা একা হাঁটাটা যে কতটা বিপজ্জনক ব্যাপার, সেটা এবার বুঝতে পারছিলাম।

যতই ছেলে সেজে থাকি, কেউ আমার সঙ্গে কথা বলতে এলেই বুঝে যাবে যে আমি আসলে মেয়ে।

নিজের মনেই আফশোস করতে লাগলাম। সেই গোর্খা ড্রাইভারটা বলেছিল পুলবাজারে নামিয়ে দেবে, এর চেয়ে ওর সঙ্গে চলে গেলেই ভালো হত। এমনিতে যা আবহাওয়া, কলকাতা পৌঁছনোর সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। সেখানে আমার এই ঝোঁকের মাথায় নেওয়া সিদ্ধান্ত এখন হঠকারিতা মনে হতে লাগল।

আরও কিছুক্ষণ হেঁটে একটা গুমটি দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি এখন অল্প থামলেও এই গোটা উপত্যকার ওপর দিয়ে যে একটা ঝড় বয়ে গেছে তা একঝলক দেখলেই বোঝা যায়। কাছের গাছগুলো সব দুমড়ে মুচড়ে এর ওর গায়ে হেলে পড়েছে, এই গুমটির তেরপলের ছাউনিটা উড়ে গিয়ে বিশ্রী হাঁ হয়ে রয়েছে দোকানের সামনের দিকটা।

গুমটির সামনেটা বসে আছে একজন মধ্যবয়স্কা মহিলা, আর কেউ নেই। আমি বললাম, ”কী ব্যাপার, কোনো গাড়িই তো দেখতে পাচ্ছি না শিলিগুড়ি যাওয়ার!”

”ওদিকে তো শিল পড়ছে খুব।” মহিলা বলল, ”একটু দাঁড়াও, কোনো গাড়ি যদি এদিক দিয়ে যায়, তাহলে উঠে পড়বে।”

”আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না, এত গাড়ি যে ব্রিজে আটকে আছে, সেগুলো তো নিশ্চয়ই ব্যাক করছে। কোন দিক দিয়ে ব্যাক করছে সেগুলো? একটাকেও তো দেখা যাচ্ছে না!” আমি হাতদুটোকে জড়ো করে জোরে জোরে ঘষছিলাম। এবার ঠান্ডা লাগছে বেশ।

”বেশিরভাগ গাড়িই অন্য রাস্তা দিয়ে নেমে যাচ্ছে। এদিকে বৃষ্টিটা বেশি হচ্ছে তো, তাই আসছে না।” মহিলা এবার আমার দিকে ভালো করে অবাক চোখে দেখল, ”তুমি কি একাই নাকি?”

”হ্যাঁ। এখানেই থাকি, কলকাতায় ফেরার ট্রেন আছে আজ রাতে।” আমি বললাম।

”ট্রেন তো বন্ধ। এই তো একটা গাড়ির ড্রাইভার বলে গেল।” মহিলা ভ্রূ কুঁচকে বলল, ”রাত নেমে আসছে, একা একা কোথায় ঘুরবে? আমার ঘরে থেকে যাও আজ। কাল সকাল হলে নেমে যাবে শিলিগুড়ি।”

আমি ইতস্তত করলাম। এইভাবে দুম করে চেনা নেই জানা নেই, কারুর বাড়িতে থাকিনি কখনো।

তবে, পাহাড়ে এই চলটা আছে। প্রকৃতির রোষ বা বিপর্যয় এদের ওপর এমনভাবেই পড়ে, যে এরা সাধারণত বিপদের সময় একে অপরকে সাহায্যই করে থাকে। সমতলের মানুষের মতো কু-অভিসন্ধি অতটা নেই এদের।

তা ছাড়া আমি কতক্ষণই বা এমন উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটব? পাহাড়ি লোকেরা বেশিরভাগই হয়তো ভালো, কিন্তু খারাপ লোক তো সব জায়গাতেই থাকে। কেউ যে বদমতলবে কোনো ক্ষতি করবে না, তাই বা কে বলতে পারে? তা ছাড়া দুমদাম যেকোনো গাড়িতে লিফট নিয়েও তো ওঠা যায় না। ঝোঁকের মাথায় হাঁটতে শুরু করে বোকামিটা যখন করেই ফেলেছি, তখন সেটাকে ম্যানেজ তো করতে হবে।

আমি হাসলাম, "ঠিক আছে মাসি। তোমার ঘর কোথায়?"

মাসি পেছনদিকে আঙুল দেখালো, "দোকানের পেছনে। বোসো, চা খাও। তুমি পুলবাজারে থাকো তো?"

আমি এবার অবাক হয়ে বললাম, "হ্যাঁ। কী করে জানলে?"

এর আগে যেদিন শিলিগুড়ি থেকে যাচ্ছিলে, আমার ছেলের গাড়িতেই তো গিয়েছিলে। মনে নেই, আমার ছেলে গাড়ি চালাতে চালাতে আমার দোকানে থামল, তুমি বিস্কুট কিনলে!"

আমি মনে মনে বেশ খুশি হলাম। বাহ, নিরাপদ আশ্রয়ই পেয়েছি মোটামুটি। আজ রাতটা কোনো উপায় নেই, এর কাছে থেকে যাই। থাকা খাওয়া বাবদ কিছু টাকা দিয়ে দিলেই হল। তারপর কাল সকালে উঠে যেভাবে হোক শিলিগুড়ি চলে যাব।

"এবার মনে হচ্ছে বন্যা হয়ে যাবে।" মাসি চা করতে করতে বলল, "ছেলে আটকে পড়েছে কার্শিয়াঙে, ফোন করে বলল। ওদিকে খুব ধস নামছে।"

আমি গুমটির সামনের একটা পাথরের ঢিবির ওপর বসে বৃষ্টি দেখছিলাম, বললাম, "হ্যাঁ। কবে ট্রেন চালু হবে কে জানে!"

মাসির এই গুমটিটা রাস্তার একটা বাঁকের ধারে হওয়ায় অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। বৃষ্টি অনেকটা কমে এলেও আলো-আঁধারিতে অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তায় ক্রমাগত পড়তে থাকা বৃষ্টির ফোঁটা দেখতে পাচ্ছিলাম।

তার মধ্যেই লক্ষ করলাম দূর থেকে যেন একটা আলো এদিকে আসছে।

আর একটু কাছাকাছি আসতে বুঝলাম, একটা গাড়ি আসছে।

আমি আলগোছে মাসিকে বললাম, "চা বসাও। তোমার খদ্দের আসছে মনে হয়।"

মাসি বলল, "আর কিছুক্ষণ পরেই ঝাঁপ বন্ধ করে দেব। যা হাওয়া দিচ্ছে, এরপর আর বসা যাবে না।"

গাড়িটা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রায় তিরের গতিতে আসছিল। তারপর এই গুমটির কাছাকাছি আসতেই কর্কশ শব্দে একটা ব্রেক কষে দাঁড়াল।

আলো বেশ পড়ে এসেছে, মাসি একটু আগেই টিমটিমে একটা হ্যালোজেন বাল্ব জ্বালিয়েছিল।

সেই আলোয় আমি দেখলাম, গাড়িটা থামতেই মাঝের সিট থেকে একটা ছেলে লাফিয়ে নামল। তারপর প্রায় ছুটে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

"কী হয়েছে, এরকম ভাবে দৌড়ে আসছে কেন?" আমি মাসির দিকে তাকিয়ে বললাম।

এইরকম বেচাল কিছু দেখলেই অজান্তেই মনের ভেতরটা কেমন দুলে ওঠে অজানা আশঙ্কায়।

মাসি কিছু বলার আগেই ছেলেটা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাস্যকর হিন্দিতে বলল, ”তুলো আছে, তুলো? বা কোন ন্যাকড়া? আমাদের এক বন্ধুর মাথা ফেটে গেছে, খুব রক্ত পড়ছে।”

আমি নিস্পলক তাকিয়ে দেখছিলাম।

যারা সত্যিকারের ক্যাবলা হয়, খাঁটি গোবর হয়, তাদের একঝলক দেখলেই বোঝা যায়, ভয়ে একদম নার্ভাস হয়ে পড়েছে।

এও তাই।

যেদিন হাইকোর্টে প্রথম আমার সঙ্গে তর্ক করতে এসেছিল, সেদিনই বুঝেছিলাম, আজও বুঝলাম।

বন্ধুর মাথা ফেটে যাওয়ায় মঙ্গলরূপ বোধ হয় এমনিই ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তার ওপর কলকাতা থেকে প্রায় সাতশো কিলোমিটার দূরে উত্তরবঙ্গের এক অখ্যাত গ্রামে এসে আমাকে এই গুমটির সামনে বসে থাকতে দেখে ও ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল।
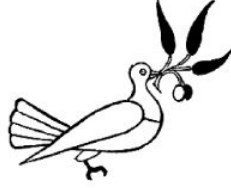
পঁচিশ

দিওতিমা মুখ তুলে বলল, "কাঁচি আছে মাসি?"

দিওতিমার মাসি, মানে ওই গুমটিতে বসে থাকা নেপালি মহিলা হাত উলটে কী বিড়বিড় করল, তারপর ঘরের এককোণে রাখা একটা ছোট্ট দেরাজে গিয়ে কিছুক্ষণ আঁতিপাঁতি করে খুঁজে এনে দিল একটা আধখানা ব্লেড। মহিলার পরনে একধরনের পাহাড়ি গাউন, ওপরে ফুল হাতা জামা, মাথায় একটা ফেট্টি বাঁধা। একটু পরে গাউনের পকেট হাতড়ে বের করল আরেকটা নতুন ব্লেড।

দিওতিমা ব্লেডটা দিয়ে সাবধানে ব্যান্ডেজের একটা দিক কাটল, তারপর নিজের চুল থেকে একটা ক্লিপ খুলে আটকে দিল ব্যান্ডেজের একদম শেষে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আর রক্ত বেরোবে না আপনার বন্ধুর মাথা থেকে। একটু গরম দুধ খাওয়াতে পারলে ভালো হত, দেখুন জোগাড় করতে পারেন কিনা!"

আমি ভ্যাবলার মতো গৈরিকের দিকে তাকালাম। এই বৃষ্টিবাদলার রাতে পাহাড়ের মাথায় দুধ কোত্থেকে পাব?

গৈরিক মাথা চুলকে বলল, "ইয়ে, গুঁড়ো দুধ চলবে? কফি-র জন্য এনেছিলাম।"

দিওতিমা আমার আর গৈরিকের দিকে কটমট করে একবার তাকিয়ে আবার তাকাল ওর মাসির দিকে, "দুধ পাওয়া যাবে মাসি?"

নাহ, স্বীকার করতেই হবে, দিওতিমার মাসি প্রায় কল্পতরু টাইপের।

সামান্য ঘাড় নেড়ে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে, নিশ্চয়ই দুধের খোঁজে।

ঘরে এবার আমরা পাঁচজন প্রাণী। তার মধ্যে জিষ্ণু বিছানায় চোখ উলটে পড়ে এখনো গোঁ গোঁ করছে।

হতভাগার সহ্যশক্তি বলে কিচ্ছু নেই, সামান্য কিছু হলেই চোখে সর্ষেফুল দেখে, আবার লিডার হয়েছে! হুহ!

গৈরিক আর চিরন্তন বসে আছে একটা ছোট বেঞ্চে, আড়ষ্ট হয়ে।

স্বাভাবিক, জানা নেই শোনা নেই, একটা অচেনা বাড়িতে ঢুকে পড়লে কেমন অপ্রতিভ লাগে না নিজেকে?

বাকি রইলাম আমি আর দিওতিমা। দিওতিমা বসে আছে জিষ্ণুর বিছানার ঠিক পাশেই একটা চেয়ারে।

আর আমি কী করব বুঝতে না পেরে একটু দূরে ঘরের একমাত্র জানলার রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাতের নখ খাচ্ছি।

ঘরটা ছোট কিন্তু ঘুপচি নয়। একপাশে টিউব লাইট জ্বলছে, অন্যপাশে বিছানা, চেয়ার এবং ইতিউতি আসবাব ছড়ানো।

জিষ্ণুর মাথায় আচমকা একটা শিলাপাথর লেগে যখন দরদর করে রক্ত পড়তে শুরু করল, তখন আমি গৈরিক আর চিরন্তন তিনজনেই দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলাম। গাড়িতে কিচ্ছু ছিল না, যা দিয়ে ওর ক্ষতস্থানটাকে চেপে ধরব। ড্রাইভার ছেলেটা বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছিল, যতটা দ্রুত সম্ভব গাড়ি চালাতে শুরু করেছিল। রাস্তার ধারের দোকানটা দেখতে পেয়েই নেমে এসেছিলাম আমি।

আর তখনই দেখতে পেয়েছিলাম দিওতিমাকে। প্রথমে বুঝতে পারিনি, ও আপাদমস্তক বর্ষাতিতে ঢেকে চুপ করে বসেছিল। কিন্তু মুখের দিকে চোখ পড়তেই আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

নিজের অজান্তেই কখন জানিনা বুকের মধ্যে বুড়বুড় কাটতে শুরু করেছিল।

হাওড়ায় চাকরি করা, উত্তরপাড়ার মেয়ে দিওতিমা এইখানে, এই পাহাড়ের মধ্যে?

একা একা এখানে ও কী করছে?

তারপর জিষ্ণুর এই অবস্থা দেখে দিওতিমা-ই উদ্যোগ নিয়ে ওকে নিয়ে এসেছে পেছনের এই দোকান লাগোয়া ঘরটাতে। দোকানের মালকিন সম্ভবত দিওতিমার পূর্বপরিচিত।

আমি যখন এইসব আকাশপাতাল ভাবছি, তখন দেখি দিওতিমা আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পা নাচাচ্ছে। আর ওর ভিজে যাওয়া প্যান্টটা থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে কাঠের মেঝের ওপর।

"এইখানে আপনি কী করে এলেন?" বুলেটের মতো প্রশ্ন ধেয়ে এল আমার দিকে।

আমি দিওতিমাকে দেখছিলাম। খুব বেশিদিন হয়নি, আমাদের শেষ দেখা হয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতি এবং ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে যেন কতযুগ পরে দেখা হচ্ছে!

মিথ্যে বলব না, কাল সন্ধেবেলা ঝন্টুর কাছে 'হাপিশ করে দিয়েছি' শোনার পর থেকে শরীরের মধ্যে কেমন একটা আনচান করছিল, বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজবের মধ্যেও হঠাৎ হঠাৎ কেমন বোলতার মতো মনের গভীরে ভনভন করছিল ঝন্টুর বলা কথাটা।

তাই বলে আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে দিওতিমাকে এখানে এইভাবে দেখতে পাব।

"হাঁ করে তাকিয়ে আছেন কেন?" দিওতিমা ধমকে উঠল, "আশ্চর্য তো! শুনতে পাচ্ছেন না নাকি?"

আমি থতমত খেয়ে বললাম, "অ্যাঁ? হ্যাঁ, মানে আ-আমরা সান্দাকফু যাচ্ছিলাম তো! রাস্তায় এত বৃষ্টি … গাড়ি চলছিল, হঠাৎ একটা শিল লেগে জিষ্ণুর মাথাটা …।"

"বুঝেছি।" দিওতিমা ঠোঁটের ডানপাশটা বেঁকিয়ে অদ্ভুতভাবে হাসল, "বিয়ের আগে বন্ধুদের সঙ্গে শেষ ট্রিপ, তাই তো?"

কলেজে পড়ার সময় 'লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি'-র আঁকা মোনালিসা ছবির হাসি আর ঠোঁটের কৌণিক পারস্পেক্টিভ নিয়ে আমাদের আলাদা একটা অধ্যায় ছিল। সেটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার।

দিওতিমাকেও ডানপাশ চেপে হাসলে বেশ অন্যরকম দেখায়।

"কী অদ্ভুত তো। উত্তর দেন না কেন কথার?" এবার মেয়েটা ঝাঁঝিয়ে উঠল।

"অ্যাঁ?" আমি চমকে উঠলাম, "কী বলছেন?"

নেপালি মহিলাটি একটা বাটিতে করে কিছুটা দুধ নিয়ে এলে দিওতিমা প্রসঙ্গ পালটে বলল, ”দেখেছেন, এখানকার লোকেরা কত উপকারী হয়? আপনার বাড়ির পাশে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে আপনি তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে দুধ খাওয়াতেন? রাতে থাকতে দিতেন?”

”উনি আপনাকে চেনেন বলে তবু ভালো, নাহলে হয়তো এতটা সাহায্য পাওয়া যেত না।” আমি বললাম।

”চেনেন আবার কি?” খর চোখে তাকাল দিওতিমা, ”আপনারা আসার আধঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে ওঁর আলাপ। আমি আজ রাতটা এখানেই থাকব, তারপর কাল সকালে শিলিগুড়ি ফিরব। চেনা জানা কিছুই নেই। পাহাড়ের লোকেরা এমনই। এরা আমাদের মতো অত প্যাঁচালো নয়।”

দিওতিমা যে এখানে চাকরি করতে এসেছে, আমি জানতামই না। কীভাবে ওপরমহলে ঘুঁটি সাজিয়ে ওকে রাতারাতি এইরকম পাণ্ডববর্জিত জায়গায় ট্রান্সফার করা হয়েছে, সেটা শুনেও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

ঝন্টু তাহলে ‘হাপিশ করা’ বলতে এটাই বুঝিয়েছিল!

আমি বললাম, ”আপনি এখানে কীভাবে থাকেন? মানে, সম্পূর্ণ একা?”

”দোকা কোথায় পাব?” দিওতিমা কাষ্ঠ হাসল, ”যদি আপনাদের সান্দাকফু ট্যুর না থাকতো, তাহলে পুলবাজারে আমার বাড়িতে নিয়ে যেতাম। ক-দিন থাকতেন তারপর কলকাতা ফিরে আপনার বাবাকে বলতেন যে, দ্যাখো, তোমাদের পেছনে লাগার জন্য মেয়েটাকে কীভাবে কষ্ট করে এখানে থাকতে হচ্ছে।”

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। বাবা কি সত্যিই জানেন যে দিওতিমাকে এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে? নাকি পুরোটাই জগদীশকাকা আর ঝন্টুর রাজনৈতিক দলের চাল? আমার কেন জানিনা আবার মনে হল, জগদীশকাকার ওপর বাবার যতই নির্ভরশীলতা বেড়ে উঠছে, কালবৈশাখীর কালো মেঘের মতো আড়ালে ঘনিয়ে আসছে বিপদ।

”বিনি কেমন আছে?” হঠাৎ বলল দিওতিমা।

বিনির ব্যাপারটা কি দিওতিমা জানে? কিন্তু বিনি যে বলেছিল কাউকে জানাবে না? নাকি দিওতিমা কিছু জানেনা, এমনিই কুশলজিজ্ঞাসা করছে।

কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাকে কেন? বিনি-র খবর আমাকে জিজ্ঞেস করার মানে কী?

আমি দিওতিমার একটা করে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মনে হাজারখানা সমীকরণ মেলাতে চেষ্টা করছিলাম।

মুখে বললাম, ”ভালো। ও তো আপনার ছোটবেলার বন্ধু, তাই না?”

”হ্যাঁ।” দিওতিমা আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই জিষ্ণু বিড়বিড় করতে শুরু করল, ”ও বাবা গো, মরে গেলাম গো! কী যন্ত্রণা, উফ!”

দিওতিমা ঝুঁকে পড়ে বলল, ”অত জোরে নড়বেন না, ব্যান্ডেজটা খুলে যাবে। আরেকটু দুধ খাবেন?”

জিষ্ণু এবার চোখ মেলে অনেক কষ্টে দিওতিমার দিকে চাইল, কাগজে ছবি দেখার সূত্রে চিনতে পারল কিনা বুঝলাম না, কিন্তু ওর ছটফটানি একটু যেন কমল। বলল, ”আপনি

কে?”

দিওতিমা বলল, ”আমি এখানেই থাকি। আপনি চুপ করে শুয়ে থাকুন, বেশি নড়াচড়া করবেন না। ঘুমিয়ে পড়ুন। ভালো করে একটা ঘুম হলেই দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে।”

”আমি কি আদৌ বাঁচব?” জিষ্ণু বলল।

দিওতিমা অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকাল, ”মানে? বাঁচামরা আবার কোত্থেকে আসছে! সামান্য একটু ফেটেছে!”

জিষ্ণু এবার কাতরাতে কাতরাতে আমার দিকে তাকাল, ”ক-টা স্টিচ পড়েছে রে আমার মাথায়?”

আমি বললাম, ”একটাও পড়েনি। তেমন কোনো গভীর ক্ষত হয়নি যে স্টিচ করতে হবে। তুই ভয়টা একটু কম পা। উনি ভালো করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছেন, রক্ত পড়া থেমে গেছে। চুপচাপ পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়।”

চিরন্তন এবার বলল, ”ঘুমিয়ে পড়লেই তো হল না, সন্ধে নেমে গেছে। আমরা রাতটা থাকব কোথায়? কোনো হোটেল-টোটেল তো খুঁজতে হবে।”

”এক কাজ করা যাক।” গৈরিক দিওতিমার দিকে তাকিয়ে বলল, ”আপনি একটু জিষ্ণুকে দেখুন, আমরা তিনজন বেরিয়ে কোনো হোটেল ঠিক করে এসে ওকে নিয়ে যাচ্ছি, বুঝলেন?”

দিওতিমা এবার উঠে দাঁড়াল, হেসে বলল, ”এই চত্বরে হোটেল? কাছেপিঠে কেন, তিন-চার কিলোমিটারের মধ্যেও কোনো হোটেল পাবেন না।”

”যাহ! তাহলে?” গৈরিক চিন্তান্বিতভাবে আমার দিকে তাকাল। আমাদের ড্রাইভার ছেলেটা আগেই সাফ জানিয়ে দিয়েছে, এই অবস্থায় সে আর গাড়ি চালাতে পারবে না। আজ জিষ্ণুর কপালে লেগেছে তবু একরকম, যদি ওর কপালে লাগত? তাহলে আমরা এতক্ষণে হয়তো সবাই ওপরে চলে যেতাম।

আমি কিছু বলার আগে দিওতিমা ওই নেপালি মহিলাকে হিন্দিতে বলল, ”এদের কোথায় রাখা যায় বলুন তো? বাইরে তো সাংঘাতিক অবস্থা!”

মহিলা দিওতিমার দিকে তাকিয়ে বলল, ”আমার এখানে দুটো ঘর। একটা ঘরে আমি আর তুমি শুয়ে পড়লে ওই ঘরটায় ওরা থাকতে পারে। ড্রাইভার নিয়ে চিন্তা নেই, ওরা গাড়িতেই শুয়ে পড়ে। তবে ওই ঘরটা অবশ্য ছোট, একটু কষ্ট করে থাকতে হবে।”

”নানা, আমাদের কোনো অসুবিধে নেই।” আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম। দুর্যোগের এই রাতে পাহাড়ের মধ্যে যে থাকতে পারছি, এই ঢের!

দিওতিমা মহিলাকে বলল, ”কিন্তু আপনার ছেলে? সে আসবে তো?”

মহিলা মাথা নাড়ল, ”না, ও তো কার্শিয়াঙে আটকে পড়েছে, রাস্তা ধস পড়ে বন্ধ। আজ ওখানেই কোথাও থেকে যাবে।”

”তাহলে আবার কী!” কাঁধ ঝাঁকাল দিওতিমা, ”আপনারা এখানেই থেকে যান। রাতও হয়ে গেছে। কাল সকালে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে’খন। আমি চলে যাব শিলিগুড়ি, আর আপনারা কী করবেন ভেবে দেখবেন।”

দিওতিমা'-র 'রাত হয়ে গেছে' কথাটা শুনে আমার মনে পড়ে গেল, আজ সন্ধেবেলা নানা তালেগোলে সন্ধ্যাহ্নিকটা আর করা হল না।

নিমেষে আমার মনে হল, দিওতিমা নয়, সামনে যেন বাবা'-ই দাঁড়িয়ে চোখ পাকাচ্ছেন আমায়।

"লজ্জা করে না তোমার? ভট্টাচার্য বাড়ির ছেলে হয়ে তুমি কিনা........।"

"হাঁ করে কি দেখছেন বলুন তো?" দিওতিমা ভ্রূ কুঁচকে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমি চটকা ভেঙে বললাম, "না না কিছু না।"

ছাব্বিশ

যে পরিস্থিতি থেকে, যাদের থেকে পালাতে চাই, ঈশ্বর বারবার তাদের মুখোমুখি, সেইসমস্ত অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মুখোমুখি আমাকে আচম্বিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কী পান?

যার সংশ্রব ত্যাগ করব বলে গত কয়েকদিন ফোন পর্যন্ত রিসিভ করিনি, কেন হঠাৎ তার সামনাসামনিই হতে হল আমায়?

সত্যি বলতে কী, সন্ধেবেলা গুমটির সামনে বসে যখন মঙ্গলরূপকে দেখতে পেয়েছিলাম, কোনো অ্যালার্ম সিগন্যাল ছাড়াই মনের ভেতরটা কেমন ভাল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু পরের মুহূর্তেই বিনির কথা মনে পড়তে মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মঙ্গলরূপের ফোন ধরিনি, কোনো যোগাযোগ রাখিনি, এমনকী কলকাতা ছাড়ার আগে সৌজন্যমূলক বিদায়ও জানাইনি সচেতনভাবেই, আর মঙ্গলরূপ নিজেই এখানে হাজির হয়ে গেল?

এইসময়েই মঙ্গলরূপকে উত্তরবঙ্গে বেড়াতে আসতে হল, আবার এই একই জায়গায়, একই রাস্তায় গাড়িও থামাতে হল!

তবে একটা ব্যাপার আশ্চর্য লাগছে, মঙ্গলরূপের মতো ছেলেও বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে আসে! এটা মনে করেই আমার হাসি পাচ্ছে। গৈরিক বলে ফরসা মোটা ছেলেটা তো একবার বলেই ফেলল, "প্রথমবার বাইরে এসে কী বিপদে পড়লি বল তো রূপ!"

এও হতে পারে, বিনিই হয়তো বিয়ের আগে স্বামীকে একটু হলেও স্বাবলম্বী হতে বলছে। ও-ই হয়তো বোঝাচ্ছে, বাবার ভয়টা কাটিয়ে একটু নিজের মতো ঘুরে এসো, নাহলে পরে আমাকে নিয়ে বেড়াবে কী করে?

ধুর, কী সব আবোলতাবোল ভাবছি আমি? কে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে এসেছে, কেন এসেছে, সেসব শুনে আমি কী করব? হঠাৎ দেখা হয়েছে, ওদের বন্ধুর একটা ছোট দুর্ঘটনা ঘটেছে, আমি সাধ্যমতো সাহায্য করেছি, ব্যাস এইটুকু! কোনোমতে আজ রাতটা কাটিয়ে কাল সকালে নীচে নামতে পারলে বাঁচি!

আমি আর মাসি রান্নাঘরে রুটি তৈরি করছিলাম। রান্নাঘর বললে অবশ্য ভুল হবে, রাস্তার ওপর যে ছোট্ট দোকানটা রয়েছে, তারই পেছনদিকে দুটো ছোট ছোট ঘর, একচিলতে রান্নার জায়গা আর বাথরুম। মাসির স্বামী মারা গেছেন অনেকদিন আগে, তিনিও শিলিগুড়ি দার্জিলিং রুটে গাড়ি চালাতেন। ছেলেও তাই চালায়। মাসি সকাল সকাল ঘরের কাজকর্ম সেরে গুমটিতে বসে। পথচলতি পর্যটকদের জন্য চা-কফি বানায়, মোমো-ও বানায়।

এত সীমিত সম্পদের মধ্যেও যে মানুষ কতটা আন্তরিক হতে পারে, নিজেদের অসুবিধা উপেক্ষা করে বিপদে পড়া মানুষগুলোর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারে, তা হয়তো এই মাসিকে না দেখলে বোঝা যেত না।

রাতের মেনু একদম সামান্য, মোটা মোটা রুটি আর আলু-ফুলকপির তরকারি। তাতেই সবাই প্রায় চেটেপুটে খেয়ে নিল।

রূপের যে বন্ধুটার মাথায় চোট লেগেছে, ব্যাটা বেজায় হ্যাংলা, এই অবস্থাতেও খান দশেক রুটি, সঙ্গে এখানকার ঝাল ঝাল আচার খেয়ে তারপরও বলে কী, "একটু মিষ্টিজাতীয় কিছু হলে ভালো হত!"

রূপ অবশ্য অমন নয়, বারবারই এত সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছিল মাসিকে। আমাদের রান্নায় সাহায্য করতেও এসেছিল, আমিই বারণ করলাম।

চিরন্তন বলে ছেলেটা বলছিল, "আপনি এই পাহাড়ে একা একা থাকেন? ভয় করেনা?"

"ভয় করলে কী করব? চাকরিটা তো করতে হবে!" আমি বলেছিলাম, "আমার কাছে চাকরিটা বিলাসিতা নয়, দরকারি।"

"তার মানে আপনি যে ওই আন্দোলনটা করছিলেন, সেটা মাঝপথেই বন্ধ করে দিলেন?" ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করেছিল গৈরিক।

খবরের কাগজের কল্যাণে আমি এখন এদের কাছে পরিচিত মুখ, অন্তত কিছুদিনের জন্য। তবে এমনিতেই কলকাতা ছেড়ে চলে আসার জন্য ফিকে হতে চলেছে আমার খবর, তার ওপর একজিনিস নিয়ে মিডিয়া বেশিদিন কচলায় না, ওদের নিত্যনতুন টপিক চাই। রূপও হয়তো আমার সম্পর্কে ওদের কিছু বলেছে।

"আন্দোলন আবার কী করলাম!" ভ্রূ ওপরে তুলেছিলাম আমি, "আমি একটা জনস্বার্থ মামলা করেছিলাম, একটা সাম্যনীতির জন্য, একটা সমান অধিকারের জন্য। সেটা আন্দোলন হতে যাবে কেন! আমি কোনো দলেও ভিড়িনি, বা কোনো রাজনৈতিক ঝান্ডাও ওড়াইনি। যদিও অনেকেই রাজনীতির হাত ধরে আমার ক্ষতি করেছে।" রূপের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বললাম আমি।

রূপ বুঝতে পেরেই পলকে মুখ নামিয়ে নিয়েছিল।

কিন্তু টিউবলাইটের আলোয় স্পষ্ট দেখেছিলাম ওর মুখটা এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। কোনো প্রতিবাদ করেনি।

জিষ্ণু ছেলেটা খালি এক কথা ঘ্যানঘ্যান করছিল, "সব ভেস্তে গেল। সব। এত কাণ্ড করে, অফিসে ছুটি ম্যানেজ করে এলাম, শালা ওয়েদারটা এমন বিট্রে করল!"

আমি খেয়ে নিয়ে ছবিদাদুকে ফোন করে সব বললাম, শুধু পুরোহিত সংগঠনের নেতার একমাত্র পুত্রের সঙ্গে আকস্মিক সাক্ষাতের ব্যাপারটা ছাড়া।

ছবিদাদু বললেন, "হুঁ। টিভিতে দেখাচ্ছে। উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর আর মালদাতেও অবস্থা খুব শোচনীয়। তোর্সা আর রায়ডাক উপচে পড়েছে। এর মধ্যেই প্রায় ত্রিশজন মারা গেছে। ষাট হাজারের ওপর বাড়ি ডুবে গেছে জলে। মুখ্যমন্ত্রী জরুরি ভিত্তিতে রিলিফ ক্যাম্প খুলতে নির্দেশ দিয়েছেন।"

আমি অবাক হলাম, "এত কিছু হয়ে গেছে! এসব তো কিছুই জানিনা।"

"জানবি কী করে? তোদের দার্জিলিং জেলায় তো ক্ষয়ক্ষতি এখনো তেমন হয়নি। কিন্তু মাঝখানের ওই জায়গাগুলোয় বন্যা হয়ে যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এখন ট্রেন কবে চলবে কিচ্ছু বলা যাচ্ছে না।"

"তাহলে?" আমি ঠোঁট কামড়ালাম, "কী করে ফিরব তাহলে? এখানেও তো আজ থেকে তুমুল বৃষ্টি। সেভক বন্ধ।"

"শিলিগুড়ি থেকে বাস ধরেও মনে হয় না কোনো লাভ হবে। কিষানগঞ্জের পর থেকে রাস্তা, ট্রেনলাইন সবই প্রায় জলের তলায়।" দাদু চিন্তা করছিলেন, "এক যদি বাগডোগরা থেকে প্লেন ধরতে পারিস!"

আমি বুঝলাম দার্জিলিঙে এসে প্রথম মাসের মাইনের সিংহভাগই আমার প্লেনভাড়ায় চলে যাবে। বললাম, "কাল সকালে উঠে কেমন অবস্থা থাকে দেখি। সমাদ্দার উকিলের কী খবর?"

"খবর ভালো। সমাদ্দারকে কাল অনেক করে বুঝিয়েছি। সে আজ একটা কাজের কাজ করেছে, মিডিয়া ডেকে প্রেস কনফারেন্স করে পুরো ব্যাপারটা জানিয়েছে। আজ সন্ধে থেকে তোর নিউজটা তাই আবার দেখাচ্ছে টিভিতে।"

ছবিদাদুর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে মা-কে ফোন করলাম। মা রীতিমতো উদ্বিগ্ন, অনেক কষ্টে শান্ত করলাম।

এই বাড়ির একদম পেছনদিকটায় রয়েছে একটা ছোট্ট ঝোলা বারান্দা, প্রায় খাদের গায়ে। খাওয়াদাওয়া হয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই, ওরা সব শুয়েও পড়েছে। আমি বারান্দার দিকে যেতেই দেখতে পেলাম রূপকে।

ঝোলা একটা পাঞ্জাবি পরে ও দাঁড়িয়ে রয়েছে বারান্দাটায়।

এই ঠান্ডায় খোলা জায়গায় এভাবে দাঁড়িয়ে, ঠান্ডা লাগছে না?

আমার পায়ের শব্দে রূপ চমকে পেছন ফিরল, "ওহ আপনি!"

আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম, "শুতে যাবেন না?"

"হ্যাঁ। এই যাব।" ছেলেটা উদাস ভঙ্গিতে আবার সামনের দিকে তাকাল।

সামনে নিকষকালো অন্ধকার পাহাড়, একঝলক দেখলে বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে। মনে হয় এই পড়ে যাব হাজার হাজার ফুট নীচে। দূরের উঁচু উঁচু গাছগুলোর ওপর আবছা চাঁদের আলো পড়ে কেমন যেন মায়াময় দেখাচ্ছে চারদিক। কোনো একটা নাম না জানা পাখি একটা অদ্ভুত করুণ সুরে ডাকছে।

"আমার ভাগ্যটা খুব খারাপ জানেন!" সহসা নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল রূপ।

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "ভাগ্য আবার আপনার সঙ্গে কী করল?"

"এই যে, জীবনে কোনোদিনও পাহাড়ে আসিনি। এই প্রথম বাড়ির একরকম অমতে বন্ধুদের সঙ্গে এলাম, ভাবলাম প্রকৃতিকে চেটেপুটে উপভোগ করব, কোথায় কী! কালই হয়তো ফিরে যেতে হবে বাড়ি।" রূপ হতাশ গলায় বলল, "তারপর আবার সেই একঘেয়ে জীবন।"

আমি কিছু বলার আগেই রূপের ফোন বেজে উঠল। ও ফোনটা রিসিভ করে কানে দিল, "হ্যাঁ আবীর বল ...আচ্ছা, অ্যারেস্ট করেছে? বাহ, খুব ভালো কথা। কী বলছে লোকটা? ... ওহ, তোদের উকিল তো বেশ দুঁদে তাহলে ... যাক বিশাল একটা ফাঁড়া কাটল। কী বলে যে তোকে থ্যাঙ্কস দেব ভাই ... বিনি এখন ঠিক আছে তো? ... ওর বাড়ির লোককে কিছু বলছে...?..."

ছেঁড়া ছেঁড়া কথায় আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। বেশি আগ্রহ দেখানোটাও সমীচীন নয়, তবু বিনি-র নামটা শুনে কিছুতেই যেন নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারলাম না।

রূপ ফোনটা বন্ধ করতেই আমার মুখ দিয়ে ফস করে বেরিয়ে গেল, "কী হয়েছে? বিনি ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ।" রূপ ইতস্তত করে বলল, "একটা সমস্যা হয়েছিল আর কী! এখন মিটে গেছে। আসলে বিনির ...।"

আমি বাধা দিয়ে বললাম, "আপনাদের জন্য আমার অনেক শুভেচ্ছা রইল।"

রূপ এবার মনে হল কিছু বুঝতে পারছে না, আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "শুভেচ্ছা? কিসের শুভেচ্ছা?"

যেসব লোকজন সব বুঝতে পেরেও কিছু না বোঝার ভান করে ন্যাকামো করে, তাদের দেখলে আমার গা-পিত্তি জ্বলে যায়।

রূপকে অন্যরকম ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি ভুল বুঝেছিলাম। এ-ও বিনির মতোই মিটমিটে।

আমি কৃত্রিম হেসে বললাম, "বাহ! কিসের আবার। আপনাদের বিবাহিত জীবনের।"

"মানে?" রূপ দেখছি এখনো হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে, "কার বিয়ে? কাদের বিবাহিত জীবন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

এবার আমার বিরক্ত লাগল। এই ছেলেটা কি ইচ্ছে করে আমার সামনে এমন ভান করছে? এদিকে সেদিন বাসে ভাবী স্ত্রীর ডাকে তো আমার সামনে থেকে লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিল।

আমি একটু কড়া গলায় বললাম, "অদ্ভুত তো! এইরকম বোকা সাজছেন কেন? বিনির সঙ্গে আপনার বিয়ে ঠিক হয়নি?"

সাতাশ

আমি বিশেষ রোম্যান্টিক কিনা জানিনা, কারণ কোনোদিনও রোম্যান্স করার সুযোগ হয়নি। পার্বণীর সঙ্গে যেটুকু হয়েছিল, সেটাকে আর যাই হোক, রোম্যান্স বলা চলে না।

কিন্তু এই অন্ধকার নিশুতি রাতে পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে বাঁকা চাঁদের নরম আলো গায়ে এসে পড়লে সবাই একটু ভাবুক হয়ে পড়ে। এমনিতেই এত গভীর রাতে একাকী কোনো অচেনা স্বল্পপরিচিত মেয়ের সঙ্গে এভাবে কোনোদিনও আগে কথা বলিনি।

তার ওপর যতই হোক, আমি আঁকিয়ে মানুষ, একটু কেমন হয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু দিওতিমার মুখে আমার আর বিনির বিয়ের কথা শুনে আমার ভাব তো কেটে গেলই, আমি কী বলব বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

"চুপ করে রয়েছেন কেন?" দিওতিমা ধমকে উঠল, "আপনারা ছেলেরা কী অদ্ভুত, একজনকে জীবনসঙ্গিনী করবেন, তা স্বীকার করতে এত কুণ্ঠা কিসের?"

"কুণ্ঠা থাকতে যাবে কেন!" আমি খাবি খেতে খেতে কোনোমতে বললাম, "আ-আপনি ভুল করছেন। বিনির সঙ্গে আমার কেন বিয়ের ঠিক হতে যাবে। বিনি তো আমার বোন টিকলির বন্ধু। ও সম্প্রতি একটা বিপদে পড়েছিল, তাই আমরা কয়েকজন ওকে একটু হেল্প করছিলাম ...!"

দিওতিমার মুখ দেখে মনে হল, ও এবার সত্যিই অবাক হয়েছে, "ওমা! বিনি যে বলল ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে, সেদিন বাসে আপনাকে আর ওকে দেখে আমি ...!"

"না না।" আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, "বিনির বিয়ে ঠিক হয়েছিল একটা বাজে ছেলের সঙ্গে। সে এক লম্বা গল্প, পরে সময় করে বলব'খন। বিয়েটা ভেঙে গেছে, এটাই যা ভালো ব্যাপার। নাহলে পরে ওর কপালে অশেষ দুর্গতি ছিল।"

"ওহ! এদিকে আমি কি না কি ...!" দিওতিমা এখনো ওর মুহ্যমান ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, "ও ঠিক আছে তো?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ বিনি এখন ঠিক আছে।" আমি বললাম, "আপনাকে তো সেদিনের পর থেকে আমি অনেকবার ফোন করেছিলাম, মেসেজও করেছিলাম। কোনো রেসপন্স পাইনি। আমি তো জানতামই না আপনি এখানে রয়েছেন! ট্রান্সফারের ব্যাপারে কিছুই খবর পাইনি।"

দিওতিমা কী যেন ভাবছে, আমার কথায় চমক ভেঙে বলল, "হ্যাঁ? হ্যাঁ ... মানে আর ফোনটা আর কী ... আসলে ট্রান্সফার অর্ডারটা হঠাৎ করেই এসেছিল ... দু-দিনের মধ্যেই চলে আসতে হল ... কাউকে জানাতে পারিনি।"

আমি বললাম, "আপনাকে ওই ব্যাপারটার জন্যই তড়িঘড়ি কলকাতা থেকে সরিয়ে দিল, তাই না!"

"হ্যাঁ। একদিন লোকাল এম এল এ বাড়ি এসে হম্বিতম্বি করল। বলল কেসটা উইথড্র করে নিতে। উলটোপালটা বলছিল, আমারও মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল, দিয়েছিলাম দু-কথা শুনিয়ে। তারপরেই অর্ডারটা এল। আপনাদের ওই ঝন্টুও তো পার্টির লোক। সে-ও একদিন হাওড়া স্টেশনে হাত ধরে ...।" দিওতিমা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীচের

ঠোঁটটা কামড়ে ধরল, "ধুর! ভাবছি কোনোমতে কলকাতা পৌঁছতে পারলে কেসটা তুলেই নেব। এত হাঙ্গামা আর পোষাচ্ছে না!"

"সেকি!" আমি বলে উঠলাম, "কেন? এতদূর এগিয়ে এসে পিছু হটবেন কেন? ক-জনের সাহস হয় আপনার মতো একা লড়ে যাওয়ার?"

"কি করতে পারলাম লড়ে? আমি আমার বাজে ট্রান্সফারের কথা বলছি না, সে নাহয় মেনে নিলাম। কিন্তু আমার উকিল, রাজেন সমাদ্দার, তাকে পর্যন্ত হ্যারাস করছে, তার বাচ্চা ছেলেকে মেরে ফেলার হুমকি দিচ্ছে। এসব কী বলুন তো!"

"কারা এসব করছে?"

"কারা আবার? আপনাদের ওই ঝন্টুর দল! পেছন থেকে ওদের মদত দিচ্ছে অরূপ কাঞ্জিলালের মতো দুর্নীতিগ্রস্ত পার্টির নেতারা। আসলে আমাদের সিস্টেমটাই এমন হয়ে গেছে, যে পালটানোর সদিচ্ছা থাকলেও কেউ পালটাতে পারবে না। সবাই আপনাকে নীচ থেকে প্রাণপণ টেনে ধরবে, আটকে দেবে আপনার চলন। আপনি যতই চেষ্টা করুন, ওরা সোজাপথে না পেরে বাঁকাপথে আপনার গলা টিপে ধরার চেষ্টা করবে।" দিওতিমার গলায় তীব্র হতাশা ঝরে পড়ছিল, "একা একা বিপ্লব করা যায় না, বুঝলেন!"

"কিন্তু। আপনি যেভাবে আঁচড় কেটেছেন, তাতে পুরোহিত সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষ প্রতিবাদ করলেও সাধারণ মানুষ কিন্তু আপনার স্বপক্ষেই আছে। আমি কয়েকদিন আগেও এই নিয়ে একটা সভার খবর পড়েছি। সাধারণ জনতা কিন্তু চাইছে যে পুরোহিতদের কোনো একটা গুণমান যাচাইয়ের পরীক্ষা নেওয়া হোক।"

"জানিনা!" কাঁধ নাচাল দিওতিমা, "আমার মধ্যে আস্তে আস্তে একটা উদাসীনতা চলে আসছে। যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, যে স্বপ্ন থেকে তখন মামলাটা করেছিলাম, সেটা কেমন যেন ফিকে হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির লোকেরও কোনো সমর্থন নেই। মা-ও বারণ করছেন।"

"দেখুন, স্রোতের উলটোদিকে হাঁটতে গেলে আপনাকে তো হোঁচট খেতেই হবে। তবু আপনি যে কনভেনশনের সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত না করে পালটানোর দিকে এগিয়েছেন, এতে যে যাই বলুক, আমার কাছে কিন্তু আপনি একজন সাহসী মেরুদণ্ডী মানুষ হিসেবে অনেক উঁচুতে অবস্থান করছেন।" ঝোঁকের মুখে কথাগুলো বলে ফেলে আমি দিওতিমার দিকে থতমত মুখে তাকালাম।

ও-ও বেশ অবাক চোখে আমাকে দেখছে। হয়তো আশা করেনি, আমার মতো ক্যাবলা ছেলে এইরকম কথাবার্তা বলতে পারে।

আমি একটু দম নিয়ে আবার বললাম, "আর বিশ্বাস করুন, আমাদের সংগঠনে আমার কোনো ভূমিকা নেই। তবু আপনার প্রতি ঝন্টুর এই সব কাজকর্ম শুনে আমার নিজেরই ছোটো লাগছে। ঝন্টু কিন্তু আমাদের সংগঠনের কেউ নয়, আর প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার বাবাও এইসব নোংরা কাজকে সাপোর্ট করেন না। কিন্তু কিছু মাঝখানের লোকজনের মাতব্বরির জন্য ঝন্টুর মতো বেনোজল ঢুলে পড়ছে আমাদের সংগঠনে। আমি জানি ওদের উদ্দেশ্যটাই অসৎ, কিন্তু কী করব!" মাথা নীচু করে ফেললাম আমি, "আমার কথার কোনো দাম নেই দলে।"

"আচ্ছা, আপনি আমাকে আঁকতে পারবেন?" হঠাৎ বলল দিওতিমা।

এমন অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে আমি হকচকিয়ে গেলাম।

এইজন্যই জিষ্ণু বলে, মেয়েদের কথাবার্তার কোনো তল পাওয়া যায় না।

ঠিকই বলে।

এভাবে দুমদাম ট্র্যাক চেঞ্জ করলে কতক্ষণ নিজেকে স্মার্ট দেখাতে পারব আমি?

বললাম, ”আপনাকে আঁকতে … মানে?”

”না মানে আপনি তো আঁকেন।” দিওতিমা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করল, ”আগের দিন বলেছিলেন যে? তাই ভাবছিলাম কেউ তো কখনো আমার ছবি আঁকেনি, কেমন লাগবে একটা কৌতূহল হচ্ছিলো আর কী! অবশ্য আপনারা শিল্পীরা তো সুন্দর মেয়েদেরই আঁকেন!”

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম, এমন সময় ওর একটা ফোন ঢুকল, তাতে ও বেশ উত্তেজিত হয়ে কথা বলতে লাগল, ”সেকি … কখন? … তারপর? পুলিশ কী বলছে? …?”

চিরকাল দেখেছি মোবাইল ফোন আমার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এই সুন্দর মুহূর্তেও তাই হল।

দিওতিমা ইশারায় আমাকে বিদায় জানিয়ে কথা বলতে বলতে উদ্ভ্রান্তভাবে ঘরে চলে গেল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি আবিষ্কার করলাম, ফিনফিনে একটা পাঞ্জাবি পরে এই খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে আমার প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগছে। এতটাই শীত করছে যে আর দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না।

অদ্ভুত, এতক্ষণ কিছু মনেই হয়নি!

ভাবতে ভাবতে ঘরে গেলাম আমি।

আঠাশ

"কী বলছ তুমি?" আমি শুনতে শুনতে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম, "কতবড় পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে ঝন্টুর মতো চ্যাংড়া ছেলেরা এতটা সাহস পেতে পারে!"

"যা বলছি, চুপচাপ শুনে যা।" ছবিদাদু বলে যাচ্ছিলেন, "প্রেস কনফারেন্স শেষ হওয়ার আগেই বাড়িতে এরকম হামলা হওয়ার খবর পেয়ে সমাদ্দার তো উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। চিরকুটে ছেলের ক্ষতি করার হুমকি থাকলেও ভরদুপুরবেলা আট-দশটা ষণ্ডা গুন্ডা ছেলে যে লোহার রড, লাঠি নিয়ে বাড়িতে চড়াও হবে, এটা কে-ই বা কল্পনা করতে পারে!"

"তারপর? সমাদ্দার বাড়ি চলে গেল?"

"সমাদ্দার আমাকে ফোন করেছিল, কী করবে জানতে চেয়ে। আমি বললাম তুমি ইমিডিয়েটলি প্রেসের রিপোর্টারদের নিয়ে বাড়িতে যাও। তাতে কভারেজটা আরও জোরদার হবে। কতটা কাঁচা কাজ ভাব, একবার তো খবর নেবে যে সমাদ্দার তখন কী করছিল।"

"তারপর কী হল?" আমি টেনশনে নখ খেতে শুরু করলাম।

আড়চোখে দেখলাম রূপ আমার দিকে ভ্যাবলার মতো তাকিয়ে রয়েছে। কী হয়েছে কিছুই বুঝতে পারছে না।

অন্যসময় ঝন্টুর বাঁদরামির খবর পেলেই আমি রূপের ওপর রাগ দেখিয়েছি। কিন্তু এখন তো বুঝছি, এতে রূপের কোনো দোষ নেই।

বেচারা ঠান্ডার মধ্যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? তার চেয়ে আমি ঘরে চলে যাই বরং।

আমি ইশারায় ওকে বিদায় জানিয়ে ঘরে আসতে আসতে ছবিদাদু বলে চলেছিলেন, "তারপর আবার কী? সমাদ্দারের বাড়ি গিয়ে গুন্ডাগুলো ওর বউয়ের ঘাড়ে রদ্দা মেরেছিল। সঙ্গে শাসানি। ভাঙচুর। ওর বউ পরে সব বলেছে মিডিয়াকে, দেখিয়েছে কোথায় কী কী করেছে। সন্ধে থেকে এখন সব চ্যানেলে দেখাচ্ছে খবরটা। মিডিয়া থেকে ক্রমাগত চাপ খেয়ে লোকাল থানায় তদন্তের নির্দেশ এসেছে ওপরমহল থেকে। এখন একটা চ্যানেলে পুরোটা এক্সক্লুসিভ হিসেবে দেখাচ্ছে, কীভাবে তোকে দিনের পর দিন হ্যারাসড হতে হয়েছে, কীভাবে তোর উকিল সমাদ্দারকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে। তুই একদম চাপ নিস না। আমাকেও দুটো চ্যানেল থেকে ফোন করেছিল। আমি সব বলেছি গুছিয়ে।"

"মা ঠিক আছে তো দাদু? তুমি মা-র খোঁজখবর নিচ্ছ তো?" আমি কাতরভাবে বললাম। যারা সমাদ্দারের মতো উকিলের বাড়িতে ভরদুপুরে হামলা করতে পারে, তারা মা-র মতো একা থাকা একজন মহিলাকে যে কী করবে তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

"তোর মা আমারে বাড়িতে রয়েছে। তুই চিন্তা করিস না। তোর আসাটা আটকে গিয়েই আরও গোলমাল হল।"

দাদু ফোনটা কেটে দিতে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। কী জানি কী হবে। রূপ যতই ভরসা জোগাক, আমি নিজেই বুঝতে পারছি, মনের দিক থেকে যেন আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ছি আমি। মনে হচ্ছে কী লাভ এসব করে!

মা-ই ঠিক বলত। আর সত্যিই তো, মা এতদিন খেটে খুটে আমাকে বড়ো করল, কোথায় আমি এখন তার পাশে থাকব, তা নয়, বনের মোষ তাড়াতে গিয়ে আমাকে এখন থাকতে হচ্ছে কত দূরে!

এভাবে সম্পূর্ণ অপরিচিত কারুর বাড়িতে কখনো থাকিনি। তবু পরিস্থিতির চাপে অনেক কিছুই মানিয়ে নিতে হয়।

মাসি মহিলাটি খুবই ভালো, আমার জন্য একটা ছোট ক্যাম্পখাটে বিছানা করে দিয়ে নিজে শুয়েছে একটা গদিতে। আমার শত আপত্তিতেও শোনেনি। কিছু মানুষ আছে অন্যের অসুবিধা হওয়ার চেয়ে নিজে অ্যাডজাস্ট করতে ভালোবাসে। ইনিও তেমনই।

আর আমি? ঠিক উলটো। নিজের একটা জেদ বজায় রাখার জন্য মা, ছবিদাদু, রাজেন সমাদ্দার, প্রত্যেককে সমস্যায় ফেলছি। এমনকী, ওই মানকুর স্কুলের ছেলেটা তো বলল, আমার জন্য রূপের সঙ্গে ওর বাবারও মনোমালিন্য হচ্ছে।

বিছানার পাশেই জানলা, যদিও বা সেটা বন্ধ, ঘষা কাচের এপার থেকে দূরের আকাশটা দেখতে দেখতে আমি ভাবলাম, সত্যিই কি আমি এতটাই স্বার্থপর? মা-র যদি কিছু হয়ে যায়? নিজে দুর্গাপুজোয় পৌরোহিত্য করে, পুরোহিতদের লাইসেন্স চালু করে পারব তো মা হারানোর সেই দুঃখ সামলাতে?

কতক্ষণ এইভাবে আকাশপাতাল ভাবছিলাম জানিনা। হঠাৎ দরজার কাছে একটা মৃদু আওয়াজে সম্বিৎ ফিরে পেলাম। কেউ একটা দরজার কাছে শব্দ করছে খুট খুট করে।

আমি চমকে মাসির দিকে তাকালাম। ভদ্রমহিলা ঘুমোচ্ছেন। একে আমাদের মতো এতজন অনাহূত অতিথি আজ ওর ঘর দখল করেছি, তার ওপর এই মাঝরাতে ঘুম থেকে তোলাটা ঠিক হবে? তার চেয়ে আমিই বরং গিয়ে দেখি।

বিড়াল টিড়াল কি? হতে পারে। এদিকের লোকেরা খুব বিড়াল পোষে।

আমি সাবধানে পা ফেলে দরজার কাছে যেতেই দেখি রূপ দাঁড়িয়ে রয়েছে কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে।

"আপনি? এত রাতে? কী করছেন বাইরে?" হাই তুলে বলি আমি।

রূপ ফিসফিস করে বলল, "আপনি তো এখুনি আসছি বলে চলে এলেন, আমি তো অপেক্ষা করেই যাচ্ছি! এই ঠান্ডায় আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না যে! জ্যাকেট তো সব ট্রলিতে, বেরও করা হয়নি।"

আমার চোখ কপালে ওঠার উপক্রম, তবু যতটা সম্ভব গলা নামিয়ে বলি, "মানে? আপনি এতক্ষণ ওই বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন নাকি?"

"হ্যাঁ তো।"

রূপ অসহায় গলায় এমনভাবে কথাটা বলল যে আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না। গায়ের চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে বেরিয়ে এলাম বারান্দায়।

"আচ্ছা পাগল লোক তো আপনি?" আমি হাত নেড়ে বললাম, "আমি তো ঘুমোতে যাচ্ছি ইশারায় বলে গেলাম।"

"বুঝতে পারিনি।" রূপ বোকা বোকা হাসল।

"আপনাকে যে আপনাদের দলের লোকেরাই কেন ক্যাবলা বলে সেটা এতদিনে বুঝলাম।" আমি ছদ্মরাগে বললাম, "আচ্ছা, আপনি এত ভিতু কেন বলুন তো?"

রূপ এবার একটু থেমে বলল, "ভিতু? না, আমি ঠিক ভিতু নই। কিন্তু কাউকে কষ্ট দিতে ভালো লাগে না। মনে হয়, মনোমতো কাজ না করলেই সামনের মানুষটা কী ভাববে!"

আমি হাসলাম, "আপনি এত বড় ধার্মিক পরিবারের ছেলে। এত গুণের। আর এটা বোঝেন না যে সবাইকে খুশি করা কারুর পক্ষে সম্ভব নয়। আপনি যদি সবসময় নিজের ইচ্ছে বা নিজের চাহিদাটাকে চেপে রেখে উলটোদিকের মানুষটাকে খুশি করতে যান, তাহলে সেটা সে আপনার মহত্ত্ব নয়, দুর্বলতা ভাবতে শুরু করবে। সে আপনার কাছ থেকে উপকারও নেবে, আবার আপনাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্যও করবে। আপনার চরিত্রের দৃঢ়তা কি তাতে ম্লান হবে না?"

রূপ মন দিয়ে শুনছিল। আমি থামতেই বলে উঠল, "কিন্তু কাউকে আঘাত করতে আমি কিছুতেই পারি না জানেন, এইজন্য অনেক ঠকতে হয়েছে আমাকে।"

আমি বললাম, "আঘাত কেন? 'না' বলতে শেখাটা কিন্তু খুব জরুরি। আর কাউকে 'না' বলা মানেই আঘাত করা নয়। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে না গিয়ে আপনি সেক্ষেত্রে নিজের কথাই কিন্তু শুনলেন। এতে যাকে আপনি 'না' বলছেন, তিনি সাময়িক ক্ষুণ্ণ হলেও এটুকু বুঝবেন আপনার একটা নিজস্ব আবর্ত আছে। নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আছে।"

রূপ দ্বিধাগ্রস্তভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "আমি মুখের ওপর কিছু বলতে পারি না বলে সবাই সেটার অ্যাডভান্টেজ নেয়।"

"সে তো নেবেই।" আমি হেসে বললাম, "অধিকাংশ মানুষই তো সেটাকে দুর্বলতা ভাবে। শুনুন মঙ্গলরূপ, ভাগবতগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, "জীবন আসলে একটা যুদ্ধক্ষেত্র। আমাদের প্রতিনিয়ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। নিজেদের দাবীগুলো দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করাটাই কিন্তু বেঁচে থাকা। সেই অনুযায়ী, অন্যকে খুশি করতে করতে আপনি নিজের জীবনটা কি আদৌ বাঁচছেন?"

রূপ কোনো কথা বলছিল না।

আমি বললাম, "আগে নিজের মনের কথা শুনুন। তবেই দেখবেন অন্যরাও আপনাকে সমাদর করবে। আর কেউ যদি আপনাকে সম্মান না দিতে চায়, সম্মান কেড়ে আদায় করে নেবেন। সেটাই হবে আপনার জয়।" আমি একটা হাই তুললাম "যাই হোক, অনেক ভারী ভারী জ্ঞান দিয়ে ফেললাম। এবার বলুন তো, কী বলতে ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে আনলেন?"

রূপ যেন ঘোর ভেঙে জেগে উঠল। তারপর লজ্জা লজ্জা মুখে একটু হাসল, পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

"কী এটা?" আমি কাগজটা হাতে নিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। এই বারান্দায় কোনো আলো নেই। দূরের একফালি চাঁদের আলোয় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আমি মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে কাগজটা চোখের সামনে ধরলাম। আর বিস্ময়ে প্রায় বোবা হয়ে গেলাম।

একটা লেটারপ্যাডের ছেঁড়া পাতা, ওপরে সান্দাকফুর মতো বেশ কিছু জায়গার নাম হিজিবিজি করে লেখা। বোঝাই যাচ্ছে এই কাগজে রাফভাবে ঘোরার খসড়া হয়েছে।

কিন্তু কাগজটার নীচের দিকে সাধারণ ডট পেনে আঁকা একটা ছবি।

ব্যস্তসমস্ত একটা পুরোনো দিনের অফিস ঘর। ছাদে কড়িবরগা, গোল গোল জানলা। চারপাশে প্রচুর মানুষের ভিড়, কেউ মাটিতেই বসে পড়েছে, কেউ আবার ঝোলা কাঁধে অপেক্ষায়।

তারই মধ্যে সামনের টেবিলে বসে রয়েছে একটা মেয়ে। মেয়েটা এক হাতে আঙুল নেড়ে কিছু বলছে, একইসঙ্গে অন্য হাতে একটা কাঁটাচামচ পুরছে মুখে, সেই কাঁটাচামচের ডগায় একটা ওমলেটের টুকরো।

সামান্য পেন দিয়ে আঁকা কি অসম্ভব ডিটেইলড একটা ছবি!

ছবির আঁকাটা যে আমি, সেটা একটা বাচ্চা ছেলেও বলতে পারবে। আমার চুলটা ঠিক সেইভাবে ছবিতে বাঁধা, যেভাবে হাইকোর্টে মঙ্গলরূপের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিন আমি বেঁধেছিলাম।

আমি অবাকমুখে রূপের দিকে তাকালাম।

যা ভেবেছি ঠিক তাই।

রূপ যথারীতি লজ্জাবতী লতা হয়ে মুখ নীচু করে ফেলেছে, অস্পষ্ট স্বরে বলছে, "ইয়ে মানে ঘুম আসছিল না ... তাই মনে হল আপনি একটা ছবি এঁকে দিতে বলেছেন। হাতের কাছে তো কিছু নেই, আলোও জ্বালাতে পারছি না, ওরা জেগে যাবে। তাই মোবাইলের আলোতেই এমনি পেন দিয়ে ...।"

"দারুণ হয়েছে! সিরিয়াসলি! আপনি দুর্দান্ত আঁকেন।" আমি কী বলব কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

"না।" রূপ এবার গলাখাঁকারি দিয়ে বলে উঠল, "অবজেক্ট সুন্দর হলে আঁকিয়ে এমনিই ভালো আঁকবে।"

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে চুপ করে গেলাম। কোনোদিক থেকেই আমি সুন্দরী নই। ছোট থেকে অনেক সংগ্রাম করে বড়ো হয়েছি আমি, লজ্জাটজ্জা পাওয়াও আমার ধাতে নেই। তবু এই পাহাড়ের ওপর নিশুতি রাতে রূপের কথা শুনে আমার মুখে যেন চাপ চাপ রক্ত এসে জমা হল।

আমি ইতস্তত করে বললাম, "আমি শুতে যাচ্ছি।"

"ইয়ে ... মানে আরেকটু গল্প করলে হয় না?" রূপ কাতরস্বরে বলল, "আমি তো ঘর থেকে কম্বল জড়িয়ে এলাম ওইজন্য।"

ওর কথা বলার ভঙ্গিতে এবার আমার হেসে গড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে হল।

খেয়ালই করিনি, ছেলেটা একটা আস্ত কম্বল জড়িয়ে চলে এসেছে।

সোয়েটার ট্রলিতে আছে বলে শেষমেশ কম্বল?

আমি এবার মনে মনে কিছুক্ষণ ভাবলাম।

আমার ভেতরের সেই মন সুযোগ পেয়েই বলে উঠল, "এ যে ধরনের ছেলে, আমি যদি আগামী একশো বছর ওর সঙ্গে এভাবেই 'আপনি-আজ্ঞে' করে যাই, ও-ও তাই করে যাবে। মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস ওর হবে না। তাই সে আশায় থেকে কিন্তু কোনো লাভ নেই।"

আমি নীরবে মনকে বললাম, ”মানে? কিসের আশা? রূপ আমার বিপক্ষ দলের নেতার ছেলে।”

”তো কী?” মন খনখনিয়ে উঠল, ”ও তো আর তোমার শত্রু নয়! কি ভালো ছেলে দেখেছ? কি ভদ্র, কি গুণের? তোমার মতো বেগুন নয়।”

আরও কিছুক্ষণ নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমি রূপের দিকে তাকালাম, ”এইরকম পেনে আঁকা হলে হবে না। ভালো করে একটা বড় পোর্ট্রেট এঁকে দিতে হবে।” তারপর সামান্য থেমে বললাম, ”কলকাতায় ফিরে দেবে তো?”

আমার মুখে ‘দেবে’ শুনে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম রূপ পুরো ভেবলে গেছে। কী বলবে বুঝতে পারছে না।

কম্বলের তলা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বের করে আনছে একটা রুমাল। তা দিয়ে মুখ মুছছে।

আমি হাসি চাপছি অন্যদিকে তাকিয়ে। জানিনা যেটা করছি সেটা ঠিক কিনা, বা এর জন্য আমাকে পরবর্তীকালে বড় কোনো মাশুল দিতে হবে কিনা, কিন্তু যুক্তির মই বেয়ে সবসময় তো মন ওঠে না।

আমার বুকের ভেতরটা যেন হাজার প্রজাপতি গুনগুন করছে।

”দেব। আমরা তো কাল প্লেনে করে ফিরব কলকাতা।” রূপ আমতা আমতা করে বলল, ”আপনি … মানে তু-তুমিও কি আমাদের সঙ্গে ফিরবে?”

আমি বললাম, ”এখন তো প্লেনের ভাড়া আকাশছোঁয়া হবে। দেখি কী করি .. বাসের দিকটা একবার …।”

”না মানে ইয়ে …।” রূপ আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিল। কী একটা যেন প্রাণপণ দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে ও, বলল, ”একসঙ্গে ফিরলে হয়না?”

উনত্রিশ

প্লেন কলকাতার মাটি ছুঁতে না ছুঁতেই ফোন আসা শুরু হল। তখনও লাগেজ নিতে পারিনি আমরা। প্রচণ্ড ভিড়। সবাই ঠেলাঠেলি করছে, কে আগে নিজের লাগেজ নিয়ে বেরোবে। এয়ারপোর্টও আস্তে আস্তে রেলস্টেশনে পরিণত হচ্ছে।

দিওতিমা আমাদের সঙ্গেই ছিল। কাল রাতের পর থেকে মেয়েটা একটু চুপচাপ হয়ে গেছে, খেয়াল করছিলাম আমি। সকালে উঠে যখন আমরা একটা গাড়ি ঠিক করে রওনা দিলাম শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে, তখনও কথা বলেনি বিশেষ। নেপালি ওই ভদ্রমহিলা সত্যিই ভালো, এতবার অনুরোধের পরেও একটা টাকাও নিলেন না আমাদের থেকে।

ওঁর সাফ কথা, এমনি ভাড়া দিলে টাকা নেওয়া যেত, কিন্তু যেহেতু বিপদের সময় আমরা থেকেছি, উনি কিছুতেই টাকা নেবেন না।

সত্যিই, আমাদের সান্দাকফু ঘোরা হল না ঠিকই, কিন্তু সামান্য একজন পাহাড়ি মহিলার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু শিখলাম।

জানলাম কীভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়।

আমি আড়চোখে দেখলাম, দিওতিমা লাগেজ বেল্টের সামনে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে আছে, কী একটা চিন্তা করছে গভীরভাবে।

গৈরিক আর চিরন্তনও অন্য ট্যুরিস্টদের মতো হুড়োহুড়ি করছে নিজেদের মালপত্র এল কিনা দেখার জন্য।

ওদিকে জিষ্ণু এখনো ককিয়ে যাচ্ছে, দূরে একটা সিটে বসে অর্ডার দিয়ে যাচ্ছে, "এইটা কর, ওদিকে গিয়ে দ্যাখ।" ইত্যাদি ইত্যাদি।

এত গোলমালে কিছু শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমি ফোনটায় হাত চাপা দিয়ে একটু সরে এলাম।

মা ফোন করেছেন, "তুই কোথায়?"

বাগডোগরা ছাড়ার আগেই মা-কে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে আমরা আজই ফিরছি। আমি বললাম, "এই তো দমদমে নামলাম।"

"একটু তাড়াতাড়ি আয়।" মা উদ্বিগ্ন গলায় বলল।

"কেন কী হয়েছে?"

"জগদীশকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। কাল কোন উকিলের বাড়ি নাকি ওরই নির্দেশে হামলা চালিয়েছিল ঝন্টুর দল। ঝন্টু ওঁর নাম বলেছে। পুলিশ বাড়ি এসে গ্রেপ্তার করেছে ওদের। তোর বাবা খুব ভেঙে পড়েছেন।"

মা-র কথা শুনতে শুনতে আমি টের পাচ্ছিলাম বন্যার মতো মেসেজ ঢুকছে ফোনে, বিভিন্ন নিউজ চ্যানেলের আপডেট।

প্রতিটা চ্যানেলের ফ্ল্যাশ নিউজ প্রায় একইরকম।

"মহাদ্বিতীয়ার পুণ্য লগ্নে মুখ্যমন্ত্রী এক যুগান্তকারী ঘোষণা করেছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন এবার থেকে পাঁচ হাজার বা তার চেয়ে বেশি বাজেটের যেকোনো পুজো করতে গেলেই লাইসেন্সড পুরোহিত লাগবে। সেই লাইসেন্স নেওয়ার জন্য দিতে হবে পরীক্ষা। প্রত্যেক মাসে একবার করে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে। বয়স, জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ নির্বিশেষে যে কেউ সেই পরীক্ষায় পাশ করে পৌরোহিত্য করতে পারবেন। এবারের দুর্গাপুজোর পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে মহাচতুর্থীর দিন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, মাস কয়েক আগে দিওতিমা বিশ্বাস নামে এক তরুণী এই নিয়ে একটি জনস্বার্থ ...।"

পড়তে পড়তে কখন আমি কাঁপতে শুরু করেছিলাম, নিজেও জানিনা।

মুখ্যমন্ত্রী এও জানিয়েছেন, আজকের এই সাম্যের দিনে শুধু ব্রাহ্মণরাই, শুধু পুরুষরাই পুজো করার অধিকারী হবেন এ সত্যিই অতি পুরোনো চিন্তাভাবনা। জাতে নয়, মনে, চরিত্রে ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সর্বোত্তম হতে হবে।

প্রতিটা চ্যানেলে দিওতিমার ছবি জ্বলজ্বল করছে, সব প্রতিকূলতার মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে দিওতিমা আজ জয়ী!

কিন্তু আমি যেন দিওতিমাকে ছাড়াও আরও একজনের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম সেই ছবিগুলোর মধ্যে।

সেই মুখটা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কৌতুকমাখা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে মিটমিট করে। বলছে, "কেমন মজা!"

তিনি আমার ছোটকাকা।

আমি দৌড়ে গেলাম দিওতিমার দিকে।

******

বাবা বৈঠকখানা ঘরে মাথা টিপে ধরে বসেছিলেন। বাবাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরও প্রায় কুড়ি পঁচিশজন লোক। সবার মুখেই শোকের ছায়া। যেন কেউ মারা গেছে এই বাড়িতে।

আমি দরজা দিয়ে ঢুকে থমকে দাঁড়ালাম। মা-র কাছে আগেই শুনেছি জগদীশকাকাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে, সঙ্গে ঝন্টুকেও। ঝন্টুর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পদ আমাদের সংগঠনে না থাকলেও এই কয়েকদিনে বাবার বিভ্রান্তি আর জগদীশকাকার প্রশ্রয়ের সুযোগ নিয়ে ও অনেকদূর পৌঁছে গিয়েছিল।

বাবার ঠিক পাশেই বসে আছেন রঘুবীরজ্যাঠা। আত্মারামদার বাবা। এই মানুষটা শিক্ষিত নয় ঠিকই, তথাকথিত প্রজ্ঞা নেই, কিন্তু মানুষ হিসেবে অন্তত খারাপ নয়। অন্তত আত্মারামের থেকে অনেক ভালো।

শোকসন্তপ্ত মুখে তিনি সান্ত্বনা জানাচ্ছেন বাবাকে।

সুদেবদা বরাবরই মাতব্বরি করে, ইদানীং ঝন্টুর আবির্ভাবে একটু গুটিয়ে গিয়েছিল। এখন আবার বেশ হম্বিতম্বি করছে চারদিকে।

ফোনে কাকে একটা উচ্চগ্রামে বলে চলেছে, "হ্যাঁ হ্যাঁ, যত টাকা লাগে দেওয়া হবে। তুই শুধু লোকজন নিয়ে চলে যা উত্তরপাড়া … বুঝিয়ে দে আমাদের কতটা জোর।"

অন্যসময় হলে দিওতিমার বাড়িতে হামলা চালানোর কথা শুনে আমি হয়তো অস্থির হয়ে উঠতাম, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করতে পারতাম না। মুখ ফুটে কাউকে বারণটুকু অবধি করে উঠতে পারতাম না।

কিন্তু আমার কাল রাতে বলা দিওতিমা-র কথাগুলো মনে পড়ল।

জীবন একটা যুদ্ধ, সেখানে নিজের অধিকার নিজেই প্রতিষ্ঠা করতে হয়। নাহলে সবাই সেটাকে অযোগ্যতা ভাবে।

আমি স্থিরপায়ে এগিয়ে গেলাম বাবার দিকে, বাবাকে শান্তস্বরে ডাকলাম, "বাবা, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিল।"

সুদেবদা এদিকে তাকাল। আগে থেকেই ও আমাকে পাত্তা দিত না বিশেষ, এখন জগদীশকাকার অনুপস্থিতিতে সেই ভূমিকাটা যেন ও নিজেই নিজের কাঁধে তুলে নিল, দৌড়ে এসে আমাকে সরিয়ে দিতে দিতে বলল, "আরে রূপ, তুমি এখন যাও। আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে চিন্তায় আছি সবাই। এখন জ্যাঠামশাইকে বিরক্ত কোর না।"

আমি বাবার দিকে তাকালাম। বাবার সামনেই সদস্যদের আমার প্রতি এমন ব্যবহার নতুন কিছু নয়।

সুদেবের কথাতে বাবা বারণ করা তো দূর, কোনো ভ্রূক্ষেপও করলেন না। একইভাবে পাথরের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মাটির দিকে।

আমি কী বলব বুঝতে না পেরে সরে এলাম। ততক্ষণে সুদেব বাবাকে গিয়ে বলতে শুরু করেছে, "জ্যাঠামশাই, মেদিনীপুর থেকে ওখানকার সেক্রেটারি অবিনাশকাকা ফোন করেছিলেন। ওখানকার মেম্বাররা খুব ঝামেলা শুরু করেছে। বলছে এই আইন মানবে না।"

আত্মারামদা পাশেই ঘুরঘুর করছিল, বলল, "ঝামেলা করতে বলো সুদেবদা। ঝামেলা করলে দেখবে সব সুড়সুড় করে পুজোর সময় আমাদের দিয়েই …।"

"আরে সে আমি বলেই দিয়েছি। সুদেব লাহিড়ী আছে, কোনো চিন্তা নেই। আর ক-টা লাইসেন্স ওলা পুরোহিত জোগাড় করতে পারবে সব ক্লাব? এই ক-দিনে? যারা লাইসেন্স পাবে, তারা তো আকাশছোঁয়া রেট চাইবে, তখন কী করবে? সেই তখন আমাদের কাছেই ফিরে আসতে হবে।" সুদেবদা বলল, "তবে তার আগে উত্তরপাড়ায় গিয়ে নাটের গুরুটাকে শিক্ষা দিতে হবে। আজকেই বাড়ি ফিরেছে বললি না?"

সুদেবদা বাবাকে একদম গার্ড করে দাঁড়িয়েছিল, ফলে বাবার সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমাকে সুদেবদাকে সরাতেই হবে।

আমি হাত দিয়ে সুদেবদাকে আলতো করে ঠেলতেই সুদেবদা সবার সামনেই খেঁকিয়ে উঠল, "আরে, তোমাকে বললাম না জ্যাঠামশাইকে এখন বিরক্ত কোরো না। কথা কানে যায়নি নাকি?"

"ঠিকভাবে কথা বলো সুদেবদা।" আমি শান্তস্বরে কথাটা বলে সুদেবদার চোখে চোখ রাখলাম।

উত্তেজনার বশে কথাটা বলে আমার স্নায়ু কাঁপছে, কিন্তু তবু আমি চোখ সরালাম না। সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে পার্বণীর বহুদিন আগের সেই তেতো মুখটা মনে পড়ে গেল আমার।

"মানে?" সুদেবদা রীতিমতো অবাক হয়ে গেছে। কী বলবে বুঝতে পারছে না।

অন্যান্যরাও তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

আমি বললাম, "বাবার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। পার্সোনাল। তোমরা বাইরে যাও। বাইরের দালানে অপেক্ষা করো। কথা হয়ে গেলে আমি ডেকে নেব।"

সুদেবদা হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর সমর্থনের আশায় তাকাল আমার বাবার দিকে।

বাবা ও আমার দিকে তাকিয়েছেন, চোখে একরাশ প্রশ্ন। কিন্তু কেন জানি না, আজ কিছু বললেন না।

আমার বুকের ভেতরটা কেউ যেন হাতুড়ি পিটছিল।

তবু আমি বলে চললাম, "আর শোনো। অল বেঙ্গল পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশন একটা ধর্মীয় সংগঠন। আমার ঠাকুরদা এই সংগঠনটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গ্রামেগঞ্জে গরিব পুরোহিতদের বঞ্চনা থেকে বাঁচাবার জন্য, তাদের প্রাপ্য প্রণামীর ব্যাপারে কথা বলার ঢাল তৈরির জন্য।" আমি সুদেবদার দিকে তাকিয়ে বললাম, "পার্টির লোকেদের হাত ধরে গুন্ডামি করার জন্য নয়। এটা কোনো সাধারণ সংগঠন নয় যে, তোমাদের মতামতের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে বা করলে তাকে গুন্ডা দিয়ে শায়েস্তা করবে, রাস্তাঘাটে মেয়েদের সঙ্গে অভব্যতা করবে।"

"এসব তুই কী বলছিস!" বাবা এতক্ষণে কথা বললেন, "আমাদের দলের কে মেয়েদের সঙ্গে অসভ্যতা, গুন্ডামি করেছে!"

আমি এবার বাবার দিকে তাকিয়ে বললাম, "ঝন্টু। জগদীশকাকার ভাইপো ঝন্টু ক্রমাগত ওর কাকার মদতে দিওতিমা বলে মেয়েটার সঙ্গে অসভ্যতা করে গেছে। হাওড়া স্টেশনে সবার সামনে হাত ধরে টানাটানি, রাস্তাঘাটে বিশ্রী ভাষায় হুমকি, পার্টির নেতাদের দিয়ে মেয়েটার চাকরিতে ট্রান্সফার করানো, কিচ্ছু বাদ দেয়নি। সুদেবদা দিওতিমাকে ক্যাশ অফার করেছে। আমি তোমাকে আগে অনেকবার বলতে চেষ্টা করেছি বাবা, কিন্তু তুমি গুরুত্বই দাও নি আমার কথায়। সত্যিই কি আমাদের সংগঠনের এইসব করা শোভা পায়? ঝন্টু আর জগদীশকাকা দিওতিমার উকিলের বাড়িতে গিয়ে ওর স্ত্রীর গায়ে হাত পর্যন্ত তুলেছে। এতে কার সম্মান ধুলোয় লুটোচ্ছে বাবা?"

বাবা একটাও কথা বললেন না। শুধু বিস্মিতচোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে।

আমি ধিক্কার জানিয়ে বললাম, "এর চেয়ে যোগ্যরাই পৌরোহিত্য করবে, এই নিয়ম মেনে নিয়ে আমরা যদি আমাদের মেম্বারদের সেই শিক্ষাদান করি, যেটুকু মিনিমাম যোগ্যতা না থাকলে, যে ন্যূনতম জ্ঞান না থাকলে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণই করা উচিত নয়, সেই বোধটুকু তৈরি করি, সেটাই কি ভালো নয়?"

আত্মারামদা তেরিয়া হয়ে উঠে বলল, "অনেকেই আছে যারা কোনোমতে বাংলাটুকু পড়তে পারে। তাদের কী শেখাবি তুই?"

আমি বললাম, "কেন? সংগঠনের প্রায় চল্লিশ হাজার মেম্বার, বার্ষিক যে সামান্য চাঁদা সবাই অ্যাসোসিয়েশন ফান্ডে দেয়, তা তো বেশিরভাগই খরচ হয় অ্যানুয়াল সভাতে। সেখান থেকে খরচ কিছুটা কমিয়ে আমরা যদি একটা মাসিক পত্রিকা চালু করি, যেখানে বাবা-র মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সহজসরল বাংলায় লিখবেন হিন্দু ধর্ম, প্রাচীন বৈদিক রীতি? প্রত্যেক মাসে সেই পত্রিকা যদি আমরা পৌঁছে দিই গ্রামবাংলার প্রতিটি সদস্যের ঘরে, আপনারা কী মনে করেন, এরপরেও আমাদের মেম্বাররা লাইসেন্স পেতে পারবেন না? নিজেদের পেশার জন্য এইটুকু আপডেট করতে পারবেন না নিজেদের?"

আমি নয়, যেন দিওতিমাও কথা বলছিল আমার হয়ে।

আমাদের বৈঠকখানা ঘরটা এতটাই বিশাল যে ছোটখাটো একটা টেনিস কোর্ট ধরে যেতে পারে এতে। ঘরে এইমুহূর্তে রয়েছে প্রায় চল্লিশজন মানুষ।

তবু সবাই এত নিস্তব্ধ হয়ে শুনছে আমার কথা যে একটা পিন পড়লেও শোনা যাবে!

আমি কোনোদিন যা করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, তাই করে ফেললাম। বাবার কাছে গিয়ে বাবার হাতদুটো জড়িয়ে ধরলাম, "তুমি ভেঙে পড়ো না বাবা। চলো, এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে আমরা উঠে দাঁড়াই। দেখিয়ে দিই, আমাদের সংগঠনের প্রতিটা সদস্য পৈতৃক অধিকারেই শুধু নয়, তাঁদের নিজেদের যোগ্যতায় ঈশ্বর আরাধনার জন্য উপযুক্ত!"

চার মাস পর ...

হাইকোর্টে যেদিন দিওতিমার সামনে আমি ক্যাবলা হয়ে বসেছিলাম, তার ঠিক পাক্কা চারমাস পরে আজও আমি ওর সামনে বসে আছি।

তবে আজ আর হাইকোর্টে নয়, গড়ের মাঠে। আমাদের সঙ্গে বিনি আর আবিরও রয়েছে।

সান্দাকফু যাওয়ার সময়েই আন্দাজ করেছিলাম বিনি আর আবিরের সম্পর্কটা আর নিছক বন্ধুত্বে আটকে নেই। আমার আন্দাজকে সঠিক প্রমাণ করে খুব শীগগিরই বিয়ে করছে ওরা।

দিওতিমার সঙ্গে বিনির সামান্য কারণে ভুল বোঝাবুঝি আমি আর আবির দায়িত্ব নিয়ে মিটিয়ে দিয়েছি। মেয়েদের সত্যিই আমি আজও বুঝলাম না! ঝগড়ার কারণ শুনে আমি আর আবির দুজনেই থ হয়ে গিয়েছিলাম। এত তুচ্ছ কারণেও কেউ কথা বন্ধ করতে পারে?

দিওতিমা আজ একটা সাদা কুর্তি আর আকাশ নীল জিনস পরে এসেছে। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা চুল এতদিনে বেড়ে কাঁধ ছুঁয়েছে। সাদা নীল পোশাকে ওকে যেন মনে হচ্ছে একটা পাহাড়ি নদী, আকাশ এসে যেখানে মিশে গেছে।

"যাই বল ভাই! সবই হল।" আবির বিনির একটা হাত মুঠোয় নিয়ে চিনেবাদাম খেতে খেতে বলল, "দিওতিমা দেখিয়ে দিল। দুর্গাপুজো, কালীপুজো, লক্ষ্মীপুজো এমনকী জগদ্ধাত্রী পুজোতেও ওর মন্ত্রোচ্চারণ দেখে সবাই অবাক হল। তোদের ক-অক্ষর গোমাংস

পুরুতগুলো প্রত্যেক মাসে টপাটপ পাশও করতে শুরু করল। কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই এগোল না।" কৃত্রিম আফশোসে মাথা নাড়াল আবির।

আমি হাসছিলাম। সত্যিই, মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণার পর পুরোহিতের সংখ্যা কমেছে ঠিকই, কিন্তু পুজোর মান উন্নীত হয়েছে অনেক। হ্যাঁ, এবারের পুজোটায় পুরোহিত পাওয়া নিয়ে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ধীরে ধীরে পরিস্থিতি পালটাচ্ছে।

অল বেঙ্গল পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা একটা ম্যাগাজিন চালু করেছি, 'নির্মাল্য' নামের সেই ম্যাগাজিন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে, গৃহীত হচ্ছে আমাদের সদস্যদের মধ্যে।

প্রতি মাসেই টুকটাক পাশ করছেন আমাদের সদস্যরা। জগদীশকাকা জামিনে ছাড়া পেলেও বাবা তাঁকে আর সংগঠনের কাজে ঢুকতে দেননি। কাকা এখন শুধু ব্যবসা-ই দেখেন।

বাবা মেজোকাকা আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে শক্তহাতে সামলাচ্ছেন সংগঠনের কাজ। শুধুই পুরোহিতদের ওপর বঞ্চনা, তা নয়, পুরোহিতরাও যেন কোথাও অন্যায্য প্রণামী না নেন, সেই ব্যাপারেও প্রতিটা জেলার নেতাকে সতর্ক থাকতে বলেছেন বাবা।

সবচেয়ে বড় কথা, সাধারণ মানুষের চোখে পুরোহিতদের প্রতি সেই হারিয়ে যাওয়া শ্রদ্ধাটা আবার ফিরে আসছে যেন।

না, বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আমার আর হাঁটু কাঁপে না। আগের থেকে অনেক সহজ হয়েছি আমি বাবার সঙ্গে। বাবা-ও কখন থেকে জানিনা, কোনো সিদ্ধান্ত, কোনো মতামতের ব্যাপারে নির্ভর করতে শুরু করেছেন আমার ওপর।

মনে মনে ঠিক করে রেখেছি, খুব শিগগীরই বাবা আর মা-কে নিয়ে গড়ের মাঠে বেড়াতে আসব আমি।

আমি হাসতে হাসতেই বললাম, "কোন ব্যাপার এগোল না?"

"এই যে, মহারানি দিওতিমা বিশ্বাসকে ভটচাজ বাড়ির পুত্রবধূ হিসেবে অধিষ্ঠিত করার ব্যাপারটা।' আবির নাটকীয়ভাবে বলল।

বিনি হেসে বলল, "সত্যি রূপদা! তোমার হবু বউ যেমন জাঁদরেল, বাবাও তেমনই। দুজনেই আবার শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। এই শ্বশুর বউমার টাগ অফ ওয়্যারে তোমার অবস্থা বড়ই সঙ্গিন!"

দিওতিমা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার মুখ খুলল, "না, রূপের বাবা আমাকে দুর্গাপুজোর পর নিজে ফোন করেছিলেন। অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সুষ্ঠুভাবে পুজো সম্পন্ন করার জন্য।"

দিওতিমা পুজো করেছিল দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম বড় একটা ক্লাবের প্রধান পুরোহিত হিসেবে। ক্লাবের উদ্যোক্তা কমিটি এতটাই ইতিবাচকভাবে দিওতিমাকে নিয়েছিলেন যে সঙ্গে সহকারী পুরোহিত হিসেবেও তাঁরা নিয়োগ করেছিলেন সেই মাসে প্রথম লাইসেন্স পাওয়া কয়েকজনকে, যাদের বেশিরভাগই অব্রাহ্মণ।

না, কোনো অসুবিধা হয়নি। দিওতিমা এবং তাঁরা সবাই ভক্তিভরে পুজো সম্পন্ন করেছিলেন।

এলাকার অধিবাসীরাও তৃপ্ত হয়েছিলেন ওদের পুজোয়। সত্যি বলতে কী, এবারের পুজোয় মা দুর্গার চেয়ে বেশি খবরের শিরোনামে ছিল দিওতিমা-ই।

আর সত্যিই তো, প্রাচীন বৈদিক যুগের ঋষিকাদের নস্যাৎ করে মধ্যযুগ থেকে মেয়েদের অন্য সবকিছুর মতো শাস্ত্রেও ঢুকতে না দেওয়ার যে ভণ্ড রেওয়াজ চালু হয়েছিল, সেই অশুভ মহিষাসুরসম শক্তিকে দিওতিমা একা-ই তো হারিয়ে দিল।

ঝন্টুর মতো কত লোক বাধা দিতে চেয়েছে, পিষে ফেলতে চেয়েছে দিওতিমার অনমনীয় মনোবলকে, কিন্তু দিওতিমা একা প্রচুর প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে থেকেছে অবিচল ভঙ্গিতে।

দার্জিলিং থেকে ওকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আগেই এসেছিল। দিওতিমা এখন হাওড়া সদর দপ্তরে পোস্টেড। আমার বাড়ি থেকে মাত্র দশ মিনিট। অফিস ফেরত আমাদের রোজ দেখা করতে কোনো অসুবিধেই হয় না।

ব্যস্ত রাজপথের পাশ দিয়ে, দূরের জাহাজগুলো ভেঁপু শুনতে শুনতে হাওড়া ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে চলি আমরা। দিওতিমা আপন খেয়ালে বকে যায়।

আমি কথা বলি কম, শুনি বেশি। আর ওর শত আপত্তি সত্ত্বেও ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি। মুগ্ধ হই ওর দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বে।

"তুই শালা একটা গোবর সত্যিই!" আবীর আমার চমক ভেঙে দিয়ে বলল, "চারমাস হয়ে গেল, এখনো বাড়িতে কিচ্ছু জানাতে পারলি না! আরে বাড়িতে বল, আমরা একটু নিমন্ত্রণ খাই!"

'গোবর' শুনলে আমার মাথাটা বরাবর ধাঁ করে গরম হয়ে যেত, দিওতিমার শেখানো মতো ইদানীং রেগে গেলে আমি আর চুপ করে থাকি না, দৃঢ় ভঙ্গিতে নিজের আপত্তিটা জানাই।

কিন্তু এখন কোনো কথা বললাম না। আবীরের দিকে একবার ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে নিলাম।

তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে কিছুটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে বাঁ-হাতের তালুতে রেখে ডান হাত দিয়ে সেটাকে চাপা দিলাম, তারপর ডান হাঁটু মাটিতে পেতে উত্তরদিকে মুখ করে বসলাম।

"কী করছিস তুই?" আবীর অবাক।

দিওতিমাও বিস্মিত চোখে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে।

আমি গলা কাঁপিয়ে বললাম,

"ওঁ যা গুর যা সিনীবালী যা রাকা যা সরস্বতী।

ওঁ অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু !"

"পাগল টাগল হয়ে গেলি নাকি?" আবীর অবাক হয়ে তাকাল দিওতিমার দিকে।

দিওতিমা কিছু বলতে যাওয়ার আগেই আমি মিটিমিটি হাসলাম, "পাগল কেন হব বন্ধু! দিওতিমা পুজো করা পুরোহিত হতে পারে, কিন্তু আমিও আমাদের 'নির্মাল্য' পত্রিকার সম্পাদক। এটা সংকল্প স্তোত্র। কোনো কঠিন কাজ করতে যাওয়ার আগে ঋগবেদের এই

সংকল্প স্তোত্র পাঠ করতে হয়। তুই আর কী বুঝবি!" আমি তড়াক করে উঠে পড়ে দিওতিমার হাত ধরে টান দিলাম, "চলো!"

"কোথায়?" দিওতিমা হতবাক।

বিনি আর আবীর কিছুই বুঝতে পারছে না, অবাক চোখে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে।

"হিটলা ... ইয়ে মানে আমার বাবার কাছে। সব কথা বলব বাবাকে। সংকল্প মন্ত্র পড়ে ফেলেছি, এবার গিয়ে স্ট্রেট বলে দেব। আজই। এক্ষুনি।"

"কী বলে দেবে?" দিওতিমা হাঁ।

"বলব যে বাবা, তোমার উত্তরসূরি তোমার ছেলে নয়, বউমা। আমাদের অল বেঙ্গল পুরোহিত অ্যাসোসিয়েশনের নেক্সট প্রেসিডেন্ট! প্রথম অব্রাহ্মণ কিন্তু সবচেয়ে সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট! এখুনি চলো আমার সঙ্গে।"

দিওতিমার মুখে ততক্ষণে জ্বলে উঠেছে হাজার ওয়াটের হাসি। যে হাসির কাছে ম্লান হয়ে যাবে বিশ্বের তাবড় তাবড় স্থাপত্যও।

হাসতে হাসতে ও আমার হাত ধরল।

সঙ্গে সঙ্গে যেন ডানা ঝাপটে আমার পাশ দিয়ে উড়ে যেতে লাগল হাজার হাজার পাখি। তাদের মিষ্টি কলকাকলিতে ভরে যেতে লাগল গোটা জায়গাটা, গড়ের মাঠের দুবলা ঘোড়াগুলো যেন নিমেষে হয়ে গেল একেকটা পক্ষীরাজ।

টগবগিয়ে তারা ছুটতে শুরু করল আমার খুশির সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

আমি দিওতিমার হাতটা আমার মুঠোয় শক্ত করে ধরে সামনে পা বাড়ালাম।

********** শেষ **********